রবির আলোকে শান্তিনিকেতন

•

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
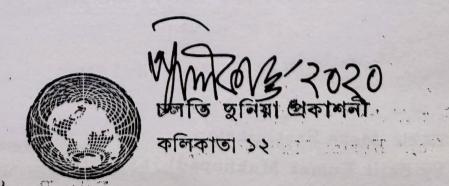
চলতি দুনিয়া প্রকাশনী
কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

যাদের স্বর্গত প্রপিতামহ
—রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে
তেরশ’ আট-নয় সালে শিক্ষকরূপে
শান্তিনিকেতনে আগমন করেন
সেদিন হতে দীর্ঘ সত্তর বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ
যাঁর পুত্র ও পৌত্র এবং পৌত্রেরও সন্তান-সন্ততি
রবির আলোকে শান্তিনিকেতনে
জীবন প্রস্ফুটিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে
বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নরত
সেই জয়িতা ও সৌমিত্রকে
আমার এই পুণ্যস্মৃতিপূর্ণ গ্রন্থ সমর্পণ করলাম

বিষয়সূচী

গ্রন্থকারের নিবেদন

"রবির আলোকে শান্তিনিকেতন" গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো! কী ঝড়-ঝাপটা এর উপর দিয়ে গেছে—তা বলবার শক্তি আর আমার নেই। কোনোরকমে বেঁচে আছি।

'চলতি দুনিয়া প্রকাশনী'র পরম আত্মীয়গণ অসাধ্য সাধন করলেন। মূল পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশে 'বাংলা একাডেমি'তে। সেখানে যা হয়ে গেল, তা কারো অজানা নেই। যে-পাণ্ডুলিপি এঁরা পেয়েছেন, তা নকলেরো নকল। সে-সময় আমি দৈবাৎ পুনর্জীবন লাভ করেছি। মস্তিষ্ক ও চক্ষের শক্তি অতি দুর্বল, অতিম্লান। শুদ্ধ করে দেব, এমন কথা তখন কল্পনাতেও আনা যেতো না। এঁরা যথাশক্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন—এ আমার আশাতীত।

ছাপা অংশগুলি আমাকে দিয়েছেন, এর পরেও যদি ভুল আমার চোখে পড়ে, আমি যেন জানাই, শুদ্ধি-পত্রে এঁরা তা দেবেন। আমার চোখে তেমন ভুল দেখলাম না, যা গ্রন্থ বুঝতে অসুবিধে ঘটাবে। তবু কিছু শুদ্ধিপত্রে দেওয়া হলো।

মূল রবীন্দ্র-রচনাবলীর সঙ্গে পাঠ মিলাতে গিয়ে, কাল সন্ধ্যের আগেই আবার শয্যার আশ্রয় নিতে হলো। আঠার ঘন্টা পরে আজ রোদে হেলান-কেদারায় বসে একটু লিখলাম। হ্রস্ব, দীর্ঘ উকারের তফাৎ আতস কাঁচের সাহায্যেও বুঝতে পারে না যে-চোখ, সে-চোখের সাহায্যে পাঠ মিলালেই বা কী লাভ হতো! ৮।১।৭৭

পূর্বাভাস

নক্ষত্রগণের মাঝে হেরি যবে শশী ;
মনে হয় আচার্যের কাছে আছি বসি।
রবিসম তেজ যাঁর শশীসম জ্যোতি
কত স্নেহ তাঁর তুচ্ছ আমাদেরো প্রতি।
প্রত্যূষে জাগান তিনি শোনাইয়া গান,
নিদ্রা যাই তাঁরি মুখে শুনি উপাখ্যান।
সকালে সকলে করি তাঁরি কাছে ক্লাস,
ঘন্টাভোর পড়ি তবু মেটে না যে আশ।
পড়া সে কি ? মনোহারি সে কি উপকথা ?
সে-পড়ার তরে প্রাণে কত আকুলতা !

চন্দ্রালোকে তাঁর সাথে প্রান্তরে বা বনে,
ভ্রমি মোরা গাহি গান পুলকিত মনে।
তার পরে জাগে যবে কাল-বৈশাখী,
ভেঙে চুরে, আশ্রমের যত শাখা, শাখী,
গুরু ছুটে বাহিরয়, সঙ্গে শিষ্যগণ,
প্রলয় তাণ্ডবসহ প্রচণ্ড বর্ষণ—
তারি সাথে গুরুশিষ্য কণ্ঠে বর্ষে গান,
অমৃতের স্পর্শ লভি করি ধারাস্নান !

আজি যবে মুগ্ধচিত্তে কহি সে-বারতা,
শুনে সবে সবিস্ময়ে যেন রূপকথা।
সত্য বলে' অনেকেই করে না বিশ্বাস,
কল্পিত কাহিনী ভাবি করে উপহাস।

অখ্যাত পল্লীতে গড়ে তপোবন কবি,
কল্পনার চক্ষে হেরি সে-যুগের ছবি।
গুটিকয় শিষ্য নিয়ে কাটায় জীবন।
'কবির খেয়াল'—ইহা ভাবে বন্ধুগণ।
হাসে কেহ, নিন্দে কেহ, করে তিরস্কার,
হেনকালে—'জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার,
পেয়েছেন মহাকবি'—আসিল সন্দেশ।
অখ্যাত সে পল্লীমাঝে ভেঙে পড়ে দেশ।

কবি ধীর! অচঞ্চল! আশ্চর্য এ কথা।
পূর্ববৎ বৃক্ষতলে, চলে শিক্ষকতা।

—জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৭৭।

অ ব তা র ণা

●

"হের এ দেবের কাব্য ! রূপে রসে ভরা !
মৃত্যু যেথা পিছু হটে, স্পর্শে নাহি জরা ॥"

—অথর্ববেদ

এই জীবনেই আমাদের জন্মান্তর ঘটে। আমরা সকলেই দ্বিজ বা ত্রিজ।

দেহের আমূল পরিবর্তনকেই যদি জন্মান্তর মনে করি তা হলে শৈশব, যৌবন এবং জরায় তো আমাদের সকলেরই জন্মান্তর ঘটছে। শিশু 'আমি'-কে তো যৌবনের দেহে খুঁজে পাই না। আবার শিশু 'আমি' বা যৌবনের 'আমি'-কে জরায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

দেহের দিক থেকে তো এইভাবে জন্মান্তর ঘটছে, কিন্তু মনের দিক থেকেও আমাদের জন্মান্তর ঘটে। কারো একাধিকবার, কারো বহুবার।

এ কেবল কোনো এক দার্শনিক বা বিশেষ দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মতবাদমাত্র নয়---আমরা, আমাদের জীবনে একথা উপলব্ধি করি।

আমি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অনগ্রসর জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের এক দরিদ্র বালক, বঙ্গের সবচেয়ে শিক্ষিত, অভিজাত, ধনীপরিবারের সন্তান লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে, পুত্র বা পৌত্রের ন্যায় স্নেহে, বাৎসল্যে, শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করব—একথা কি আমাদের সেই তমসাচ্ছন্ন অঞ্চলের কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল ?

কিন্তু সেইরূপ এক অসম্ভব ঘটনাও ঘটেছিল !

সে-যুগের শান্তিনিকেতনের সেই শৈশব-জীবনের কথা, যখন এ-যুগের লোকের কাছে বলি—তাঁদের অনেকেই তা বিশ্বাস করতে পারেন না। যাঁরা বা কতক বিশ্বাস করেন তাঁরা মনে করেন এ অতিরঞ্জন !

তাঁদের মনোভাবকে দোষ দেব কি—আজ আমার এই জরাগ্রস্ত দেহ ও মন ভুলতে বসেছে যে আমার এই জীবনেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল। এ যেন পূর্বজন্মের এক ক্ষীণ স্মৃতি পারিপার্শ্বিক সহস্রজনের অবিশ্বাসে মিলিয়ে যেতে বসেছে !

সেই পরমস্নেহশীল, উদার লোকোত্তর পুরুষকে অতি সন্নিকট হতে নানাভাবে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। শৈশবে সব দেখলেও বিশ্লেষণ করার শক্তি ছিল না। কিন্তু যৌবনে,—পরিপূর্ণ যৌবনে, সব দেখে বিচার করে মুগ্ধ হয়েছি।

কী উদার হৃদয় ! কী আশ্চর্য সহানুভূতি, কী অপরিসীম ধৈর্য ! তাঁর স্নেহ, সূর্যকিরণ ও বারিবর্ষণের মতো নগণ্য অভাজনের উপরেও সমান ভাবে বর্ষিত হয়েছে।

সে-যুগের বাঙালীর ধারণা ছিল "রবিবাবু দুষ্ট, দুর্দান্ত ছেলেদের জন্যই 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি স্কুল খুলেছেন।" তাই যে-ছেলেদের 'কিছু হবে না' বলে সব স্কুলের শিক্ষকগণ রায় দিয়েছেন—যাদের অভিভাবকদেরও মনে সেরূপ ধারণা হয়েছে—তাঁরা, তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার একটা শেষ চেষ্টা করার জন্যে 'বোলপুরে' পাঠিয়ে দিতেন।

এমনই একটি অসাধারণ দুর্দান্ত বালক ছিল কালাচাঁদ। পদবী মনে নাই। আর শান্তিনিকেতনে তখন পদবী নিয়ে আমরা বালকেরা কেউই মাথা ঘামাতাম না। আমরা নিজেরাই এক একটা পদবী বা বিশেষণ দিয়ে এক একজন বালককে—সেই নামের অন্য বালকের থেকে বিশেষিত করতাম। যেমন—'দ্বিজেনগুণ্ডা,' 'অনিল গোদা,' 'ধীরেন কাঞ্চনতলা' প্রভৃতি।

যাই হোক, এই কালাচাঁদের কথাই বলি। রবীন্দ্রনাথ ছোটদের

ইংরেজি ক্লাশ নিতেন। দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষাকে কেন সুবোধ্য চিত্তাকর্ষক করা যাবে না, এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধ্যবসায় নিয়ে তিনি শিশুদের ইংরেজি শিখাতেন।

এবিষয়ে তিনি এমনিই কৃতকার্য হয়েছিলেন যে 'সদা-ক্লাশ-পালানো' ছেলেরাও তাঁর ক্লাশে উপস্থিত হতো এবং অনেকসময় তারাই আগে এসে হাজির হতো।

কালাচাঁদ এইরূপ একজন বিশিষ্ট বা বিশিষ্টতম বালক। তবে ক্লাশে উপস্থিত হলেও—সবসময় সে যে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকত তা নয়। এক এক সময় ঝগড়া এবং মারামারিও করে ফেলত।

ধরিত্রীর ন্যায় অসীম ধৈর্যশীল শিক্ষক রবীন্দ্রনাথেরও কি একদিন ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল ? তিনি পাশের বালকটিকে প্রহাররত কালাচাঁদকে কাছে ডেকে কান মলে দেন।

আর যায় কোথা! ক্লাসের ধারে পড়েছিল এক থান ইঁট। পলকের মধ্যে সেই ইঁট তুলে কালাচাঁদ গুরু রবীন্দ্রনাথকে দক্ষিণা দিতে উদ্যত হলো। কিন্তু গুরুকে তা গ্রহণ করতে হলো না। গুরুর আশে পাশের অন্য গুরুগণ, যাঁরা গুরুদেবের শিক্ষাপদ্ধতি লক্ষ করার জন্যে উপস্থিত থাকতেন, তাঁদেরই দুজন কালাচাঁদের হাত থেকে সেই অসাধারণ দক্ষিণাটি হস্তগত করলেন।

কালাচাঁদকে এর জন্যে কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কড়া নিষেধে শিক্ষকগণকে তা থেকে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল।

এই কালাচাঁদই শেষে রবীন্দ্রনাথের একজন অনুগত ভক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সে দুবেলা যেতো এবং মিষ্টি খেয়ে আসত।

ঘটনাটি যখন ঘটে, তখনও আমি শান্তিনিকেতনে আসিনি। একবার আমি স্বয়ং কালাচাঁদকেই জিজ্ঞেস করি—"হ্যাঁ হে কালাচাঁদ! তুমি নাকি গুরুদেবকে ইঁট মারতে গেছলে ?"

কালাচাঁদ অত্যন্ত অনুতাপের সুরে বলে, "আরে ভাই, আমি কি তখন জানতাম যে উনি 'গুরুদেব'। আমি ভেবেছিলাম—'মা-ষ্টা-র'।"

রবীন্দ্রনাথের অসীম স্নেহ ও ধৈর্যের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমাদের গ্রামের এক দুঃস্থ ব্রাহ্মণসন্তান উত্তরায়ণে পাচকের কাজ পান। গৌরবর্ণ, সুন্দর মুখাকৃতি, রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দর কোঁকড়া চুল—উত্তরায়ণেই তাঁকে মানায়! তিনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর চুল রাখেননি।

তাঁর ঐ লম্বা চুল, কয়েকবার অন্নব্যঞ্জনে অনুপ্রবেশ করে। ফলে ঠাকুরপরিবারের অনেকের কাছেই তাঁর তীব্র ভর্ৎসনা লাভ হয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁকে ভর্ৎসনা করেননি। পরে একসময় তাঁকে ডেকে বলেন :

"ভজহরি, তোমার চুলগুলি তো বেশ সুন্দর!" ভজহরি নিতান্ত লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে থাকেন। সুকেশ রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর মতো অভাজনের কেশের প্রশংসা করবেন—একথা তিনি ভাবতেই পারেননি!

আরপর রবীন্দ্রনাথ বলেন—"চুলগুলির যত্ন নিও—বুঝলে?"

ভজহরি কুণ্ঠিতভাবে বলেন—"আজ্ঞে হাঁ।"

"আর একটা কথা, বুঝলে ভজহরি! চুল মাথাতেই থাকা ভালো ওটা অন্য কোথাও, যেমন ধরো—ভাত, ডাল, তরকারীতে থাকলে মোটেই ভালো লাগে না।"

অপরাধ করে মনিবের কাছে এইরূপ মিষ্ট ব্যবহার ভজহরির মনকে এমনই অভিভূত করে যে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সকলের কাছে এই ঘটনাটি তিনি কৃতজ্ঞতাভরে উল্লেখ করতেন।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পিতা পিতামহের মতো ভালোবাসতাম। কিশোর বালক, পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীদের ছেড়ে এসে একাধারে তাঁর মধ্যে পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতির স্নেহ লাভ করতাম।

সকাল সাড়ে ছ'টা-সাতটা হতে সাড়ে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তিনি আমাদের ক্লাশ নিতেন। দুপুরে তিনি আমাদের জন্যে পাঠ তৈরী করতেন। বিকেলে কখনো কখনো সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন।

সন্ধ্যায় 'বিনোদন-পর্বে' মজার মজার নাটকের মহড়া দিতেন। রাত ন'টার পর পালা করে, এক এক ঘরে, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায় গল্প বলতেন। গল্প শুনতে শুনতে ছোটরা অনেকেই আশে পাশে, ঘুমিয়ে পড়ত।

রাত দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, ছেলেদের ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন।

কখনো বা বর্ষার বারিধারার মধ্যে ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। পায়ের নীচে 'খোয়াই'-এর জলস্রোত, মাথার উপর বর্ষার বর্ষণ, তার সঙ্গে রবীন্দ্র ও দিনেন্দ্রকণ্ঠের সুরধারায় অভিষিক্ত হতে হতে আমাদের বালক-মন অসীম আনন্দ লাভ করত।

তেমনি, জ্যোৎস্না-রাত্রে উন্মুক্ত প্রান্তরে, অথবা পারুলডাঙার পারুল বনে, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ বা বনভোজনের সৌভাগ্য লাভ হতো।

তাঁর ঘরে যে-কোনো সময় আমাদের শিশুদের স্বচ্ছন্দ গমনাগমন চলত। তিনি লেখায় নিমগ্ন থাকলে, আমরাই নিঃশব্দে চলে আসতাম। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মৃদু ভৎর্সনা লাভ হতো। সেটাও আমাদের বেশ ভালো লাগত।

"আজ গুরুদেব আমাকে বকেছেন"—কারো মুখে এইরূপ দুর্লভ ঘটনার কথা শুনে ভাই আলোচনা করতে করতে, আমাদের বালখিল্য-দের আসর বেশ জমে উঠত।

তাঁর বকুনি খাবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে—তবে সেটা শৈশবে নয়, যৌবনারম্ভে। তার একটি এখানে উল্লেখ করি:

বিশ্বভারতীর কলেজি-শিক্ষার সময় আমার বেশ অর্থাভাব হয়। হয়ত বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে যেতে হতো—এমন সময় এক মহাপ্রাণ বন্ধু তাঁর মায়ের নামের একটি বৃত্তি দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন। বৃত্তিটি যখন ছ'মাসের উপর উপভোগ করছি—তখন তিনি একদিন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলেন—"মার এই বৃত্তিটি সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে। তাঁর

ইচ্ছা ছিল বৃত্তিধারী সংস্কৃতের কোনো একটি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।" তাঁর ওই কথা শুনে নিতান্ত কর্তব্যবোধেই আমি কাব্যতীর্থ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হই, এবং বৃত্তির সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ একদিন অপরাহ্ণে দেহলীর ধারের শাল-বীথিকায় পায়চারি করছেন—আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। এরই মধ্যে আমার কাব্যতীর্থ উপাধি লাভের খবর তাঁর কানে গেছে। প্রণাম করে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন করলেন:

"তুই নাকি কাব্যতীর্থ হয়েছিস?" মুখ দেখে বুঝলাম না—তিনি খুশি হয়েছেন কি না। খুশি হয়েছেন ভেবেই আমি হাসিমুখে বললাম—"আজ্ঞে হাঁ!"

ভ্রূকুটি ভরা মুখখানি আমার মুখের উপর তুলে তিনি বললেন—"ছ্যাঃ!"

ওই "ছ্যাঃ" বলার চেয়ে বড় ভৎ´সনা আর কি হবে?

দীর্ঘ চৌদ্দবছর শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে এ-ছোকরা শেষকালে একটা ছুঁৎবিচারী 'টোলো পণ্ডিত' হচ্ছে—এই কথাটিই তিনি ওই "ছ্যাঃ" শব্দের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য,—এর কয়েক বছর পরে তিনিই আবার আমাকে একটা সংস্কৃত উপাধি দিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে, আমি তখন তাঁরই নির্দেশে সমাজ-সংস্কারের কাজে পূর্ববঙ্গ যাই। তিনি ভেবে দেখলেন, এখন এর পণ্ডিতী উপাধি কাজে লাগবে। তাই তাঁর দেওয়া পরিচয়-পত্রে আমার কাব্যতীর্থ এবং শাস্ত্র-বিশারদ (তাঁর দেওয়া) উপাধির উল্লেখ করেন।

শৈশবে একবার পাইকারী হারে তাঁর বকুনি খেয়েছিলাম। সে-বকুনির লক্ষ্য কিন্তু আমরা শিশুরা ছিলাম না। আমাদের দাদারা—যাঁরা তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে—তাঁরাই ছিলেন সেই বকুনির লক্ষ্য।

আশ্রমে একটি সবজীবাগান ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক জগদানন্দ

রায় মহাশয় তার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক এবং স্নেহশীল হৃদয় তাঁর পুত্রসম স্নেহাস্পদ ছাত্রদের জন্যে সেই বাগানে কেবল তরিতরকারি নয়, তরমুজ, ফুটি, শশা, প্রভৃতি ফল উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল।

একবার কয়েকটি বয়স্ক ছাত্র সেখান থেকে তরমুজ চুরি করে খায়। রবীন্দ্রনাথের এটা কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি অপরাহ্নে, দেহলীসংলগ্ন 'নতুনবাড়ী'র সামনে ছাত্রদের সমবেত হতে বলেন। তারপর তাঁর কণ্ঠ মৃদু হতে ক্রমশ উচ্চতর গ্রামে চড়তে থাকে ঃ

"তোদের জন্যেই ওই ফল। নিজের জন্যে উনি ফলাননি। পাকলে তোদেরই তা দেন। কিন্তু তোরা এমনই স্বার্থপর, এমনই লোভী, এমনি পেটুক যে তোদের ছোটো ভাইদের বঞ্চিত করে সেগুলি চুরি করে খেলি! তোদের লজ্জা হলো না! আর কয়েকমাস পরে তোরা শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবি—এখান থেকে কি শেষে এই শিক্ষাই সঙ্গে নিয়ে যাবি? এতদিন ধরে আমি কি তোদের এই শিক্ষাই দিলাম!"

ক্রোধ, হতাশা এবং ক্ষোভমিশ্রিত সেই ভর্ৎসনা, ফলচুরি-করা ছেলেদেরও চোখে জল এনেছিল।

ধর্ম ও আচার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উদারতার তুলনা নাই। তাঁর মতো সহানুভূতিশীল পরমত-সহিষ্ণু মানুষ আমি দেখিনি!

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও মূর্তিপূজার বিরোধী হলেও তাঁর আশ্রমে তাঁর মতবিরোধীদের সাদরে আশ্রয় দিতেন। বস্তুত আশ্রমে তাঁদের সংখ্যাই বেশি ছিল। মতবিরোধের জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উচ্চপদে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়নি।

সকলেই জানেন আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরেই শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথ ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার তুলনা নাই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ভগবদ্ভক্ত হলেও নাস্তিককেও তাঁর আশ্রমে সাদরে স্থান দিতেন। তাঁর উপাসনা মন্দিরের পাশেই তাঁর স্নেহভাজন এক নাস্তিক শিক্ষককে বাসস্থান নির্মাণের জায়গা দিয়েছিলেন।[১]

দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা আশ্রমে নিষিদ্ধ—কিন্তু শারদোৎসব, শ্রীপঞ্চমীর বসন্তোৎসব, সমারোহে সম্পন্ন হতো।

যাঁরা তাঁর 'শারদোৎসব' পড়েছেন অথবা তার অভিনয় দেখেছেন —তাঁরা জানেন জগজ্জননী শারদলক্ষ্মীর উপাসনা তিনি কী ভাবে করেছেন।—

"এসো গো, শারদলক্ষ্মী তোমার
    শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
    বনগিরি-পর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল
    শীতল শিশির-ঢালা॥"

অথবা—

"তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
    দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
    গলার মুক্তাহার॥
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
    মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
    দুখের অলংকার॥"

---

১ শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরের পাশেই 'তাল ধ্বজ' নামে একটি চিত্র কুটীর আছে। কুটীরবাসী শিক্ষক সেন মহাশয় কবিকে পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। তাই মন্দিরের পাশে থাকলেও মন্দিরে যেতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নচিত্তেই তাঁর পরম স্নেহভাজন ঐ শিক্ষককে (যাঁকে তিনি তাঁর কাব্যেও স্থান দিয়েছেন) তাঁর ইচ্ছামত চলার অনুমতি দেন।

অথবা—

"অমল ধবল পালে লেগেছে
মন্দ মধুর হাওয়া—
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া ॥"

অথবা—

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে ॥
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে ॥"

এসব গান প্রাণের নিভৃততম স্থানে আলোড়ন আনে। আমি মূর্তিপূজক পরিবারের সন্তান হলেও রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'শারদোৎসবে'র অভিনয় দেখে ১২ বছর বয়সে বোঝা-না-বোঝার মধ্যেও যে আনন্দ পাই—দুর্গোৎসবের আনন্দের চেয়ে আমার কাছে তা কম ছিল না।

পরিতাপের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসবের' এই সব গানের কোনোটিই বাংলার আকাশবাণীর 'মহালয়ার আসরে' প্রবেশাধিকার পায়নি।

শ্রীপঞ্চমীর দিন, 'আম্রকুঞ্জে' মহাসমারোহে বসন্তোৎসব হতো। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী সেই উৎসব পরিচালনা করতেন। বীণা, এস্রাজ, সেতার, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রকে আমের মুকুল ও অন্যান্য বাসন্তীপুষ্পরাশিতে সজ্জিত করা হতো। ফুলের ও ধূপের গন্ধের সুরভিত আসরে তিন সঙ্গীতাচার্য ও তাঁদের শিষ্যদের গানে আম্রকুঞ্জ মুখরিত হতো।

ছেলেরা তাদের ঘরে ঘরে নিজ নিজ পুস্তকাদি নানাজাতীয় পুষ্পে

এবং পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করত, ধূপধুনা দিয়ে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করত।

একবার একজন অত্যুৎসাহী শিক্ষক কঠোর ভর্ৎসনা করে তাদের সব পূজায়োজন নষ্ট করে দেন। দুজন ছাত্র বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনে। তিনি এতে খুবই বিরক্ত হন। অবশেষে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—"তোরা আবার গিয়ে ঐভাবে সাজা! আর ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

ছেলেরা তো মহোৎসাহে আবার তাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। এবার শুধু ফুল ও ধূপধুনা নয়, তার সঙ্গে কাঁসরবাদ্য। নিজেদের থালা-বাটি ঐ কাঁসর-বাদ্যের স্থান নেয়। সেই বিকট আওয়াজে মহাবিরক্ত হয়ে তরুণ শিক্ষকটি অগ্নিমূর্তিতে তাদের দিকে অগ্রসর হন। ছেলেরা দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই বলে ওঠে :

"গুরুদেব আপনাকে ডেকেছেন এবং এক্ষুনি যেতে বলেছেন।"

কৈশোর পার হয়ে যৌবনের আরম্ভে পল্লীগ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সেই আমি, ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহসূচক কতকগুলি কবিতা লিখি। তারই একটি একদিন সাহিত্যসভায় পাঠ করি। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেদিন এক গোঁড়া ঈশ্বরভক্ত অধ্যাপক সভাপতি ছিলেন। সভাপতির কটুকঠোর মন্তব্যে আমি বড়ই আহত হই।

তার পরদিন অতি প্রত্যূষে সেই কবিতাগুলি একটি নতুন খাতায় লিখে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসি। সারাদিন ও সারারাত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটে। সকালেই উত্তরায়ণ অভিমুখে রওনা হই। পৌঁছে দেখি, তিনি দোতলা থেকে নামছেন—হাতে আমার সেই কবিতার খাতা।

আমার তখনকার মনোভাব বর্ণনা করা কঠিন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—"তোর কবিতাগুলি ভালো হয়েছে রে।"

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম—"ঈশ্বরভক্ত হয়ে আপনি একথা বলছেন।"

তিনি বললেন—"কবির কী মত তা আমার দেখবার নয়। কবিতা

রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি না—তাই দেখব !"

'নৈবেদ্যের' ভগবদ্ভক্ত কবি, যিনি তাঁর জীবন-দেবতার উদ্দেশে 'গীতাঞ্জলি' নিবেদন করেছেন, তিনি কি না—

"একমাত্র বেদান্তের কথা জেনো সার
নির্গুণ ঈশ্বর। কোনো গুণ নাই তার।"
"দীনবন্ধু! তাই বুঝি লক্ষ লক্ষ দীন
অনশনে অর্ধাশনে কাটাতেছে দিন।"
"নির্গুণ সে! স্থাণু, জড়, অসাড় অচল,
তারে পেয়ে আমাদের কী হইবে ফল।"

—ইত্যাদি কবিতাগুচ্ছের পংক্তিগুলি পড়ে প্রশংসা করলেন—এহেন অসাধারণ উদারতা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে !

রবীন্দ্রনাথ, বন্ধু শ্রীশ মজুমদার মহাশয়ের বিধবা পুত্রশোকাতুরা পত্নীর অন্তরের কামনা পূর্ণ করতে—তাঁর কন্যা রমার (নুটুর) বিবাহে বিশ্বভারতীর বাসগৃহে শালগ্রামসহ হোমাদি অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন। তাঁরই আদেশে আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে পুরোহিতের আসনে বসতে হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন।[২]

আমি তখন নিতান্ত তরুণ।—ঈশ্বরকেই মানতে চাই না—তা আবার শালগ্রাম শিলা! তবু তাঁর সেই উদার উদাহরণে একান্ত

---

২ কবি আমাকে ডেকে বলেন—"...সম্পূর্ণ হিন্দু মতেই এই বিবাহ হবে। ...আর শোন্, উনি যদি চান, শালগ্রামশিলাও আনাতে হবে।...তোর কী মত, বা আমার কী মত সেটা এখানে দেখবার নয়—ওঁর (বন্ধুপত্নীর) মতেই আমাদের চলতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে আমি এমনই আশ্চর্য হই যে খানিকক্ষণ আমার মুখে কথা সরেনি। সেই আদেশ মাথা পেতে নিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে ঘরে ফিরি।

তখন পর্যন্ত অবিবাহিত-আমি, বিবাহ উপলক্ষে সেই প্রথম, এবং অন্যের বিবাহে সেই প্রথম ও শেষ, উপোস করে থাকি। যদিও এ বিষয়ে কোনো কড়া বিধিনিষেধ ছিল না—কন্যার মাতারও নির্দেশ ছিল না—তবু সেদিন আমি এটা না করে পারিনি।

ভ্রয়ে সেই বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপন করি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এসে আমার একাধিকবার জন্মান্তর ছ। আমি দ্বিজ হয়েছি—ত্রিজ হয়েছি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, গা এই শিশুমৃত্যুর দেশে, শৈশবেই আমার মৃত্যু হচ্ছে! পরিণত নলাভের সৌভাগ্য আমার আর হলো না!

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, আবল্যপালিত শিষ্যের সংখ্যা নয়—যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর কোনো না কোনো মহৎ লাভ করেছেন। তাঁর সব গুণ অন্য কোথাও একত্রে দেখা সম্ভব। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের কি এত সহজে আবির্ভাব হয়?

কোনো কোনো শিষ্যের মধ্যে তাঁর কাব্য, সংগীত, চিত্রকলার ধারা, রো মধ্যে তাঁর চরিত্রবল, সংগঠন শক্তি, কারো মধ্যে বা মানবপ্রেমের ালোকরশ্মি দেখতে পাই। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা যা রবীন্দ্র-চরিত্রের কান্ত বৈশিষ্ট্য, তাও তাঁর স্নেহধন্য কোনো কোনো অন্তেবাসীর অন্তরে ুলিঙ্গরূপে বিরাজ করছে।

এই সব অন্তেবাসী বা মানসসন্তানগণই রবীন্দ্রনাথের সন্তানধারা াবিচ্ছিন্ন রাখবেন।[৩]

—জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৭৯

---

৩ "...সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের
ঝরনা নিল তুলি;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো
আমার আয়ু।"
—পূরবী

ব্রহ্মচর্যাশ্রম
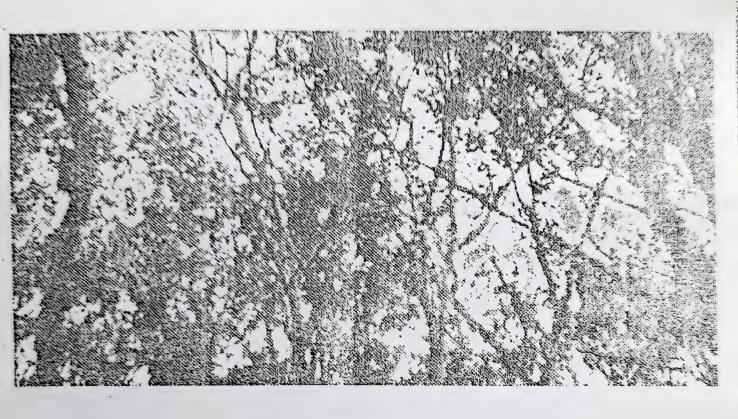
শান্তিনিকেতন ● নব-তপোবন ● সবিতা ও সাবিত্রী

বাংলার এক নগণ্য পল্লীগ্রামে আমার জন্ম। দশ এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ঐরূপ দু-একটি অখ্যাত গ্রাম ভিন্ন আমি তার কিছু দেখিনি। রেলগাড়ীতে চড়া দূরে থাক, রেল-লাইন পর্যন্ত কখনো আমার চোখে পড়েনি।

তখন আমি আমাদের পাশের গ্রামের এক মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়ি। হঠাৎ খবর এল আমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হবে। শান্তিনিকেতনে আমার বড়মামা থাকতেন। তাঁর কাছে পূর্বে সেখানকার কথা অনেক শুনেছিলাম:

"হরীতকী, আমলকী ও শাল বনের মধ্যে ছোট ছোট কুটীর। তার মধ্যেই বাস করেন শিক্ষক ও ছাত্রগণ। বিদ্যালয়ের জন্য কোনো ঘর নেই। গাছের নীচে মাটিতে আসন পেতে বসে ছেলেরা এবং মাটির উপর আসনে বসেই শিক্ষা দেন শিক্ষকেরা। বৃষ্টির সময় অনধ্যায়। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে, অথবা উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো খোয়াইয়ের মধ্যে যেখানে বৃষ্টিধারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতের বেগে ছুটে চলেছে অদূরবর্তী স্রোতস্বিনী কোপবতীর দিকে।

"জ্যোৎস্না রাত্রে, কখনো বা প্রান্তরে, কখনো বা অনতিদূরবর্তী পারুল বনে, হয় গানের আসর, হয় বনভোজন।

"গ্রীষ্মকালে খাটিয়া বের করে আশ্রমবাসীরা শয্যা পাতে কুটীরের

বাইরে, তারকা-খচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে। কেউ বা প্রকাণ্ড শাল-বৃক্ষের শাখায় রশি দিয়ে খাটিয়া বেঁধে আপন মনে দোল খেতে খেতে নিদ্রা যায়।"

এই সব শুনতে শুনতে শান্তিনিকেতন আমার কল্পনায় স্বর্গলোকের স্থান অধিকার করেছিল। সুতরাং সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে, একথা যখন শুনলাম, তখন আমার মনের ভাব কেমন হয়েছিল— তা ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমার নাই।

অবশেষে একদিন সেই শান্তিনিকেতনেই উপস্থিত হলাম। আমার কল্পিত স্বর্গলোকে প্রবেশের সময়টিও উল্লেখযোগ্য।

গভীর রাত্রি, গো-যানে করে প্রবেশ করলাম—এক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন আম্রকানন ও শালবীথির মধ্যে। দেখলাম ঐ কানন-বীথির মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে ইতস্তত গুটি কয়েক কুটীর। এইরূপ এক কুটীরের সম্মুখে শালবৃক্ষে দোলায়মান-শয্যায় শায়িত এক কিশোরকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমার মাতুলের ঠিকানা। মাতুলের বাসস্থান ছিল ঠিক ওই কুটীরেরই পাশে। সুতরাং সহজেই সেখানে পৌঁছলাম।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সহসা রজনীর সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করে নানা জাতীয় বিহঙ্গের সুমধুর কলস্বন দিক-দিগন্তে ধ্বনিত হলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতলয়ে, দীর্ঘকালব্যাপী এক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুতিগোচর হলো। তার অব্যবহিত পরে মানবশিশুর কলস্বর আমার শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করল। বিদ্যার্থীরা শয্যাত্যাগ করল। শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য, গৃহসংস্কার, ব্যায়াম, স্নান, উপাসনা, জলযোগ ইত্যাদি ঘণ্টা সংকেতের দ্বারা সুনিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হলো। আমার কাছে সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল।

অবশেষে, আমার সেই কল্পনার স্বর্গলোকে, আমিও আমার স্থান গ্রহণ করলাম। অজ-পল্লীগ্রাম হতে এসেছিলাম—পদে পদে আমার

অজ্ঞতা, মূর্খতা প্রকাশ পেতো। তাতে সহপাঠীদের উপহাস—বিদ্রূপ কম সহ্য করতে হতো না। কিন্তু তাতে আমার আনন্দের কোনো ব্যাঘাত হতো না, অতিরিক্ত মাধুর্যের মধ্যে এই কটুতিক্ত রসেরও যেন বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

প্রথমেই আমার সমবয়সী ছেলেরা আমাকে বলল—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো না, রবিবাবু বলো না—বলো গুরুদেব। গুরুদেব আমাদের বড়ো ভালোবাসেন—আমাদের ক্লাস নেন, গল্প বলেন, বেড়াতে নিয়ে যান।"

আমি তো অবাক্! এরা বলে কি! এখানে আসার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের দু-একটি কবিতা আমি পড়েছিলাম। তিনি কবি। নতুন অপরূপ ছন্দে কবিতা লেখেন। সে কবিতাগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হয়। এমন লোককে আমার মতো পাড়াগেঁয়ে বালক দেবতা বলেই মনে করত। সেই দেবতা যে আবার মানুষের সঙ্গে, বিশেষ আমাদের মতো অর্বাচীন বালকদের সঙ্গে এমনভাবে মেশেন—এ কথা আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। আমার মুখ চোখের ভাব দেখে, সঙ্গীরা আমাকে বলল—"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। চলো তোমাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই।"

তারা আমাকে জোর করে গুরুদেবের কাছে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম—তা একমাত্র তাঁর কবিতার ভাষাতেই প্রকাশ করা যায়। গ্রাম্য মধ্য বিদ্যালয়ে তাঁরই 'কথা কাহিনী'র বুদ্ধের বর্ণনা পড়েছিলাম ঃ

> বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
> নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
> দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর পরে
> করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।"

যা তাঁর কাব্যে পড়েছিলাম—তাই চক্ষের সমুখে প্রত্যক্ষ করলাম। ক্রমে ক্রমে অন্যদের মতো আমারও তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লেন। তখন

ভুলে গেলাম তিনি কত বড়, কত দেশজোড়া তাঁর নাম।

কি গ্রীষ্ম, কি শীত, ভোর চারটের পরই আমাদের উঠবার ঘণ্টা পড়ত। উঠেই আমরা যখন শৌচে যেতাম, দেখতাম গুরুদেব তাঁর ঘরের বারান্দায় চৌকিতে বসে আছেন। তখন তাঁর প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি হয়ে গেছে।

প্রাতঃকালেই আমাদের ক্লাস আরম্ভ হতো। বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন গুরুদেব। সাড়ে ছ'টা সাতটা হতে বেলা সাড়ে দশটা এগারটা পর্যন্ত, প্রায়ই তাঁর ক্লাসের বিরাম থাকত না। কী চিত্তাকর্ষক ছিল তাঁর পড়ানো। আমরা তাঁর ক্লাসের জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকতাম।

আমাদের পড়ানোর জন্যে তাঁর কী আগ্রহ, কী যত্ন। কত পরিশ্রম! সমস্ত দুপুর ধরে তিনি পাঠ তৈরী করতেন। খাতায় নিজের হাতে পাঠ লিখে নিয়ে আসতেন। তাঁর পাঠ শুনবার জন্যে, অন্য শিক্ষকগণও যাঁর যখন অবসর এসে বসতেন।

বিকেলে খেলাধূলার পর হতো সান্ধ্য-উপাসনা। সান্ধ্য-উপাসনার পর, নৈশ ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত (ঘণ্টাধিক) যে সময় থাকত, সেই সময়ের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বিনোদনপর্ব', অর্থাৎ ঐ সময় ছাত্রদের চিত্ত-বিনোদনের সময়। চিত্তবিনোদন হতো সাহিত্যসভা, গানের জলসা এবং অভিনয়ের দ্বারা।

এত বড় কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞের অব্যবহিত সঙ্গলাভ করে এবং তাঁরই উৎসাহে নিতান্ত শিশু পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি, সঙ্গীত ও অভিনয়ের চেষ্টা করত। যাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রতিভা থাকত, তাদের তো কথাই নেই। যারা নিম্নশ্রেণীর মেধার অধিকারী, তাদেরকেও মেজে ঘষে, তিনি চলনসই লেখক বা অভিনেতা করে তুলতেন। আমার মতো সাহিত্যিক প্রতিভাহীন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও যে আজ কলম ধরতে পেরেছে—সেও তাঁর শান্তিনিকেতনের ওই অপূর্ব পরিবেশের যাদু-স্পর্শে।

সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নিয়ে তিনি নাটক অভিনয় করাতেন। সাধারণত ছোটদের জন্যে লেখা তাঁরই 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গ কৌতুক' আদি গ্রন্থ হতে নাটক নির্বাচন করে আমরা অভিনয় করতাম।

তিনি তাতে তেমন সন্তুষ্ট হতেন না। বলতেন—"তোমরা নিজেরা নাটক তৈরি করে অভিনয় করো।"

এরূপ অসীম ধৈর্যশালী, পরম আশাবাদীর চেষ্টায়, মাঝে মাঝে কোনো কোনো শিশু-হস্তেও সাহিত্যের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হতে লাগল। তখন তাঁর কী আনন্দ!

জ্যোৎস্না রাত্রে, তিনি আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—কখনো মাঠে, কখনো খোয়াই-এ, কখনো পারুল বনে। প্রবল বর্ষণের মধ্যে, তাঁর সঙ্গীত রাজ্যের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথকে এবং আমাদের মতো বালখিল্যদের নিয়ে তিনি ভিজতে বেরুতেন। বারিবর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিনেন্দ্র-রবীন্দ্র কণ্ঠের অমৃতবর্ষণ হতো। সে অমৃতের আস্বাদ জীবনে যে একবারও লাভ করেছে, তা তার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে গেছে।

রাত ন'টায় পড়ত শোবার ঘণ্টা। শোবার পূর্বে পালা করে এক এক কুটীরে গুরুদের গল্প বলতেন। আমাদেরই কারো বিছানো বিছানায় তিনি জমিয়ে বসতেন। আর আমরা চারপাশে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়তাম গল্প শোনার জন্যে। সে কী আনন্দ! সে কী সৌভাগ্য!

ছেলেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন মৃদু কণ্ঠে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, তিনি কুটীর থেকে অন্য কুটীরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতেন। বদ্ধ বাতায়ন খুলে দিতেন। শীতকালেও কোনো সুস্থ বালকের সকালে স্নান বা রাত্রে শয়নগৃহের বাতায়ন বন্ধ তিনি কোনোরূপেই বরদাস্ত করতেন না। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বড় কঠোর।

এইভাবে সেই জগৎজয়ী অপূর্ব প্রতিভার অমূল্য সময়, এক অখ্যাত বিদ্যালয়ের কয়েকটি অর্বাচীন শিশুর সেবায় ব্যয়িত হতো। এত

নীরবে তিনি এই কাজ করে যেতেন যে বাংলার বহু প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতীরও তা অগোচর থাকত।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষ পরে আমি যখন বিশ্বভারতীর পাঠ সমাপ্ত করে সমাজসেবা উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে যাই, তখন এক সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকায় সমস্ত দিন কাটাবার সৌভাগ্য লাভ করি। আমি বাল্যকাল হতে শান্তিনিকেতনে ছিলাম শুনে তিনি আমার আশ্রম জীবনের কথা জানতে চান।

আমি যখন আমার ছাত্রজীবনের কথা বলি, তখন তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—"বলো কি হে, বলো কি! তাঁর অমূল্য সময়, ঐ ভাবে তোমাদের দিয়েছেন। তোমরা যে সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছ! ঐ সময়ে আরো কত অপূর্ব সৃষ্টিই না তিনি জগৎকে দান করতেন!"

কথাটা এক দিক দিয়ে সত্য। কিন্তু সেই অপূর্ব প্রতিভা কোনো বিষয়কে তুচ্ছ মনে করেননি। শিশুশিক্ষা, যা এককালে আমাদের দেশে যার-তার দ্বারা অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেওয়া হতো, তা তাঁর কাছে অতি মহৎ কর্তব্য বলেই মনে হয়েছিল। তাঁর বাল্যকালের শিক্ষারূপ-শাস্তির কথা মনে গেঁথে ছিল বলেই তিনি তাঁর সারা জীবন তাঁর কাব্যসাধনার ন্যায় শিক্ষাদানকেও সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। কাব্যসাধনার ন্যায়, শিক্ষার জন্যও তিনি সহর্ষে, অকুণ্ঠিত চিত্তে, অপর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করেছেন। সময়ের যে অপব্যয় হয়নি—তার প্রমাণ আজকের এই বিশ্বভারতী।

একেও সেই মহাকবির অন্যতম কাব্য বলে গণ্য করা যেতে পারে।

—বার্ষিক শিশুসাথী, ১৩৬৮

নব-তপোবন

❁

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তবরূপ কি তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব।···কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা, আবিলতা, অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঐ কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল, ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে।

পরবর্তীকালের কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল, শান্তসুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন একসময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল, আধুনিককালের কোন একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে-প্রেরণা কাব্যরূপ রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল, কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল,

ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে। কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে, সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানব-চিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়।...গুরুর মন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে।...

আরও একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন।...যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়, প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি।

...আর একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্ব-প্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না; গাছের ডালে তারা চায় ছুটি।

ভারতের তপোবন রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে-ছিল, ভাববিলীন তপোবন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিভাবে আকার গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'[১] পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। আমরা তারই এক অংশ প্রবন্ধের ভূমিকারূপে ব্যবহার করলাম।

---

১ বিশ্বভারতী—Bulletin No 29. 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'—রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, আষাঢ়, ১৩৪৮।—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ, পৃঃ ৭২৫-২৬

১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (১৩০৮ সালের ৭ পৌষ) রবীন্দ্রনাথের মানস তপোবন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (বা ব্রহ্মবিদ্যালয়) নামে প্রত্যক্ষরূপ গ্রহণ করল।

ঋষিগণ তপোবনে তপস্যা করতেন। তাঁদের তপস্যাতেই তপোবন গড়ে উঠত। তপস্যা সুখের নয়, দুঃখের। কঠোর ক্লেশ, অপরিসীম দুঃখতাপ এবং বিরাট ত্যাগের দ্বারাই তপস্যা সম্ভব হতো।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তপোবন সৃষ্টির শুরু হতেই তপস্যার কঠোরতাপে পরিতপ্ত হতে থাকেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই (২৩ নবেম্বর, ১৯০২, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ, কন্যা মীরার বয়স দশ, এবং কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স আট।

পত্নীবিয়োগের নিদারুণ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি মাতৃহীন শিশুকে আনন্দদান করবার জন্য 'শিশু'র কবিতা (১৯০৩ সালে) রচনা করলেন। তপস্বীর তপস্যার ফল সমস্ত পৃথিবী উপভোগ করে; রবীন্দ্রনাথের তপোলব্ধ 'শিশু'ও পৃথিবীর সকল শিশুর আনন্দের সামগ্রী হলো।

রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথের মতো আর যে-কটি বালক তখন রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে এসেছিল তারাও সন্তানবৎ নিবিড় স্নেহে পরিপালিত হতে লাগল।

আঘাতের উপর আঘাত। কবির পত্নীবিয়োগের ছ'মাসের মধ্যেই (মে ১৯০৩ সালে) তাঁর কন্যা রেণুকার মৃত্যু হলো।

অতঃপর ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারী (৬ মাঘ, ১৩১১ সাল) রবীন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেহত্যাগ। পিতা যে রবীন্দ্রনাথের কাছে কী ছিলেন, তা যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েছেন তাঁরাই জানেন।

পিতৃবিয়োগের দু'বছরের মধ্যেই ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে

(৭ অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল) কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মুঙ্গেরে আকাস্মিক-ভাবে মৃত্যু ঘটল।

পত্নীবিয়োগ, পিতৃশোক, পুত্রকন্যার মৃত্যু, মনুষ্যজীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দুঃখ, তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পেয়ে গেছেন।

এরও উপরে ছিল বন্ধুবিয়োগের ব্যথা! পরম প্রীতিভাজন শিষ্য এবং সহকর্মীর মৃত্যু।

১৯০৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারী (১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমায়) রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহের পাত্র, সহকর্মী এবং সহধর্মী কবি সতীশচন্দ্র রায়ের অকালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়।

১৯০৮ সালের ৯ নভেম্বর (২৩ কার্তিক, ১৩১৫ সাল) রবীন্দ্র-নাথের অন্তরঙ্গ সমবয়সী বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পরলোকগমন করেন।

উপর্যুপরি এই শোকের সময় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কি বিচিত্র-ভাবের লীলা চলেছিল—তা তাঁর ভাষাতেই বলি ঃ

"উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

—তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

"সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে-বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই, সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।"

এ কথা, কেবল কথার কথা নয়, পরম দুঃখের ভিতর দিয়ে,

অপরিসীম শোকে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে এর প্রত্যেকটি শব্দ উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

১৩১৪ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু'মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'দুঃখ'[২] শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন :

"সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আরএকদিক দিয়া বলা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

—আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

"আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

"কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে, সেই ফসলে তার তপস্যা যত বড়ো তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরমদুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

"খ্রীষ্টানশাস্ত্র বলে, ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ।...

"বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে।...

"হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা, উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা, তোমাকে ভয়ে, দুঃখে, মৃত্যুতে, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না—এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করিতে থাকুক—এই আশীর্বাদ করো।"

২ 'দুঃখ', ধর্ম—৯৮-১১২ পৃষ্ঠা (প্রথম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ ফাল্গুন)

কবির প্রার্থনা অন্তর্যামী শুনেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ অঝোর ধারায় কবির উপর বর্ষিত হয়েছিল। দুঃখে, শোকে, বিপদে, তিনি কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হন নাই।

"দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হোক—" রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনাও তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছিল।

"দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না।"

বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করলে যেমন বিচিত্র সুরের ঝরনা বয়ে যায়, দুঃখের আঘাতে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হতেও তেমনি কাব্য ও সঙ্গীতের অমৃতধারা প্রবাহিত হলো। পঞ্চাতপ তপস্যার অগ্নি হতে বহির্ভূত রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ১৯১৩ সালে সেই তপঃসিদ্ধ রবির রশ্মি সমস্ত জগৎকে আলোকিত করল।

যখন জগৎজোড়া তাঁর খ্যাতি, বিশ্ব যখন তাঁর প্রতিভামুগ্ধ, তখন কবি নিভৃতে, একান্তে, নিঃশব্দে, নিতান্ত অখ্যাত এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে সামান্য কয়েকজন বালককে সন্তানের ন্যায় অপরিসীম স্নেহে পালন এবং শিক্ষাদান করছেন। শিশু-শিক্ষা এবং কাব্যসাধনা সমান নিষ্ঠায়, একইসঙ্গে তিনি নীরবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

"তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তপস্যার গতিমান্ ধারায় শিষ্যদের গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে, সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য-জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়।"

রবীন্দ্রনাথের ঐ আদর্শ গুরুকে আশ্রমবাসিগণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন—তাই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের গুরুদেব।

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি ১১/১২ বৎসর বয়সে, আমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করি, তখন হতে আমার দীর্ঘ ছাত্র-জীবনে আমি স্বয়ং

প্রত্যক্ষ করেছি—প্রভাতে শয্যাত্যাগ হতে, রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিদ্যার্থিগণ তাঁর 'অব্যবহিত সঙ্গ' পেয়েছে।

পিতা এবং পিতামহকে শিশুগণ যে-ভাবে পেয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের শিশুগণ সেই-ভাবে পেয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে পিতা এবং পিতামহ। এমন এক গুরু যাঁর মধ্যে পিতা এবং পিতামহের সত্তা লীন হয়েছে।

তিনি যখন দেশে থাকতেন, তখন তাঁর অধিকাংশ সময় শান্তি-নিকেতনেই কাটত। আবার শান্তিনিকেতনেও তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়েই কাটাতেন।

ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয়বর্গে (Class V, VI, VII, VIII) তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। ছেলেদের পড়াবার জন্যে তিনি "ইংরেজি সোপান" প্রথম (১৯০৪-এ) এবং দ্বিতীয় (১৯০৬-এ) ভাগও[৩] রচনা করেছিলেন। সেই পদ্ধতিতেই (direct method-এ) তিনি এবং আশ্রমের ইংরেজি-শিক্ষকগণ ইংরেজি পড়াতেন। আমার বেশ মনে আছে, সকাল সাতটা হতে বেলা দশটা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ক্লাস নিয়ে চলেছেন। ইংরেজি ভাষারই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্লাস। সেই সব ক্লাসে ইংরেজি-শিক্ষকেরা এবং অন্য শিক্ষকগণ, যাঁদের তখন ক্লাস থাকত না, যোগ দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি এমন চিত্তাকর্ষক ছিল যে, যে-সব ছাত্রেরা ক্লাস ফাঁকি দিতে ওস্তাদ, তারাও তাঁর ক্লাসে নিয়মিত আসত। অনেক সময় আগে ভাগে আসত। তিনি ক্লাস নিচ্ছেন, না গল্প বলছেন, না আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন, বুঝবার উপায় ছিল না। ক্লাসের ঘণ্টা

---

৩ শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্যে যেমন তিনি 'ইংরেজি সোপান', 'ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা (১৯০৯)', 'অনুবাদচর্চা (১৯১৭)' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন, তেমনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্যেও 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৬ সনে তিনি রচনা করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে (১৯০৮-৯ সাল পর্যন্ত) সংস্কৃতের ক্লাসও তিনি নিয়েছিলেন।

যে কোথা দিয়ে কখন শেষ হয়ে যেত তা জানতেও পারতাম না। পরের ঘণ্টায় ক্লাস না থাকলে, অনেক সময় আমরা তাঁর পরবর্তী ক্লাসেও বসে থাকতাম।

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় অন্যত্র কবি লিখেছেন—

"সবশেষে বলব আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ, তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক।"

তাঁর এই শিক্ষকের আদর্শ তাঁর জীবনেই মূর্তিগ্রহণ করেছিল।

আমি স্কুলে প্রায় চার এবং কলেজেও দু'বছর তাঁর কাছে পড়েছি। তাঁর অসীম ধৈর্য এবং অফুরন্ত স্নেহ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেছি।

আমার শান্তিনিকেতনে আসার দু'এক বছর পূর্বে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এমন অদ্ভুত যে, তার উল্লেখ এখানে না করে পারছি না।

পূর্বে বলা প্রয়োজন, অনেক অভিভাবকের ধারণা হয়েছিল, দুষ্ট-দুর্দান্ত ছেলেদের সংশোধন করাবার জন্যে রবিবাবু তাঁর স্কুল করেছেন। সেজন্যে যে-সব ছাত্র কোথাও বেশীদিন আশ্রয় পেত না, অভিভাবকগণও যাদের বাগ মানাতে পারতেন না, তাদের 'বোলপুরে' পাঠিয়ে দিতেন।

এরূপ ছাত্রদেরই শীর্ষস্থানীয় এক ছাত্র আসাম হতে এসেছিল। সে অবশ্য অসমীয়া ছিল না—ছিল বাঙালী।

একদিন ক্লাসে তার অশোভন ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যকেও গভীর ভাবে নাড়া দিল। তিনি তাকে সামনে ডেকে কান মলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ যা ঘটল, তা যেমন অভাবনীয় তেমনি অপ্রত্যাশিত। নিকটেই ছিল কিছু থান ইঁট। চক্ষের পলকে সেই দুর্দান্ত বালক তার থেকে একখানা ইঁট তুলে নিল। সেটি সে গুরুদক্ষিণার জন্যেই নিয়েছিল, কিন্তু গুরুদেবের আশপাশের গুরুগণ তৎক্ষণাৎ সেই 'অসাধারণ দক্ষিণাটি' তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। একটা মহাবিপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা পেলেন।

তিনি কিন্তু নির্বিকার, প্রশান্ত, গম্ভীর! ছাত্রটিকে লেশমাত্র ভৎর্সনা তিনি করেননি। শিক্ষকদেরও তাকে শাসন করতে নিষেধ করে দেন। সেই অতি-দুর্দান্ত ছাত্রটিও অবশেষে গুরুদেবের বশীভূত হয়।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে এলাম তখন সেই অসাধারণ বালকটি আশ্রমে স্বনামধন্য। তার ঐ কীর্তি তাকে আরও সুচিহ্নিত করেছে। তার সঙ্গে ভাব হওয়ার পরে, একদিন সঙ্গোপনে তাকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা ভাই, তুমি ত গুরুদেবকে খুবই ভালোবাস। তিনিও দেখি তোমায় বড় ভালোবাসেন, তবু নাকি তুমিই একদিন তাঁকে থান ইঁট দিয়ে মারতে গেছলে।"

বালকটি নিতান্ত অনুতপ্তচিত্তে উত্তর দিল—"আরে ভাই, আমি কি জানতাম উনি 'গুরুদেব'! আমি ভেবেছিলাম—'মা-ষ্টা-র'।"

তখনকার দিনে আমাদের দেশে মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কেমন ছিল, এবং আমাদের গুরুদেবই বা ছাত্রদের কাছে কেমন ছিলেন সেই অসাধারণ দুর্দান্ত বালকটির এই উক্তি তার সাক্ষ্য রেখে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আজ পর্যন্ত মনে আছে, চরমশাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি, যার জন্যে অনুতাপ করতে হয়নি।"[৪]

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে গুরুদেব সকালে ক্লাস নিতেন, দুপুরে পাঠ তৈরি করতেন, সন্ধ্যায় আবৃত্তি অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রে আহারের পর শোবার আগে পালাক্রমে ছেলেদের ঘরে বসে গল্প বলতেন। ছাত্রেরা নিদ্রা গেলে, তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন—কোনো ঘরের জানালা বন্ধ আছে কি না। শীতকালেও জানালা খোলা রাখতে হতো।

শিক্ষা তো রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল ক্লাস নেওয়াতেই পর্যবসিত ছিল না।

---

৪ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'—পৃঃ ৮।

"নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই (গুরু) সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান"—তাঁর নিজেরই এই আদর্শ অনুসরণ করে প্রভাতের জাগরণ হতে রাত্রের বিশ্রাম পর্যন্ত শিশুদের তিন 'অব্যবহিত সঙ্গ' দিয়েছেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে পারুল বনে, ছাত্রদের নিয়ে তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ গানের ঝরনা বইয়ে দিতেন। বর্ষার অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে সুরের ধারার সঙ্গে খোয়াই-এর ধারা বেয়ে শিষ্য-পরিবৃত গুরুদেবের অভিযান চলত।

আশ্রমের ষড়-ঋতুর নব নব রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত এবং সঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে, নববর্ষ বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি ঋতু উৎসবে, নৃত্যে, গানে, অভিনয়ে ছাত্রদের মাতিয়ে তুলত।

গুরুদেবের 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি প্রহসনগুলি সন্ধ্যায় 'বিনোদনপর্বে' ছেলেদের আনন্দদানের জন্যেই (১৯০৭ সালে) রচিত হয়েছিল। আমরা তাঁর সেই সব প্রহসন ও নাটক অভিনয় করতাম। বেশ মনে আছে, গুরুদেব একদিন আমাদের বললেন, "তোমরা কেন নিজেরা প্রহসন রচনা কর না? নিজেরা প্রহসন ও নাটক রচনা করে অভিনয় কর—সে আরও মজার হবে।"

প্রথমটা সকলে ভড়কে যাই। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। মনে আছে, ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে তিনি আমাদের দিয়েই নাটক তৈরি করিয়েছেন। আমাদের নিজেদের রচিত প্রহসনাদি আমরা অভিনয় করছি, সে যে সাপ ব্যাঙ কি হয়েছিল কে জানে, কিন্তু গুরুদেব তাই দেখেই মহা উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।[৫]

---

৫ ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের জন্য গুরুদেব, হেঁয়ালি কৌতুক-নাট্য রচনা করেছিলেন। যেমন 'হাস্যকৌতুকের'—'রোগের চিকিৎসা।' এই হেঁয়ালির মধ্যে—'হাঁস', 'পা' ও 'তাল (তাল বড়া)'-এর বারংবার উল্লেখ আছে। সর্বশেষে নাটকের নায়ককে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখানে হেঁয়ালির উত্তর হলো—'হাঁসপাতাল।'

এই ভাবে তাঁর ছাত্রদের তিনি কবি, লেখক, সাহিত্যিক করবার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রদের রচনা প্রতি সপ্তাহে 'সাহিত্য সভায়' পড়া হয়েছে। 'সাধারণের বক্তব্যে' ছাত্রগণ কর্তৃক তার প্রশংসা হয়েছে—নিন্দাও হয়েছে।

স্কুলে শিশুদের, বালকদের, কিশোরদের পৃথক পৃথক 'সাহিত্য সভা' হতো। আজও সে ধারা চলে আসছে।

প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী যাতে তার মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর কল্যাণে আমরা অনেকেই আজ কলম ধরতে শিখেছি। আমাদের মধ্যে থেকেই প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, রাণী চন্দ, মহাশ্বেতা (ঘটক) ভট্টাচার্যের উদ্ভব হয়েছে।

শিক্ষা বলতে 'শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ'—রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে তাঁর বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই রূপ দেওয়ায় চেষ্টা করেছেন।

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশে' তিনি লিখেছেন ঃ

"আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক, আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্বদা দমন করা হয়। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হোতে থাকে ; আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।...

"এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা

আমার মনে আছে গুরুদেবের পীড়াপীড়িতে আমরা 'পাগোল' নামে এইরূপ একটি হেঁয়ালি কৌতুক-নাট্য রচনা করি। নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ছিল —'পা'-এর কথা, দ্বিতীয় দৃশ্যে—'গোল (ফুটবল)' এর কথা। তৃতীয় দৃশ্যে হয়েছিল এক 'পাগোল (-পাগল)'-এর আবির্ভাব।

এখন সেই পাগলামির কথা মনে হলে হাসি পায়। গুরুদেব কিন্তু মহা উৎসাহে সেই নাটক দেখেছিলেন।

ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।"*

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনটি বিভাগ ছিল—আদ্য, মধ্য, শিশু। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের জন্য এক বা একাধিক ছাত্রাবাস ছিল। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের জন্যে একজন নায়ক, প্রতি পনের দিন অন্তর নির্বাচিত হতো। ছাত্রেরাই তাদের নির্বাচন করত।

এইভাবে প্রত্যেক বিভাগেরও একজন নায়ক নির্বাচিত হতো। সর্বোপরি থাকতেন একজন সর্বাধিনায়ক (general captain)। তিনিও ছাত্র, এবং ছাত্রদের দ্বারাই তাঁরও নির্বাচন হতো। তাঁর কার্যকাল হতো এক মাস। বৎসরের প্রথমে বারোজন সর্বাধিনায়কের একটি প্যানেল (panel) তৈরি হতো।

যে-কোনো নায়কের আদেশ ছাত্রদের নির্বিচারে গ্রহণ করতে হতো। তার সম্বন্ধে তখন কোনো তর্ক চলত না। পরে অবশ্য তার বিরুদ্ধে উপরওয়ালার কাছে বিচার প্রার্থনা করা যেত।

সর্বাধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধেও বিচার প্রার্থনার অবকাশ ছিল। কেন না, সর্বোপরি ছিল এক 'বিচার সভা'। বিচার সভার সভ্যগণও ছাত্র এবং তাঁরাও ছাত্রদের দ্বারাই নির্বাচিত হতেন। 'বিচার সভা'র ক্ষমতা ছিল খুব বেশি। কোনো ছাত্রকে আশ্রম হতে বিদায় দেবার অধিকার পর্যন্ত এই সভাকে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সভার এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত ছাত্র-পরিচালক (শিক্ষক) এবং গুরুদেবের সমর্থনের জন্যে পাঠান হতো।

পাকশালাতেও ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি-ছাত্র থাকতেন। পাকশালার পরিচালক (বেতনভোগী কর্মী) তাঁর পরামর্শ নিতেন। এ ছাড়া দু'জন 'ডেলি ম্যানেজার' (daily manager) ছাত্র পাকশালার কাজে সাহায্য করতেন। প্রতিনিধি তাদের নির্বাচন করতেন।

রান্নাঘরের প্রতিনিধি, আশ্রম সম্মিলনীর সম্পাদক সাহিত্য সভার

---

৬ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'—পৃঃ ৫-৬

এবং সাহিত্য পত্রিকার (হাতে লেখা) সম্পাদকগণ সাধারণতঃ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন।

এই ভাবে আশ্রমের সমস্ত বিভাগের পরিচালনায় ছাত্রদের আশ্চর্য রকমের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে এরূপ স্বায়ত্তশাসন রবীন্দ্রনাথই ভারতে প্রবর্তন করেন। তার পূর্বে পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ স্বায়ত্তশাসন আর কেউ প্রবর্তন করেছিলেন কি না জানি না।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকেই এই স্বায়ত্তশাসন চালু হয়েছিল।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরও রবীন্দ্রনাথ ক্লাস নিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা Wordsworth, Shelley প্রভৃতি পড়েছি। বাংলা বলাকা পড়েছি। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Le´vi) তাঁর বলাকা ক্লাসে যোগ দিতেন। লেভি বাংলা জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের সংসর্গ, তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রকাশভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি তাঁকে আকৃষ্ট করত। সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষার যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম, উপরি পাওনা হিসাবেই তিনি গ্রহণ করতেন। আজও আমার চক্ষের সম্মুখে ভেসে আসছে তাঁর ছবি। গুরুদেবের পাশে বসে পাশের কানটিতে হাতের আঙ্গুলগুলিকে চোঙার মতো করে ধরে ঝুঁকে পড়ে তিনি গুরুদেবের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনছেন। 'লোচনৈঃ পীয়মানঃ'—বলে গেছেন কালিদাস। আমরা সেদিন দেখি—'লোচনৈঃ শ্রবণৈঃ সর্বেন্দ্রিয়ৈঃ পীয়মানঃ' চক্ষু কর্ণ এবং সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের রূপ, কণ্ঠস্বর ; ভাষা ও ভাষণ।

উত্তরায়ণ নির্মিত হবার পূর্বে গুরুদেব দেহলীতে[৭] বাস করতেন। দেহলীর উপর তলায় আমি প্রথম তাঁর ক্লাশে যাই।

---

৭ রবীন্দ্রনাথের পুরাতন আবাস 'দেহলী' জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। তার সংস্কার করতে গিয়ে দেখা গেল সমস্তই খসে পড়ছে। তখন দেহলীকে সম্পূর্ণ নতুন করেই নির্মাণ করতে হলো। দেহলীর মাঝখানের ঘরটি, কয়েকটি দরজা জানালা এবং দুটি সিঁড়ি পূর্বের চিহ্ন বহন করছে। দেহলীর আকৃতি অবশ্য পূর্বেরই মতো। প্রধানত বর্তমান উপাচার্য মহাশয়ের উদ্যোগেই দেহলীকে আমরা ফিরে পেলাম।

উত্তরায়ণে প্রথমে দুটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ী তৈরী হয়, একটি গুরুদেবের জন্যে, অন্যটি এন্‌ড্রুজের জন্যে। এন্‌ড্রুজের বাড়ীটিতে পরে পিয়ার্সন বাস করতেন।

উত্তরায়ণে বাসকালীন গুরুদেব ক্লাশ নিতেন পুরানো ঘণ্টাতলার এবং বর্তমান 'সন্তোষালয়ে'র (শিশুবিভাগের) মধ্যবর্তী স্থানে। সেখানে একটি 'উটজ' নির্মিত হয় তাঁর ক্লাশের জন্য। কয়েকটি খুঁটির উপর একটি গোলাকৃতি চালা। গোলাকৃতি অনতি-উচ্চ মাটির বেদীর তিনদিকে ছাত্রেরা বসতেন, গুরুদেব মাঝখানে। স্কুল ও কলেজের দুইয়েরই ক্লাশ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্গে (Class VI, VII, VIII), তিনি আমাদের প্যাণ্ডোরার কাহিনী, আন্‌টিয়াস, হারকিউলিস ও বামনদের গল্প, ম্যাথিউ আরনল্ড-এর 'সোরাব রোস্তাম' এবং রাসকিন (Ruskin)-এর কিছু অংশ পড়ান।

আমার মনে আছে তৃতীয় বর্গে (class VIIIএ), Matthew Arnold-এর 'সোরাব রোস্তাম' কাব্য কেমন করে তিনি পড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই পড়ানোর কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দিই :

'সোরাব রোস্তাম' কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের অনুরূপ বাক্য তিনি তাঁর খাতাতে লিখেছিলেন। আবার সেই বাক্যের অনুরূপ অপেক্ষাকৃত সহজবাক্যও তাঁর সেই খাতায় লেখা ছিল। এইরূপ চার দফা, ছয় দফা, কখনো বা আট দফা বাক্য তিনি রচনা করতেন। ইংরেজি বাক্য এবং তার বিশুদ্ধ বাংলা প্রতিবাক্য।

প্রথমে সর্বশেষ দফার সহজ ইংরেজি বাক্য তিনি আমাদের খাতায় লেখাতেন। আমাদের তার বাংলা করতে হতো। সকলের বাংলা করা হলে তিনি আমাদের তাঁর নিজের অনুবাদ করা বাংলা বাক্যটি শোনাতেন এবং তা-ও খাতায় লিখে নিতে বলতেন। আমাদের নিজেদের করা বাংলা বাক্যটির সঙ্গে, তাঁর তৈরি বাংলা বাক্যটি মিলিয়ে দেখতে বলতেন।

এর পর খাতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে ঐ বাংলা বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ করাতেন। শেষে যে যার ইংরেজি অনুবাদ খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখত। তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এর পর 'প্রথমে খাতায় লেখা' তাঁর সেই ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে আমাদের নিজেদের করা ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি বাক্যের দোষগুণ বিচার করতে হতো। আমাদের বাক্যের দোষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ আমরা একবাক্যে স্বীকার করতাম।

এইভাবে মাসাধিক ধরে, তিন-চার থেকে, আট-দশ দফা ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের রচনা, আলোচনা, এবং তুলনা করতে করতে যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ধার এবং বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ ভার হতো, তখন 'সোরাব রোস্তাম'[৮] কাব্যটির তাঁরকৃত প্রাঞ্জল গদ্যরূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন। তারও পরে পদ্যরূপী মূল 'সোরাব

---

৮ সোরাব রোস্তাম (Sohrab and Rustum) Blank Verse-এ রচিত :

"And the first grey of morning fill'd the east,
And the fog roso out of Oxus stream.
But all the Tartar camp along the stream
Was hush'd, and still the men wore plunged in sleep :
Sohrab alone, he slept not : all night long
He had lain wakeful, tossing on his bed ;"

উপরোক্ত বাক্যগুলি হতে 'grey' 'fill' 'out of' 'along' 'hush' 'plunge' 'lie wakeful' 'toss on'—এই শব্দ ক্রিয়া, preposition ইত্যাদি ব্যবহার করে, ছাত্রদের পরিচিত এবং কৌতুকজনক বিষয় অবলম্বনে তিনি বাক্য তৈরি করতেন।

এইভাবে মূলের একটি বাক্যের জন্য, কোথাও বা তিন-চারটি, কোথাও বা পাঁচ-ছয়টি কোথাও বা সাত-আটটি বাক্য তাঁকে তৈরী করতে হতো। এইরূপ দশটি পর্যন্ত বাক্য কখনো কখনো তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে—মূলের একটিমাত্র বাক্যের জন্যে।

প্যাণ্ডোরার পেটরার কাহিনী (Pandora's Box), অ্যান্টিয়াস (Antaeus) হারকিউলিস্ (Hercules) ও বামনদের (Pygmies) গল্পেও তিনি এইরূপ একটি বাক্যের জন্যে, চার থেকে দশ দফা পর্যন্ত অনুরূপ বাক্য তৈরি করেছিলেন।

রোস্তাম' গ্রন্থখানি আমাদের সামনে ধরতেন।

অতঃপর সেই কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের কাছে আর পাণিনি ব্যাকরণের মতো ভয়ঙ্কর লাগত না। তার রস গ্রহণ তখন কঠিন হতো না।

"সবশেষে বলব, আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান।"[৯]

তাঁর এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে চরিতার্থ দেখেছি তাঁর নিজের মধ্যে।

এই সবেরই মূলে ছিল ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপরিসীম বাৎসল্য।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থে পড়েছিলাম—পণ্ডিতমশাই-এর পুত্রের কলেরায় মৃত্যু হলো। সংসারের সমস্ত দীপ্তি তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। নিদারুণ সেই শোকের মধ্যেই, একদিন সকলের সন্তানের মধ্যে তিনি নিজের সন্তানকে ফিরে পেলেন।

শরৎচন্দ্র কি 'পণ্ডিত মশাই'[১০]-এ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক জীবনই চিত্রিত করেছেন?

শমীন্দ্রনাথকে হারিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনরায় ফিরে পেলেন। পেলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে।

বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে, নীরবে, নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে, তাঁর ছাত্রদের পুত্রবৎ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এইভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এতই নিঃশব্দে তিনি এই কাজ করে গিয়েছিলেন যে, বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের অনেকেরই তা অগোচর ছিল।

১৯৩৩ সালে, শিক্ষা সমাপ্ত করে আমি যখন বাইরে যাই, তখন পূর্ববঙ্গে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একবার এক নৌকায় সারাদিন অতি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হবার সৌভাগ্য হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি বলে ওঠেন: "বলো কি হে, বলো কি। এইভাবে তাঁর অমূল্য সময় তিনি তোমাদের

৯ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'—পৃঃ ৭

১০ 'পণ্ডিত মশাই'-এর রচনাকালে এবং শমীন্দ্রনাথ-এর মৃত্যুর পরবর্তী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রদের প্রতি প্রীতি লক্ষ্যণীয়।

দিয়েছেন। এই সময়ে তিনি কত অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করতে পারতেন। তোমরা তাঁর ছাত্রেরা সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছ।”

আপাতদৃষ্টিতে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন হিসাব রবীন্দ্রনাথ কখনো করেননি। বস্তুতঃ বেহিসেবি মন নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া অফুরন্ত যাঁর ঐশ্বর্য তিনি হিসেব করবেন কোন্ দুঃখে? অজস্র ফেলিয়ে ছড়িয়েও তিনি অজস্র দান করে গেছেন।

এত সময় শিশুদের পরিচর্যায় দান করলেও তাঁর কাব্য সৃষ্টির সময়ের অভাব হয়নি। তিনি ছিলেন জিতনিদ্র পুরুষ। রাত্রি এগারটার পূর্বে তিনি নিদ্রা যেতেন না। অথচ তিনটার পরই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না।

যাই হোক, কবির ঐ সময়ক্ষেপের হিসেব-নিকেশের সময় আমরা যেন স্মরণ রাখি—কাব্য রচনা ও তপোবন রচনা, দুই-ই তিনি প্রাণের আবেগে করে গেছেন।

তিনি নিজেই বলেছেন:

“যে-প্রেরণা কাব্যরূপ রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল।”

জগতে এমন কবি আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি, যিনি একই সঙ্গে যুগপৎ দুই মহাকাব্য সৃষ্টি করে গেছেন?

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহাকাব্য[১১] ভবিষ্যজগৎ এর জন্যেও তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

প্রবাসী আষাঢ়, ১৩৬৮.

---

১১ “……when he (poet) brought together a few boys, one sunny day in winter, among the warm shadows of the *sal* trees strong, straight and tall, with branches of a dignified moderation, *he started to write a poem in a medium not of words* (italics are ours).”

A Poet's School: by Rabindranath Tagore, p. I. (*Visva-Bharati Bulletin*, No. 9.)

সবিতা ও সাবিত্রী

৩

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥

"আমার প্রতি অঙ্গ হতে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। আমার হৃদয় হতে তোমার আবির্ভাব হয়েছে। তুমি আমার দ্বিতীয় সত্তা। হে পুত্র, আমার নবরূপায়িত আমিত্ব তোমার মধ্যে। তুমি শতবর্ষ জীবনধারণ করো।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর অন্যতম সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। তাঁর সুগঠিত অঙ্গ এবং জ্যোতির্ময় হৃদয় থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার বরপুত্র। তাঁর আনন্দময় রাজ্যের যুবরাজ। বিশ্বের অসীম রূপসাগরে ডুব দিয়ে তিনি অরূপরতনের স্পর্শ পেয়েছিলেন। সেই স্পর্শে তাঁর সকল ভাবনা সোনা হয়ে গিয়েছিল। তারই বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাব্যে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরূপ যে আধ্যাত্মিক সম্পদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সাবিত্রী বা গায়ত্রীমন্ত্র তার অন্যতম। এই মন্ত্র মহর্ষির জীবনে কী স্থান অধিকার করেছিল—সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকে বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।…এই গায়ত্রীমন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে

তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

"এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন, লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে, তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।"[১]

কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, কবে কোন্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গায়ত্রীমন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন! সেই অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে, যুগে যুগে, দেশে দেশে, কত সাধক সেই মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেছেন— কত তপস্বীর জীবন সার্থক হয়ে গেছে। কত মনীষী, কত জ্ঞানী, কত বিদ্বান, কত ভাবুক, নানা দেশে, নানা ভাষায় সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন!

আজও অগণ্য ভারতবাসীর জপমন্ত্র গায়ত্রী। ধ্যানের মন্ত্র সাবিত্রী।

চারবেদের সার এই সাবিত্রী—এই গায়ত্রী। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদত্ত এই মন্ত্র জপ করতে করতে তাকে দর্শন করেছিলেন।

'মন্ত্রকে দর্শন করেছিলেন'—কথাটা অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্য। একই মন্ত্র হাজার হাজার ব্যক্তি জপ করছে, কোনো ফল হচ্ছে না। আবার একজন সেই মন্ত্র জপ করেই সিদ্ধিলাভ করলেন। মন্ত্রের স্বরূপ তিনি দর্শন করলেন।

ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হয়, তবে তো বীজ অঙ্কুরিত হবে! তবে তো ফসল ফলবে! তেমনি মনকেও প্রস্তুত করতে হয়। তবে তো মন ত্রাণ লাভ করবে! তবেই তো মন্ত্র সার্থক হবে!

অদ্ভুত শক্তিশালী এই মন। বৈদিক ঋষি বলেছেন:

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শুভসংকল্পমস্তু॥

---

১ 'ভক্ত'—শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪-৫

"যে দিব্য মন, জাগ্রত অবস্থায় দূরে, দূরান্তরে, মুহূর্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে গমন করে, সুপ্ত অবস্থাতেও যার সেই গতি তেমনি অব্যাহত থাকে, সেই দূরংগম সকল জ্যোতির একমাত্র জ্যোতি আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হোক।"

'সকল জ্যোতির একমাত্র জ্যোতি' এই মন! মন না থাকলে এই জ্যোতির্ময় সূর্যও অন্ধকারে পরিণত হয়। মূর্ছিত মানবের কাছে জগতের সমস্ত জ্যোতি লুপ্ত। সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি আমার এই মন শুভ ভাবনায় নিমগ্ন হোক!

শুভ ভাবনায় নিমগ্ন হলে এই মনই অসাধ্য সাধন করতে পারে। জগতের মহামানবগণ তার দৃষ্টান্ত। আবার অশুভ ভাবনায় নিমগ্ন হলে সৃষ্টি সে ছারখার করে দিতে পারে। এযুগে এ-ও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাই বিধাতার অপূর্ব দান—এই পরম শক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করে সমস্ত প্রাণীজগতের কল্যাণ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

মনকে মুক্ত করতে হবে, মনকে মুক্ত করতে পারে যে, ত্রাণ করতে পারে যে, সেই হলো মন্ত্র! গায়ত্রীমন্ত্র সর্বমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

দেহকে সুস্থ রাখতে হলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, আকাশের নীচে, আলোকে ও বাতাসের মধ্যে প্রতিদিন প্রভাতে ভ্রমণ করতে হয়। মনের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া, প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্যসাধু, দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্য জ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন,

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

'এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।'

"এই বিশ্বলোকের মধ্যে, সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে-শক্তি প্রত্যক্ষ

তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি, বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে, এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন।

"এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—

"যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।"

"সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে-কিরণ প্রেরণ করিতেছেন—সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে-ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে-শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি-দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি।

"বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

"বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুই-ই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া, সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রী-মন্ত্র বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

"ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই-যে-প্রাচীন বৈদিকপদ্ধতি, ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে, তাঁহার অশ্রান্ত শক্তি-দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন। এই কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ, যেমন গভীরভাবে, সমগ্রভাবে, একান্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্ক-বিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই; ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।"[২]

এই ধ্যানের জন্য কোনো কৃত্রিম প্রতীকের প্রয়োজন নাই। তাঁর আনন্দস্বরূপ এই জগৎই এই ধ্যানের স্বাভাবিক প্রতীক। এই রূপকে অবলম্বন করে সেই অরূপের ধ্যান করি।

তাঁরই প্রদত্ত আমার এই চিৎশক্তির দ্বারা সেই চিন্ময়ের ধ্যান করি।

"তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া, সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।"[৩]

রবিকরে যেমন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি সেই সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তি আমার চিত্ত-কমলকে বিকশিত করছে। বীণার মূল তারটির সঙ্গে অন্য তারগুলি যদি একসুরে বাঁধা থাকে, তবে একটিতে আঘাত করলে, অন্য তারগুলিতে অনুরণন ওঠে, ঝংকার ওঠে—আমার এই চিৎশক্তিকে যদি সেই চিৎশক্তির সঙ্গে একসুরে মিলাতে পারি, তা হলে সেই চিৎশক্তির অনুরণন হবে আমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়-বীণায় ঝংকার উঠবে। জীবন আমার মধুর সুরে, সুললিত সংগীতে ভরে উঠবে।

২ 'ধর্মের সরল আদর্শ'—ধর্ম; পৃঃ ৩৫-৩৭

৩ 'নববর্ষ'—ধর্ম; পৃঃ ৮৫

"গায়কের প্রাণের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়।...এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব—এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোন বচনগম্য অর্থও না পাই তখনও আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোন বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

"গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ, তাঁর তেজ, তাঁর শক্তি, ভূর্ভুবঃস্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।"[৪]

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়; মনে করিতে হয় আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ প্রদেশবাসী নহি, আমি যে রাজঅট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্যগ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া, নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন।"[৫]

শব্দে স্পর্শে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে, এই বিশ্বপ্রকৃতি মানব-চিত্তকে অনবরত আকর্ষণ করছে। এই দুয়েরই মধ্যে যিনি সমানভাবে,

৪ 'শোনা'—শান্তি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১
৫ 'ধর্ম', পৃঃ ৩৫

ওতঃপ্রোতভাবে মিলিয়ে রয়েছেন, যিনি অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতি, বিশ্বপ্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, আবার যিনি নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে, সমস্ত অস্তিত্বের অণুতে পরমাণুতে বিরাজ করছেন, বাহির ও অভ্যন্তর এই দুইয়েরই উৎস যিনি—এই দুইয়েরই সাহায্যে তাঁকে ধ্যান করবার উপদেশ দিয়েছেন গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

"একদিন ভূলোক, অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।"[৬]

বাহিরের এই আনন্দরূপ আমার অন্তরে আনন্দ পরিবেষণ করে। কিন্তু অন্তর আমার শুষ্ক নীরস হলে বাহিরের এই আনন্দরূপের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। অন্তর ও বাহির এই দুই-এর মধ্যেই আনন্দ সৃষ্টি করছেন যিনি, তিনি সেই রসস্বরূপ সবিতা। তাঁরই যোগে বাহিরে আনন্দরূপের বিকাশ এবং অন্তরে আনন্দের সঞ্চার।

সেই রসস্বরূপের ধ্যান বাহির ও অন্তরকে সরস ও আনন্দময় করে, উজ্জীবিত করে।

যে ধীশক্তির সহায়তায় অন্তরে সেই রসস্বরূপে ধ্যান করব, সেই ধীশক্তি তাঁর থেকেই অনবরত আমার অন্তরে প্রেরিত হচ্ছে, যে ভূর্ভুবঃস্বর্লোককে অবলম্বন করে তাঁকে ধ্যান করব—সেই ভূর্ভুবঃস্বর্লোক সতত তাঁর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে এই কথা স্মরণ করে—

"আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্ট হচ্ছে। সূর্যচন্দ্রগ্রহতারা প্রতি

৬ 'ভক্ত'—শান্তি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪

মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতি মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করেছেন—এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

"এই দেখাকেই বলে সত্য দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্য ঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোন আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে।...

"যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে দেখি তখন এইরকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে, মনকে, হৃদয়কে কিছুদূর পর্যন্ত অধিকার করে; শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে; তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না।...

"কিন্তু সত্যকে যখন জানি, তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন, তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে, বিস্ময়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

"এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি, তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়; জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না। প্রতি মুহূর্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে, বিকীর্ণ হচ্ছে, ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে, অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

"অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না; তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব, এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

"ভূলোক, ভুবর্লোক,—ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।"[৭]

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করতে করতে মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর স্পর্শ লাভ করি। রবীন্দ্র-কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি। শান্তিনিকেতন ভরে তাঁর অলৌকিক সত্তা বিরাজমান। সেখানে তিনি পথহারাদের পথ দেখাচ্ছেন, অন্ধজনে আলো দিচ্ছেন, মৃতজনে প্রাণ দিচ্ছেন। বরষার বারিধারার ন্যায় তাঁর আশিস্ বর্ষিত হচ্ছে। তিনি নাই—একথা বিশ্বাস হতে চায় না; কখনো যদি অবিশ্বাস আসে—তখনি তাঁর সুমধুর সংগীতে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হয়:

> "কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
> সকল খেলায় করব খেলা এই আমি—"

চোখের আলোয় তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলে কি তিনি নাই?

চোখের দেখাই কি একমাত্র দেখা? যে বায়ু প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করে আমরা জীবনধারণ করছি—সে-বায়ুকে তো চোখে দেখি না? তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি? যে-কাব্যামৃত, যে-সংগীতসুধা প্রতিনিয়ত পান করে, মানব আমরা আমাদের মানবজীবন ধারণ করছি, সেই অমৃতের অধিকারী, অমৃতপরিবেশনকারীর মৃত্যু হয়েছে—একথা কেমন করে বিশ্বাস করি?

এই তো তাঁর অপূর্ব গায়ত্রী-ভাষ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে

---

৭ 'সত্যকে দেখা'—শান্তি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১-৭৩

আমরা ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সূর্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রখচিত বিশ্বজগতে বিচরণ করলাম—যেখানে বাতাস মধু বহন করে, আকাশ মধু বর্ষণ করে, স্রোতস্বিনীগণ মধু ক্ষরণ করে, যেখানে রাত্রি মধুময়, দিবস মধুময়, ওষধি মধুময়, বনস্পতি মধুময়।

চক্ষে কি অমৃতাঞ্জন তিনি পরিয়ে দিলেন জানি না, তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে পারলাম :

> "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময়, পৃথিবীর ধূলি—
> অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।...
> সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
> এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।"

"মধুময় পৃথিবীর ধূলি"—আরোগ্য।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
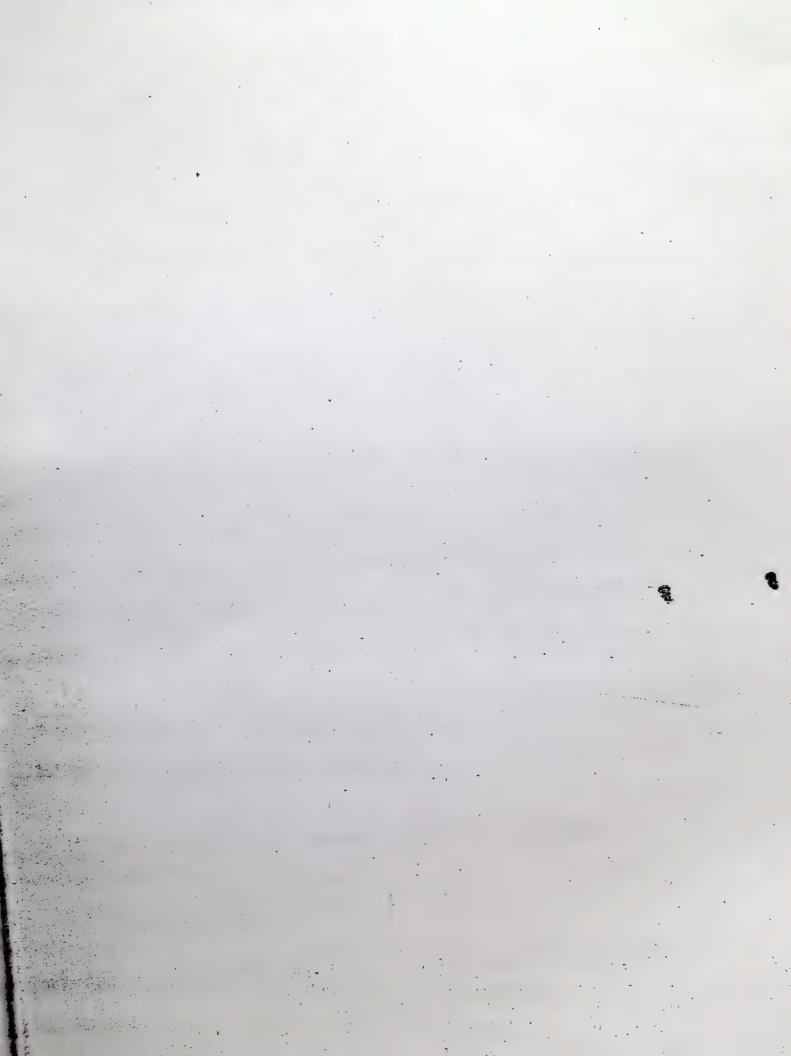
বি শ্ব ভা র তী

বিশ্বের নীড় ● রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী ● বিধুশেখর ও বিশ্বভারতী
রামানন্দ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী ● মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন ● ভারতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম ● চণ্ডালিকা প্রকৃতি ও শ্রমণ আনন্দ

বি শ্বে র নী ড়
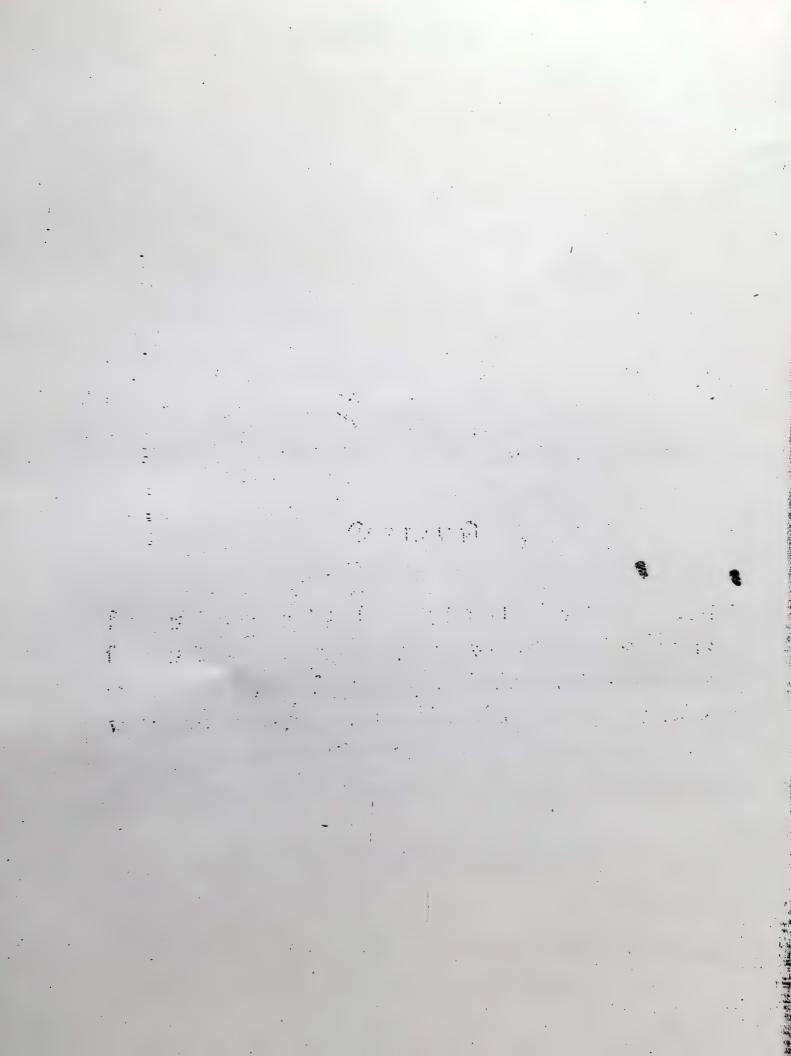
বাইশে শ্রাবণ প্রভাতে উত্তরায়ণে, রবীন্দ্রভবনের উদ্যানে কয়েকটি শিশুর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম। দেশী, বিদেশী, নানাজাতীয় পুষ্পে উদ্যানটি অতি মনোহররূপ ধারণ করেছে। উদ্যানের কৃত্রিম হ্রদে পদ্ম ফুটেছে। রূপে, গন্ধে, উন্মত্ত মধুকরবৃন্দের ন্যায় শিশুগণ উদ্যানের দিকে দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমিও আত্মবিস্মৃত হয়ে শিশুর ন্যায় আচরণ করছি।

কত বিচিত্র রূপ! কত বিচিত্র গন্ধ! কত বিচিত্র আকৃতিই না এই পুষ্পরাজির! শিশুদের প্রশ্ন করলাম, "কোন ফুল সবচেয়ে ভাল বল দেখি?"

কেউ বলল, 'গোলাপ।' কেউ বলল, 'পদ্ম।' কেউ বলল, 'রজনীগন্ধা।' নিজেদের মধ্যে তারা তর্ক জুড়ে দিল।

তাদের নিবৃত্ত করে বললাম, "আচ্ছা। ধর, যদি বাগানে কেবল গোলাপই রাখা যায়, বা পদ্মই থাকে, অথবা কেবল রজনীগন্ধা ফোটে তো কেমন হয়?"

সকলেরই দেখলাম তাতে প্রবল আপত্তি। "না, না। সব ফুলই থাকবে। তা না হলে মোটেই ভালো লাগবে না।"

কেউ বা মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, সব রঙের, সব বর্ণের, সব ফুল থাকবে।"

অন্য এক জন যোগ দিল, "কাঠটগরও থাকবে।"

হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যেন গুরুদেবের কথা শুনলাম,

শিশুর কণ্ঠে যেন বিশ্বভারতীর স্রষ্টার কণ্ঠ ধ্বনিত হলো। "বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মালিকার ন্যায়, বিবিধ দেশবাসী জনগণ, তাঁদের নিজ নিজ সংস্কৃতির অর্ঘ্য নিয়ে, বিশ্বভারতীর উপাসনা করবে।"

বিচিত্র কুসুম-গ্রথিত-মালিকায় যেমন সমস্ত কুসুম স্থান পায়, তেমনই বিশ্বভারতীতে সর্ব জাতির, সর্ব ধর্মের, বিচিত্র প্রকৃতির সমস্ত মানব তার নিজ সম্পদসহ স্থান লাভ করবে। কেবলমাত্র কোনরূপে একটু স্থান লাভ করবে তা নয়, একটি প্রীতির সম্নিগ্ধ পরিবারে, একটি সুখশান্তিময় নীড় একত্রে, পরমানন্দে বাস করবে।

রবীন্দ্রনাথের সে আশা কি সফল হয় নাই ?

হয়েছে। ভারতের সকল প্রদেশের, বিবিধ দ্বীপপুঞ্জের, এশিয়ার, ইউরোপের, আফ্রিকার, আমেরিকার, বিশ্বের সকল জাতির, সকল ধর্মের নরনারী এখানে এসেছেন। এক পরিবারের লোকের মতোই তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে কেবলমাত্র উপরে উপরে দেখে, যাঁরা আমার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না, তাঁদের আমি বলি, "উপরের দিক থেকে দৃষ্টি নামান। নীচের দিকে দেখুন। বিদ্যার্থীদের দিকে দৃষ্টি দিন। দেখুন, তাঁরা দেশ, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সর্বপ্রকারের ব্যবধান ভুলে গিয়েছেন। সহজ, সরলভাবে ভ্রাতা যেমন ভ্রাতার সঙ্গে, ভগিনী যেমন ভগিনীর সঙ্গে, স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তেমনই প্রীতিবদ্ধ হয়ে, তাঁহারা এক স্নেহের স্বর্গ রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের এই তপোবনে, এই শান্তিনিকেতনে।"

দেশ বিভাগের পরে, যখন পাঞ্জাবে, পঞ্চনদীর তীরে, "মরণ আলিঙ্গনে, কণ্ঠ পাকড়ি, ধরিল আঁকড়ি দুই জনা দুই জনে"—ভ্রাতৃ-হত্যার সেই তাণ্ডবলীলার দিনে নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, শান্তিনিকেতনে—লোকালয় হতে দূরে, নির্জনে, খোয়াইয়ের বক্ষে, একটি তরুণ শিখ এবং একটি সমবয়স্ক মুসলমান ছাত্র, পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে ভ্রমণ করছে।

মহাযুদ্ধের অবসানে, বিশ্বভারতীর চীনভবনে, একই অট্টালিকার দুই প্রকোষ্ঠে, চীন ও জাপানবাসী সুধীবৃন্দ সাধনার আসন গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী ও খ্রীস্টান, রাশিয়া ও আমেরিকাবাসী একত্রে, শান্তিনিকেতনে, শান্তিতে বাস করেছেন।

"যেথায় বিধু-রবি ত্যাজিয়া দ্বন্দ্ব[1]
জাগি থাকি, জাগান লোক—"

স্বপাকভোজী ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য বিধুশেখর, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে, এক প্রাণে, বিশ্বভারতীর গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।

ইসলামধর্মাবলম্বী জিয়াউদ্দিন, সৈয়দ মুজতবা। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ব্রহ্মবান্ধব, ইংরেজ এন্‌ড্রুজ, পিয়ারসন, এলমহার্স্ট, এই আশ্রম, এই বিশ্বভারতীকে প্রাণের অধিক ভালোবেসেছেন।

কেবলমাত্র সর্বধর্মাবলম্বীই নয়, সর্বধর্মবহির্ভূত নাস্তিকও একে ভালোবেসেছেন এবং এখানে এক পরিবারে বাস করেছেন। এখানে মন্দির এবং মন্দিরের পাশেই নাস্তিক রয়েছেন।

এই হলো বিশ্বভারতী। বিশ্ব যেখানে একটি নীড়ে আশ্রয় নিয়েছে। বিবিধদেশ-গ্রথিত বিচিত্র বিদ্যাকুসুমমালিকারাজির দ্বারা, এর উপাসনা করতে হবে।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সমস্ত উপাসকের জন্য, এখানের আকাশে, বাতাসে, রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে।

এর বৃদ্ধি হউক। এর সমৃদ্ধি হউক।[2]

প্রবাসী,
আশ্বিন, ১৩৬৬

---

১ পাঠান্তর "যেথায় বিধু-রবি না জানি অন্ত"

২ বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প বচন :—অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম।...সেয়মুপাসনীয়া নো বিশ্বভারতী বিবিধদেশগ্রথিতাভির্বিচিত্র-বিদ্যাকুসুমমালিকাভিরিতি হি প্রাচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চেতি সর্বেপ্যুপাসকাঃ ॥ * * তদিদমৃধ্যতাম্। তদিদং সমৃধ্যতাম্ ॥

সুন্দর অনুপম এই বিশ্ব। এর প্রকৃতি সুন্দর, প্রাণীরা সুন্দর, মানুষ সুন্দর। এর এই সৌন্দর্য শিশুগণ প্রত্যক্ষ করে। ক্ষুদ্র এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন তার দৃষ্টি যেন একনিশ্বাসে জগতের এই সৌন্দর্যসুধা পান করছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর এই দৃষ্টি সঙ্কুচিত হতে থাকে। চল্লিশে এসে আমাদের চালশে ধরে। অনেকের তার অনেক পূর্বেই ধরে। আমাদের অধিকাংশেরই চালশে ধরেছে। আমাদের এত কাছের এই বিচিত্র সৌন্দর্যলীলা আমরা দেখতে পাই না। প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অতিসন্নিকটে যে মাধুর্যের হোরিখেলা চলেছে তা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর দৃষ্টি' শেষ দিন পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে-দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হয়েছিল। এমন দৃষ্টি নিয়ে কয়জন এ জগৎকে দেখেছে ?

এই চিরনূতন পৃথিবীকে তিনি আমরণ চিরনূতন দেখেছেন। এই নিত্যনবীনা, স্থিরযৌবনা, লীলাচঞ্চলা সৃষ্টি তাঁর প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ জাগিয়েছে। বিশ্বের আনন্দরূপ তিনি নিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি,—'জরাহীন, মৃত্যুহীন, আনন্দরূপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাচ্ছে।' কবে, কত লক্ষ বছর পূর্বে এই সৃষ্টির প্রথম বিকাশ—কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোথাও কোনোখানে বিন্দুমাত্র জরা স্পর্শ করেনি। প্রতিদিন নব নব রূপে, নব নব সৌন্দর্যে,

তার আনন্দময় অমৃতময় রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। কে তা দেখছে? কে তার খবর রাখছে? কিন্তু একজন সে-সৌন্দর্য, সে-আনন্দ, সে-অমৃত তাঁর লোচন দিয়ে, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করে গেছেন।

কবে কত হাজার বছর পূর্বে ভারতের কোন্ তপোবনে কোন্ ঋষি এইভাবে তাঁর অপূর্ব দৃষ্টি দিয়ে এই সৃষ্টির আনন্দরূপ দর্শন করেছিলেন যার সাক্ষ্য রয়ে গেছে ঐ অপরূপ বাক্যে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।

তারপর কত পণ্ডিত উপনিষদ্ পড়েছেন, তার ভাষ্য করেছেন, টীকা করেছেন; সেই ভাষ্যে সেই টীকায় তাঁদের বুদ্ধির যাদুখেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু আনন্দরূপ তাঁদের অগোচরে রয়ে গেছে।

হাজার বছর পরে ঐ বাক্য, ঐ মন্ত্র একজনের কাছে সত্য হয়ে উঠল, জীবন্ত হয়ে উঠল। তিনি বিশ্বের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দর্শন করলেন। জীবনের প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, এই অপূর্ব রূপ তার চিত্তকে ভরে দিল।

তাঁর কণ্ঠে অগণিতবার এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এবং আমার তা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিমিরান্ধ আমার কাছে বিশ্বের আনন্দরূপ ধরা দেয় নাই, কিন্তু যখন তিনি ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল আমাকে আনন্দরূপের আভাস দিয়েছে।

তাঁকে দেখেই 'মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি' এই কথাটির অর্থ বুঝেছি। একই মন্ত্র হাজার বার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করছে কয়জন? যিনি প্রত্যক্ষ করছেন তিনিই ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মন্ত্র চিরন্তন, অনাদি—অনন্ত। যুগে যুগে বার বার সেই চিরন্তন মন্ত্র পুরাতন এবং নবীন ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করেছেন—করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি—এযুগে রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে প্রত্যক্ষ

করেছেন। বিশ্বসৃষ্টির এই আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করে অনুভব করে তিনি আর এক আনন্দরূপ সৃষ্টি করেছেন।

পুরাণে আছে, বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন। মহাকবিও এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত কাব্যই এই জগৎ। বিধাতার সৃষ্টির পাশে মানবের এই সৃষ্টি আসন গ্রহণ করে, কিন্তু এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। বিধাতার সৃষ্টির সৌন্দর্যই এই সৃষ্টির জনক।

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ'—মহাকবি বাল্মীকির সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'যতদিন গিরিরাজি বিরাজ করবে, ততদিন তাঁর কাব্য জগতে স্থায়ী হবে'—অর্থাৎ যতদিন বিধাতার সৃষ্টি থাকবে, ততদিন এই মানবের সৃষ্টিও বিরাজ করবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কাব্য সম্বন্ধে—এই বাক্য পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কবিমাত্রই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন—কিন্তু আংশিকভাবে। শস্যশ্যামলা ধরণী, পুষ্পবিকশিত কুঞ্জ, জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনী, প্রকৃতির মনোহারিণী রূপ কবিদের প্রাণে আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র রূপ, করাল রূপ কয়জনকে সত্যিকারের আনন্দ দেয়?

তরুবিরল পুরাতন শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রুদ্ররূপ, মধ্যাহ্নে, প্রসারিত নয়নে ধ্যানস্থ প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ যেন পঞ্চতপা ঋষির প্রচণ্ড তপস্যা।

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার'—ইন্দ্রিয়ের দ্বার পূর্ণভাবে মুক্ত রেখে, তিনি বিশ্বের সমস্ত স্বাদ, গন্ধ, ঘ্রাণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর যোগাসন অপূর্ব।

শেষ বয়সে যখন তাঁর চক্ষের দৃষ্টি স্বভাবতই ম্লান হয়ে আসছিল, সেই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে আমার এক শিশু-কন্যাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি শিশুটিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—"বাঃ! বাঃ! আবার কাজল পরা হয়েছে।"

আমি বললাম—"আপনি যে দুঃখ করেন, আপনার চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে তা তো ঠিক নয়। এই সন্ধ্যায় ওর চোখের কাজল তো দেখতে পেলেন।"

তিনি তখন পরিহাসের সঙ্গে বললেন—"আমি বলি, হায় প্রকৃতি! তোকে এমনভাবে দেখবে কে? যে দেখছে তারই চোখ তুই নিয়ে নিচ্চিস!"

মহাপুরুষের পরিহাসবিজড়িত বাক্যও সত্য। কিন্তু প্রকৃতি অকৃতজ্ঞ নয়, শেষদিন পর্যন্ত কবির দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টির আনন্দরূপ তিনি দেখে গেছেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁর কাছে মধুময় ছিল। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি বলে গেলেন:

"...মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—আরোগ্য।

কবি যেমন তাঁর কাব্যের মধ্যে অমর হয়ে থাকেন, কর্মীও তেমনই তাঁর কর্মের মধ্যে অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু একাধারে কবি ও কর্মীর দেখা পাওয়া দুর্লভ—অতি দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কবি ও কর্মীকে দেখেছি। অথবা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এক কবি-কর্মীকে দেখেছি। তিনি স্বভাবতঃ কবি। তাই তাঁর কর্মও কাব্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীকে আমরা বলতে পারি তাঁর এক কাব্য। তাঁর বিশ্বভারতীও তাঁর অন্যকাব্যের ন্যায় অমর হয়ে থাকবে।

পরমদরদী এক হৃদয় নিয়ে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের জীবনে যে-দুঃখ তিনি পেয়েছেন, সেই দুঃখ যাতে অন্য কেউ না পায়, তার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করতেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও আমাদের

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি শুষ্ক, নীরস এবং বিভীষিকাপূর্ণ ছিল। শিক্ষার নামে শিশুদের উপর যে-অত্যাচার হতো তা ভয়ঙ্কর—এমনকি বীভৎস ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার কিছু আস্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা গ্রাম্য বালকেরা তার যে-আস্বাদ পেয়েছি তার তুলনায় তা কিছু নয়। আমার জীবনের একটি বছর এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কেটেছে, সে দিনগুলি এক বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় এখনও আতঙ্ক জাগায়।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের জন্য শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারতে তপোবনে, গুরুগৃহে, বালকবালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হতো। গুরুদের পুত্রকন্যাদের ন্যায় বিদ্যার্থীরা এক পরিবারে পরম স্নেহে পালিত হতো। প্রকৃতির মনোরম পরিবেষ্টনীতে, গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহময় পরিচর্যায়, আশ্রমের তরুশিশুর ন্যায় সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করত শিশুবিদ্যার্থিগণ। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি এই তপোবনের অনুপ্রেরণায়, শান্তিনিকেতনে এক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সে-যুগের প্রাথমিক শিক্ষকগণের দৃষ্টিতে শিশুশিক্ষার নামে কবি শিশুদের এক 'খেলাঘর' নির্মাণ করলেন।

এইরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সে-যুগে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ই দুর্লভ ছিল। তদুপরি রবীন্দ্রনাথের অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদ্যালয় গঠনে মস্ত বাধারূপে উপস্থিত হলো। রবীন্দ্রনাথের মন কোনো বাধাতেই অবসন্ন হলো না। ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পুষ্টিলাভ করল। সেখানের 'তরুমূলের মেলায় খোলা মাঠের খেলায়, নীলগগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলায়' শিশুগুলি পরমানন্দে মানুষ হতে লাগল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি—এই তিনটি ভাষা তিনি নিজে তাদের পড়াতে লাগলেন। সকাল সাতটা হতে দশটা সাড়ে-দশটা তিনি তাদের ক্লাশ নেন, দুপুরে পাঠ তৈরি করেন। সন্ধ্যায় তাঁদের নিয়ে বেড়াতে যান, সন্ধ্যার পর তাদের অভিনয় শিক্ষা

দেন। শোবার সময় তাদের ঘরে ঘরে গল্প বলেন। বর্ষার বারিধারার মধ্যে তাদের নিয়ে খোয়াই-এ খোয়াই-এ ঘুরে বেড়ান। জ্যোৎস্নারাতে তাদের সঙ্গে পারুলবনে সঙ্গীতের মহোৎসব লাগান।

বছরের পর বছর এইভাবে তাঁর সময় কেটেছে। ১৯১৭ সালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি. তখনও আমি তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা এইরূপই দেখেছি। তার পরও কয়েক বছর এইভাবে চলে।

তিনি এইভাবে তাঁর মূল্যবান সময় একটি অখ্যাত বিদ্যালয়ের কয়েকটি শিশুর জন্যে 'নষ্ট' করেছেন ভেবে অনেকে মন্তব্য করেন :

"এই সময়ে তিনি আরো কত অপূর্ব সৃষ্টিই না করতে পারতেন! তোমরা ছাত্রেরা যে, সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছে!"

আপাতদৃষ্টিতে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন হিসাব রবীন্দ্রনাথ কখনও করেননি। বস্তুতঃ বেহিসেবী মন নিয়েই তিনি জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া ঐশ্বর্যের যাঁর অন্ত নাই, তিনি হিসেব করবেন কোন্ দুঃখে? বিধাতার বিশ্বসৃষ্টিতে কত কোটি কোটি কুসুম ঝরে পড়ছে, কত লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ভেঙে পড়ছে, কত হাজার হাজার মানুষ অন্তর্ধান করছে—বিধাতা তার হিসেব করেন কি?

কোটি কুসুম ঝরে পড়ছে, শতকোটি কুসুম বিকশিত হচ্ছে, শত তরঙ্গ মিলিয়ে যাচ্ছে, সহস্র তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথেরও ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। তাই অজস্র ছড়িয়ে ফেলিয়েও তিনি অজস্র দান করে গেছেন। তা ছাড়া কবির সময় নষ্ট হয়েছে কি? তাঁর অপূর্ব 'শিশুকাব্যে'র সৃষ্টিতে, শিশুদের জন্য এই বেহিসেবি সময় ব্যয় কাজে লাগেনি কি? কেউ কেউ তো এমনও মন্তব্য করতে পারেন, এই ভাবে শিশুদের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই তাঁর অনুপম শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তা ছাড়া এত সময় শিশুদের পরিচর্যায় দান করলেও, তাঁর কাব্য-সৃষ্টির সময়ের অভাব হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন, জিতনিদ্র পুরুষ। রাত্রি এগারোটার পূর্বে তিনি নিদ্রা যেতেন না। অথচ তিনটার পরই

তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না।

তাঁর বৃদ্ধবয়সে, মৃত্যুর দু-তিন বছর পূর্বে আমার একবার কৌতূহল হলো—দুপুর বারটা থেকে চারটা পর্যন্ত তিনি কী করেন দেখতে হবে। অর্থাৎ তিনি কোনো সময় নিদ্রা যান কিনা তাই দেখব।

বারটা—একটা—দুটো—তিনটে—চারটে, বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছি, কিন্তু যখনই গেছি, দেখেছি—তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ছেন।

পূর্বেই বলেছি—বিশ্বভারতী তাঁর এক কাব্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই পূর্ণ পরিণতি বিশ্বভারতীতে। মানুষের মন যেমন ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে, রবীন্দ্র-সৃষ্টিও সেইরূপ ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেছে। তপোবন বিকশিত হয়েছে—বিশ্বভারতীতে!

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোভিজায়তে।"

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন। "এ জীবনে যে-যোগী সিদ্ধিলাভের পূর্বেই পথভ্রষ্ট হলেন—তিনি কি বিনষ্ট হবেন?"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"না। কল্যাণকারীর বিনাশ নাই। তাঁর এ জীবনের অর্জিত শক্তি—পরজীবনে বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। জন্মান্তরে সেই যোগী ঐশ্বর্যসম্পন্ন পবিত্র গৃহে জন্ম নেবেন।"

এমনই এক যোগভ্রষ্ট সাধক পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে ঐশ্বর্যসম্পন্ন পূতচরিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যে-গৃহে নিত্য উপনিষদ পাঠ হয়, ব্রহ্ম-সাধনার বিষয় নিয়ত আলোচিত হয় সেই গৃহের তপোবনসদৃশ আবেষ্টনীতে তাঁর আবির্ভাব হলো।

উপনিষদের রচয়িতাগণ যেমন ঋষি ছিলেন, তেমনি কবি ছিলেন। বেদান্ত যেমন চরম জ্ঞান, তেমনই পরম কাব্য। প্রাচীনযুগের সেই ঋষিকবিদের কাব্য এ যুগের এই মহাকবির চিত্ত আকর্ষণ করল। তাঁর কাব্যে কাব্যে উপনিষদের প্রভাব ছাপ রেখে গেছে।

বেদে, উপনিষদে তিনি পাঠ করলেন—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্' —'যে সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব নীড় বেঁধেছে'—কবির কল্পনা এই

বেদবাক্যকে নতুন রূপ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। 'সমস্ত বিশ্ব যেখানে নীড় বেঁধেছে'—এই পৃথিবীতে এমন এক স্বর্গ কি রচনা করা যায় না ?

কবির কর্মীপ্রকৃতি এই বাণীকে রূপদান করল—বিশ্বভারতীতে। যেদিন তিনি এই আদর্শের কথা ব্যক্ত করে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সাদর আহ্বান জানালেন, সেদিন দেশে-বিদেশে তাঁর বিশ্বপ্রেমিক সমধর্মীরা সাড়া দিলেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বেদান্তবিশারদ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরমাগ্রহে বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশ হতে সুধিবৃন্দের সমাগম হলো। দশ বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পরিপূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করল। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বিশ্বভারতীতে একটি পরিবার গঠন করল; যে-পরিবারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পরমপ্রীতি। এ-যুগে পৃথিবীতে এ-এক অপূর্ব কীর্তি।

মতবিরোধের জন্য যেখানে রক্তারক্তি, খুনোখুনি, ধর্ম-বিরোধের জন্য যেখানে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যার তাণ্ডবলীলা, সেই পৃথিবীতে সর্বমতের সর্বধর্মের লোক নির্বিরোধে, সুখে-শান্তিতে একস্থানে বাস করছে, একি এক অসাধ্যসাধন নয়? তাই বলি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ন্যায় তাঁর বিশ্বভারতীও অমর হয়ে থাকবে।

সম্রাট বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজসভার জন্য নবরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। তার দু'একটি ব্যতীত কারোরই আলোক ভারতের সীমা অতিক্রম করেনি। তার কারণ, রত্নের সংগ্রাহক ছিলেন সম্রাট। কালিদাসের উপর রত্নসংগ্রহের ভার পড়লে অন্য রূপ হতো।

এ যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রত্নসংগ্রাহক। তাই তাঁর সংগৃহীত রত্নগুলি ছিল উজ্জ্বলতর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, এণ্ডরুজ, পিয়ারসন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, এলমহার্স্ট, হরিচরণের মতো রত্ন পৃথিবীর যে-কোনো দেশে, যে-কোনো যুগে দুর্লভ। পৃথিবীর সাত-

সমুদ্রের বিবিধ রত্ন নিয়ে একটি রত্নাবলী গ্রথিত হয়েছিল—যার মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই রত্নাবলী দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর কণ্ঠাভরণ-রূপে শোভাবর্ধন করেছে।

সুদূর অতীত আমাদের চক্ষে কল্পনায় রঙীন হয়ে দেখা দেয়। ভাবুকের দৃষ্টিতে অনেক লঘু বস্তুও গুরু এবং গুরু বস্তু গুরুতররূপে প্রতিভাত হয়। এদিকে বর্তমানের গুরু বস্তুরও আমাদের কাছে গুরুত্ব থাকে না।

বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আজ ভারতবাসীর নিকট অনুভূত হয় না। ভারতে রাজনীতিবিদ্ আছেন, রাষ্ট্রচালক আছেন, সমাজসেবী আছেন, ধার্মিক আছেন, ধর্মগুরু আছেন, শিক্ষাবিদ্ আছেন, সাহিত্যিক আছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী নাই।

উৎপৎস্যতে মম কোপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

আজ ভারতে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী কেউ নাই। কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবীতে কোনো না কোনো সময়ে তাঁর সমধর্মী কেউ না কেউ জন্মগ্রহণ করবেন। যিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করে প্রাণপণে এর অর্ধ-সমাপ্ত ব্রত পূর্ণ করবেন।

তখন যদি বাঙলাদেশের শান্তিনিকেতনে এই বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব নাও থাকে, পৃথিবীর যে-কোনো স্থানেও যদি অনুরূপ বিশ্বভারতী গড়ে উঠে পূর্ণতা লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে।

নালন্দা, বিক্রমশিলার আজ অস্তিত্ব নাই। তাদের ধ্বংসাবশিষ্ট কঙ্কাল আজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারাই আজ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। যুগে যুগে, কালে কালে, এইরূপই ঘটে থাকে।

—প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৬৬

বিধুশেখর ও বিশ্বভারতী

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে আষাঢ় মাসের এক বর্ষণক্লান্ত রাত্রিতে, আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করি। গভীর রাত্রে যে-গৃহে প্রথম আশ্রয় পাই—তা বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়ের গৃহ। সম্পূর্ণ অপরিচিত আশ্রমবাসিগণের মধ্যে যাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তিনি শাস্ত্রী-মহাশয়। কিশোর বালক তখন কল্পনাও করতে পারেনি—সেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে তার জীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়বে। সেই দিন হতে দীর্ঘকাল তাঁর গৃহে বাস করি। তাঁর শয়নগৃহে, তাঁরই শয্যার পাশাপাশি শয্যায় রাত্রিযাপন করি।

অতঃপর ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিই। কিন্তু তখনও প্রতিদিন বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। বহুবার তাঁর গৃহে গেছি। রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে ছিল না কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়—পরমাত্মীয়। আমার পূজ্যপাদ মাতুল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। শান্তিনিকেতনে এসে অবধি তাঁরা দুজনে একত্রে, এক গৃহে বাস করতেন। একই কুটীরে সান্ধ্যাহ্নিক করতেন এবং একই পাকশালায় স্বহস্তে রন্ধন করে পাশাপাশি বসে আহার করতেন। তিনি আমার অভিভাবক মাতুল মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সেই সূত্রেই প্রথম আলাপ।

শাস্ত্রীমহাশয় এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট আমি প্রথম সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করি। আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন,

দীনবন্ধু অ্যাণ্ডরুজ এইসব বিখ্যাত বিদ্বানগণ শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। অন্যের কথা কি, স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শিশুদের ক্লাশ নিতেন—ইংরেজি সংস্কৃত, বাংলা। ইংরেজির ক্লাশই তিনি বেশি নিতেন। ব্যাকরণ না পড়িয়ে ইংরেজি শেখানো যায় কি না—তখন তাই তিনি পরীক্ষা করছেন। আমরা বালক বালিকারা তাঁর সেই সরস শিক্ষাধারার রস গ্রহণ করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি কাশীর পণ্ডিত, সংস্কৃত তাঁর মাতৃভাষার ন্যায়। বেদবেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য সমস্তই অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তখনও বৌদ্ধশাস্ত্র পড়েননি।

বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শান্তিনিকেতনে এসে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে তিনি 'বুদ্ধচরিত' পড়াতে লাগলেন। তাঁদেরই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি পালিভাষা শিখলেন। নিজে পড়েন এবং ছাত্রদের পড়ান। এইভাবে পড়তে পড়তে ও পড়াতে পড়াতে তাঁর 'পালি প্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হলো। ভাষা শিক্ষার এই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তাঁর পরবর্তী জীবনেও অনুসৃত হয়েছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অসীম জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা গুরুদেবকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর জন্য তিনি নানা ভাষার নতুন নতুন গ্রন্থ ক্রয় করতে লাগলেন। তখন শান্তিনিকেতনের অত্যন্ত দারিদ্র্য—সুতরাং এ বড় সহজ ছিল না। কিন্তু 'ঋণং কৃত্বা অমৃতং পিবেৎ' এই নব্য চার্বাক নীতি অনুসরণ করে, রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানামৃত পান এবং বিতরণের জন্য ঋণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এইভাবে ভবিষ্যৎ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় গড়ে উঠতে লাগল।

১৯১৯-২১ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভ হলো। শাস্ত্রীমহাশয় এইবার তাঁর সাধনার পীঠস্থানটি পেয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা বিশ্বভারতীর পরিপালনের ভার পড়ল তাঁরই উপর। পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে না হতেই মধুকরগণ উপস্থিত হয়। বিশ্বভারতীর বিকাশ হতে না হতেই, পৃথিবীর নানা স্থান হতে সুধীবৃন্দের সমাগম হতে

লাগল। ফ্রান্স থেকে এলেন সিলভ্যাঁ লেভি, বেনোয়া (Professor Dr. Sylvain Le'vi, F. Benoit), অস্ট্রিয়া (বৃহত্তর) জার্মানী থেকে উইন্‌টারনিট্‌জ (Dr. M. Winternitz), ইতালী থেকে ফরমিকি, তুচ্চি, (Dr. C. Formichi, Dr. G. Tucci), নরওয়ে থেকে স্টেন কনো (Dr. Sten Konow,) চেকোশ্লোভাকিয়া হতে লেসনি (Dr. V. S Lesny, অস্ট্রিয়া থেকে ক্র্যামরিশ (Stella Kramrisch), হল্যাণ্ড থেকে বাকে (A. A. Bake), আমেরিকা থেকে প্র্যাট (Dr. J. B. Pratt) রাশিয়া থেকে বোগদানভ (Dr Bogdanov), গ্রেটব্রিটেন থেকে কলিনস্‌ (Dr. M. Collins), জেমস্‌ কজিন্‌স্‌ (Dr. James Cousins), হাঙ্গারী থেকে গেরমান্থস (Dr. J. Germanus), চীন থেকে লিন ও-চিয়াঙ (Dr. Lin Wo-Chiang), তান য়ুন-শান (Prof. Tan Yun Shan), পারস্য থেকে দায়ুদ (Pouri Daud), তিব্বত থেকে সো নম্‌ নগ ডুব্‌ এবং সিংহল থেকে এলেন রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির। অধ্যাপকের ন্যায় পৃথিবীর নানাস্থান হতে বিদ্যার্থীরও সমাগম হলো।

সুদূর নরওয়ে হতে একজন ষোল বছরের তরুণ ছাত্র এল। ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে একই ছাত্রাবাসে সেই তরুণ ছাত্রটি স্বেচ্ছায় তাঁর স্থান নিল। ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে সে তার ছাত্রজীবন যাপন করতে লাগল। সে কালে সে বড় সহজ ছিল না।

বিশ্ববিখ্যাত সুধীবৃন্দের অনেকেই ছিলেন অতিথি অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর)। তাঁদের কেউ বা এক বছর কেউ বা দু-বছর থেকে গেলেন। কেউ বা একাধিকবার যাতায়াত করলেন।

ভারতীয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহু-বিখ্যাত অধ্যাপক সাময়িকভাবে বিশ্বভারতীতে এসে ভাষণদান বা অধ্যাপনা করে যেতেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়, আই. জে. এস. তারপুরওয়ালা, সরোজকুমার দাস, কালিদাস নাগ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেবেন্দ্রমোহন বোস, শিশিরকুমার মৈত্র, ফণিভূষণ অধিকারী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীবৃন্দ এইভাবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় বিশ্বভারতীর প্রারম্ভ হতে—দীর্ঘকাল কর্মসচিবের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে বিশ্বভারতীর পরিচর্যা করতেন। শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বিদেশীর মধ্যে স্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন পিয়ার্সন, এণ্ডরুজ, কলিনস্ বোগ্‌দানভ, বেনোয়া, গেরমানুস, ক্র্যামিশ, মহাস্থবির, তান-য়ুন-শান। তুচ্চিও স্থায়ী অধ্যাপকরূপে শান্তিকেতনে এসেছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তর হওয়ায়, মুসোলিনীর আদেশে তাঁকে শান্তিনিকেতন হতে বিদায় নিতে হয়।

ঐসব অতিথি-অধ্যাপক এবং স্থায়ী অধ্যাপকগণের মধ্যমণি ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়। এঁদের নিয়ে তিনি এক আদর্শ পরিবার গঠন করেছিলেন যে-পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে-পরিবারের সকলের সঙ্গে সকলের প্রাণের যোগ। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (বিশ্ব যেখানে একটি নীড় গড়েছে) সার্থক হয়েছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল বিশ্বভারতীতে। শীলভদ্র ও দীপঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রীরূপে। যেমন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, তেমনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে, তেমনি প্রাচীন পারসিক শাস্ত্র আবেস্তাতে তাঁর গভীর জ্ঞান। যেমন ভাবে তিনি পালি শিক্ষা করেছিলেন, তেমনি ভাবেই তিনি আবেস্তার ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। পালিরই ন্যায় নিজে শিক্ষা করেই অন্যকে শিক্ষা দিতেন। তিব্বতী ভাষাতে তাঁর

'হাতে খড়ি' হয় অধ্যাপক লেভীর কাছে। তারপর নিজের চেষ্টায় সে ভাষা অধিকার করে, বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতে থাকেন।

সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত, প্রাচীন পারসিক (Zent), বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, উর্দু, ফার্সী, আরবী, চীনে, জাপানী, তিব্বতী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, রাশিয়ান, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি নানা ভাষার শিক্ষা চলেছে বিশ্বভারতীতে। উদ্দেশ্য ভাষার সাহায্যে গবেষণা। বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গবেষণায় দীক্ষা দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী, ছাত্রদের সেই গবেষণা-পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। নানা পুঁথিপত্র হতে কেমন করে গ্রন্থ সম্পাদন করতে হয় সে-শিক্ষাও হাতে কলমে দিয়ে গেছেন উইন্‌টারনিট্‌জ।[১]

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডক্টর কলিনস্, শাস্ত্রীমহাশয়ের পরম প্রিয়পাত্র। কেননা, ভাষাতত্ত্বেই শাস্ত্রীমহাশয়ের সর্বাধিক প্রীতি। আত্মভোলা বোগ্‌দানভ্‌ ইওরোপের প্রায় সব ভাষাই জানেন। দিবা-রাত্রির মধ্যে মাত্র দু-চার ঘণ্টা তাঁর নিদ্রা। সেই জিতনিদ্র পুরুষ দিবারাত্র অধ্যয়নরত। বিদ্যার্থীদের জ্ঞানপিপাসা তাঁর কাছে গেলে পরিতৃপ্ত হয়। বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের মালিকার দ্বারা বিশ্বভারতীর উপাসনা চলছে সেই উপাসনায় পৌরোহিত্য করছেন বিধুশেখর শাস্ত্রী-মহাশয়। বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণের তিনি একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট তাঁরা বিদ্যার্থীর ন্যায়, বিনীতভাবে উপস্থিত হন শ্রদ্ধাভরে তাঁর নির্দেশ শোনেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তা পালন করেন।

---

১ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের পুঁথির উপর ভিত্তি করে পুনার ভাণ্ডারকর গবেষণা মন্দির হতে যে মহাভারত সম্পাদন করা হয়, তার আদি-পর্বের কিছু অংশ স্বয়ং উইন্‌টারনিট্‌জ অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী ও বিদ্যার্থীদের সহযোগে সম্পাদন করেছিলেন। ভাণ্ডারকর গবেষণা মন্দিরের এন বি উক্‌দীকর কয়েক মাস বিশ্বভারতীতে ছিলেন। তিনি তখন উইন্‌টারনিট্‌জের সঙ্গে মহাভারত সম্পাদনার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেন।

বিশ্বভারতীতে গুরুদেব, অ্যাণ্ডরুজ, পিয়ার্সন, কলিনস, মরিস্‌ (H. P Morris), স্ট্যানলি জোনস্‌ (Dr. G. S. Jones), গুরুদয়াল মল্লিক, জাহাঙ্গীর ভকিল অধ্যাপনা করেন ইংরেজি। মরিস্‌ ও পল্‌ রিসার্ড্‌ (P. Richard) পড়ান ফরাসী। বেনোয়া পড়ান ফরাসী ও জার্মান্‌। তুচ্চি পড়ান ইতালিয়ান, চীনে, তিব্বতী। বোগদানভ পড়ান পারসীয়ান্‌, ইসলাম ধর্মশাস্ত্র, ইউরোপীয় প্রাচীন ও অন্য নানা ভাষা। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী পড়ান বাংলা, সংস্কৃত, প্রাচীন হিন্দী, ব্রজভাষা প্রভৃতি। গেরমানুস্‌ ও জিয়াউদ্দিন পড়ান উর্দু, ফার্সি, আরবি। নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ বসু পড়ান ইতিহাস। রজনীকান্ত দাস পড়ান রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি। সরোজ দাস ও প্রেমসুন্দর বসু পড়ান পাশ্চাত্য তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র। মহাস্থবির পড়ান বৌদ্ধ ত্রিপিটক, শীতলপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, চম্পৎ রায় জৈন, মুনি জিনবিজয় ও পণ্ডিত সুখলাল পড়ান জৈন শাস্ত্র। কলিনস ও তার-পুরওয়ালা পড়ান আবেস্তা। বিধুশেখর শাস্ত্রী পড়ান বেদ, আবেস্তা, বৌদ্ধ দর্শন, ন্যায়, প্রাকৃত, সংস্কৃত, তিব্বতী, ভাষাতত্ত্ব, প্রভৃতি। সমস্ত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা। গবেষণা না করলে অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থী কেউ বিদ্যাভবনে স্থান পেতেন না। বিশ্বভারতীর অন্য বিভাগে তাঁদের স্থান নিতে হতো। তাঁদের জন্য ছিল পাঠভবন, শিক্ষা-ভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন। কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য এইসব ভবনের ছাত্রগণ সাময়িকভাবে বিদ্যাভবনের সংস্পর্শে আসতেন।

বিদ্বানগণ তাঁদের বিদ্যামন্দিরের চতুর্দিকে অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী করে জ্ঞানের আরাধনা করবেন, চারিপার্শ্বের জগতের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ থাকবে না—একথা কল্পনা করতেও রবীন্দ্রনাথের অন্তর কম্পিত হতো। বিশ্বভারতীর বিদ্যানিকেতনের জ্ঞানের আলোক, যাতে চারপাশের অন্ধকার গ্রামগুলিকে আলোকিত

করতে পারে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা, অজ্ঞান তিমিরান্ধ গ্রামবাসিগণের পথনির্দেশ করতে পারে—তারই জন্য বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছিলেন। গ্রামবাসিগণ জ্ঞানলাভ করে যাতে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকার্জনে সমর্থ হয়, তার জন্য সাধারণ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যার, নানা কারুশিল্পের শিক্ষাদান চলতে লাগল। গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন কালীমোহন ঘোষ এবং গৌরগোপাল ঘোষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দুটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আত্মনিয়োগ করলেন। এই কার্যেই ঐ কর্মী যুগল তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেন। তরুণ ইংরেজ কর্মী এলম্‌হার্স্ট (Leonard K. Elmhirst) ঈশ্বর প্রেরিতের ন্যায় বিশ্বভারতীতে এসে শ্রীনিকেতনের পরিচালনার ভার এবং আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মৃতপ্রায় গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল, নিরাশ জীবনে আশার সঞ্চার হলো। ম্লান মূক মুখে ভাষা ফুটল।

বিশ্বভারতীর সে এক গৌরবের যুগ। বিক্রমাদিত্যের সভায় মাত্র নবরত্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে তার দ্বিগুণাধিক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন কেবলমাত্র ভারতবর্ষ হতেই সংগৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রত্নরাজি জগতের সাত সমুদ্র হতে সঞ্চয়িত হয়েছিল। তাঁদের অনেকেরই আলোক জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব, সতীশচন্দ্র, অ্যাণ্ডরুজ্, পিয়ার্সন, নন্দলাল, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, কলিনস্, বোগদানভ, দিনেন্দ্রনাথ, সুখলালজী মুনিজিনবিজয়, রজনীকান্ত (দাস) হরিচরণ ভীমরাও, এলম্‌হার্স্ট, জগদানন্দ কালীমোহন সন্তোষচন্দ্র প্রবোধচন্দ্র প্রভৃতি রত্নগুলি নিজ নিজ বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল ; যে কেহ এঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন কী অসামান্য প্রতিভা এবং চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এঁরা।

'ওস্তাদের হুকাবরদারও ওস্তাদ হয়' এই প্রবাদ প্রমাণিত হয়েছে আমাদের মতো অতি সাধারণ শিষ্যের জীবনে।

শাস্ত্রীমহাশয় কি কেবল তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের জন্যই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপশিখা ছিল সতত সমুজ্জ্বল। যা অন্যায়, অবিচার মনে করতেন তার বিরুদ্ধে তিনি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ অসির ন্যায় উত্থিত হতেন। বজ্রের ন্যায় কঠোর, অথচ কুসুমের মতো কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। সেই শীর্ণ শুষ্ক দেহ তপস্বীর অন্তরে প্রীতির অন্ত ছিল না। সামান্য ভৃত্যশ্রেণী হতে গুরুদেব পর্যন্ত সকলে সতত তাঁর মধুর হৃদয়ের পরিচয় পেতেন।

পালিত কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে কণ্বমুণির বিচ্ছেদের দৃশ্য কালিদাসের কাব্যে অমর হয়ে আছে।

বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিধুশেখরের বিচ্ছেদের দিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরও স্মৃতিপটে সে দৃশ্য অক্ষয় হয়ে আছে।

—দেশ, (সাহিত্য-সংখ্যা) বৈশাখ, ১৩৬৬

রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। উভয়েই উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ লিখেছিলেনঃ

"আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির আগে আমার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নাই! এখনো মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র সুন্দর রূপ দেখতে পাব, যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো।"

বেশি দিন রবীন্দ্রবিহীন জগতে তাঁকে বাস করতে হয়নি। দু' বছর পরেই ১৯৪৩ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

রামানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কিরূপ ছিল তা এই নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হতে বোঝা যাবেঃ

" 'হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চাশ বছরের 'ভারতী' পঁচিশ বছরের 'প্রবাসী'র সঙ্গে কলহ উপলক্ষ্যে শ্লেষ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সমব্যবসায়ীরা যখন নিজের মর্যাদা ভোলে, তখন এরকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। তাই ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে সম্পাদিকাকে (শ্রীযুক্তা সরলা দেবীচৌধুরানীকে) আড়ালে আমার মন্তব্য জানাব। কিন্তু আমার কথাটা তেমন করে চাপা দিলে আত্মীয়তা করা হবে, কর্তব্য করা হবে না।'

"ভারতীর গৌরবের তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদিকা বলছেনঃ

"'আর একটি রীতিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু কেহই অর্থ-লিপ্সায় ভারতীর সেবা করেন নাই ...ভারতীর সেবা, জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।'

"এর মধ্যে তিনটি কথা বলবার আছে। প্রথম, ভারতীর যতগুলি সম্পাদক আসরে নেমেছেন, লক্ষ্মীর কোনো না কোনো মহল তাঁদের আশ্রয় ছিল। ক্ষুধিত পরিবারকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করে সরস্বতীর নৈবেদ্য তাঁদের রচনা করতে হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে নিস্পৃহতার বড়াই শুনে লোকে যে ভক্তিবিহ্বল হয়ে উঠবে, এমন আশা করা যায় না।

"দ্বিতীয়, তৎসত্ত্বেও ভারতীর উপস্বত্ব থেকে যদি কিঞ্চিৎ আয় করতে পারতেন, তবে তাঁদের কেউ যে লজ্জিত হতেন—একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে।......

"তৃতীয়, কথা হচ্ছে এই, প্রাণ ধারণে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। যাঁরা পৈতৃক বা পরোপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী নন, বাধ্য হয়ে তাঁদের উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মানুষের পাকযন্ত্র আছে বলে যদি সেটা লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে লজ্জা সৃষ্টিকর্তার। এ স্থলে মানুষকে কেবল এই কথাই ভাবতে হবে যে, উপজীবিকা যাতে অপজীবিকা না হয়। জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন বা মানুষের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনের দ্বারা যদি আয়ের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টা কোনো সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়, তা হলেই বলতে পারব কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে বিষয়বুদ্ধিই তাঁর প্রবল।

বার বার দেখেছি প্রবাসী-সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের ক্ষতির কারণই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগেনি, অনেক সময়ে মনে হয়েছে, অক্ষুব্ধ বিচারবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা হচ্ছে না; কিন্তু বরাবর দেখেছি, ঠিক করেই হোক ভুল করেই হোক, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেননি।...

"সব শেষে আমার নিজের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ভারতী-

সম্পাদিকার টিপ্পনীর এক জায়গায় লিখছেন ঃ—'(প্রবাসী-সম্পাদক) বাল্মীকি-প্রতিভার কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।'

"পূর্বেই বলেছি লক্ষ্মী আমার লেখনীর উপর স্বর্ণবৃষ্টি করলে দুঃখিত হব এত বড় উদাসীন কোনো কালেই আমি নই। এই ঔদাসীন্য যদি বা আমার লেশমাত্রও থাকত, স্বয়ং সরস্বতীই আজ তাকে দেশছাড়া করেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁর কবির হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে লক্ষ্মীর দ্বারে অবমানিত করতে ত্রুটি করেননি। অন্য অনেক হতভাগ্য ভিক্ষুর মতো লক্ষ্মীমন্তের মুষ্টি-আঘাত পাইনে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুষ্টি-ভিক্ষাও জোটে না! পাই প্রচুর পরিমাণে হাততালি; কারণ দানের হাতে তেমন তালি বাজে না। যেমন বাজে রিক্ত হাতে। এই ব্যাপারে যে পরিমাণে শরীরটাকে জীর্ণ করে ফেলেছি, তার সিকি পরিমাণেও ঝুলিটাকে পূর্ণ করতে পারিনি। কত শত বুভুক্ষিত দিনে পরিশ্রান্ত চিত্তে মনে মনে মালব্যজীর পুণ্যনাম জপ করেছি। কিন্তু অভাগ্যের অদৃষ্টে সেই নামমন্ত্রগুণও ফলেনি। এমন অবস্থায় ভারতী-সম্পাদিকার সঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদকের প্রভেদ এই যে, পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময় দিয়েছেন, যখন দাবী করলে বিনামূল্যেই পেতেন।

"সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যালয়ের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবী উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

"এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য

দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার। তারপরে এই ইতিহাসের ধারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

"প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ন্যায্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে ; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

"কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি যে কেবল অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম ; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকে সেই পরিমাণে আশ্রয়দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি[১]।"

Hotel Bristol, Wien
২০শে জুলাই, ১৯২৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই পত্রটির কথাই আমার সর্বাগ্রে স্মরণ হয়। পত্রের প্রথম দুই পংক্তি মনে ছিল। কিন্তু পত্রটি

রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মাধুর্য পত্রটির ছত্রে ছত্রে উচ্ছলিত। বিশেষ করে তাই, পত্রটির প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধৃত করলাম।

পত্রটি একটি ইতিহাস। একটি মূল্যবান দলিল। অপূর্ব দলিল। কেননা এমন সুললিল ভাষায়, এমন অপরূপ ভঙ্গিতে কোনো দলিল লেখা হয়নি।

এ কেবল দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর বন্ধুত্বের পরিচয়ই দিচ্ছে না—এ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মজীবনের একটা দুঃখপূর্ণ অধ্যায় সাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত করছে। রবীন্দ্রনাথের তপোবন—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচার্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে তপশ্চর্যা করেছেন—এ তারও পরিচয় দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাঁরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন, তাঁরা জানেন—কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 'সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি' বা 'ধনস্থানে শনি' এরূপ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি।

সে-যুগে নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, শান্তিনিকেতনের মরুপ্রান্তরে, কবি রবীন্দ্রনাথ কী কাজে ব্যাপৃত আছেন—সে কথা বাঙলাদেশের অধিকাংশেরই অজ্ঞাত ছিল। সাধারণের কথা দূরে থাক, দেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিরও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সহায়তা দূরে থাক বহু মহাজনের পদধূলি পর্যন্ত তখন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাগ্যে জোটেনি।

কোথায় প্রকাশিত হয়—তা মনে ছিল না। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে পত্রটি 'সবুজপত্র' হতে উদ্ধার করি।—সবুজপত্র (দশম বর্ষ), আশ্বিন, ১৩৩৩। এ সম্বন্ধে সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (২১ জুলাই, ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য। পত্রটির আরম্ভ এইরূপ: "প্রমথ, বৈশাখের পঞ্চাশ বর্ষীয়সী ভারতী পড়ে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি।—তাই নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যে লেখাটা লিখেছি সবুজপত্রের জন্যে পাঠাচ্ছি।...চিঠিপত্র, ৫, পৃ—২৮৪।

কবি ছিলেন তখন সত্যিই সঙ্গহীন। এমত অবস্থায় রামানন্দের এই বহুমুখী সহায়তা রবীন্দ্রনাথের অতিভারপীড়িত আয়ুকে যথার্থই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। কবি তাঁর কাব্যে বলেছেন :

"যাঁরা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার হৃদয় হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে !" পলাতকা (রচনা ১৩২৪)।[২]

এই যাঁদের কথা কবির কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছে, সেই মনের মানুষ রামানন্দ, এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন, এলম্‌হার্স্ট, ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর, নন্দলাল, জগদানন্দ, হরিচরণ, নেপালচন্দ্র, অজিতকুমার, সতীশচন্দ্র, সন্তোষচন্দ্র, কালীমোহন, গৌরগোপাল প্রভৃতি কেউ রবীন্দ্রনাথের রক্তসম্পর্কগত আত্মীয় ছিলেন না—কিন্তু তাঁরা ছিলেন রক্ত-সম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে বেশি আত্মীয়। তাঁরা তাঁর "জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। দুর্গমপথে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ রামানন্দের জীবনও কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।

রামানন্দ ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষার কুড়ি টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া হতে কলকাতায় যান এবং কলেজে ভর্তি হন। তিনি বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারি বৃত্তি লাভ করে তাঁর বিলেত যাবার কথা—কিন্তু সরকারি চাকরি করবেন না বলে তিনি সেই বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

বি. এ পাশ করে সিটি কলেজের তিনি অধ্যাপক হন এবং ঐ

---

২ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪) দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, ৫, পৃ—৫৪

অধ্যাপনাকালেই এম. এ পাশ করেন।

তারপর ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে, ৩০ বৎসর বয়সে, কায়স্থ-পাঠশালা নামক কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে রামানন্দ সপরিবারে এলাহাবাদ যান। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন।

১৩০৪ সালের পৌষ মাসে (১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর) রামানন্দ-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। এই 'প্রদীপ' এবং 'প্রবাসী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"প্রথম যখন রামানন্দবাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন—তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাঙলা দেশে চলতে পারে—তা বিশ্বাস হয়নি।"

'প্রদীপে' রবীন্দ্রনাথের—'এবার চলিনু তবে সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে', 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি', 'তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে', 'ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে' প্রভৃতি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়।

১৩০৭ সাল পর্যন্ত 'প্রদীপ' চলতে থাকে। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি 'প্রবাসী' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যাতেই কবি তার সঙ্গে যে-যোগ স্থাপন করেন, আমরণ তা রক্ষা করে গেছেন।

১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে 'মডার্ণ রিভিউ' প্রকাশিত হয়। রামানন্দ তখনও এলাহাবাদে। প্রবাসীর সঙ্গে যেমন, মডার্ণ রিভিউ-এর সঙ্গে তেমনি রবীন্দ্রনাথের যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল।

দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্রাদি এবং নাটক ও উপন্যাস প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ-এ প্রকাশিত হতে থাকে। গোরা, জীবনস্মৃতি, মুক্তধারা, অচলায়তন,

যক্ষপুরী বা রক্তকরবী, শেষের কবিতা প্রভৃতি 'প্রবাসী'তে এবং চোখের বালি, চতুরঙ্গ, শারদোৎসব, ঘরে বাইরে, গোরা জীবনস্মৃতি, মুক্তধারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

এলাহাবাদে ১১ বছর চাকরি করার পর, রামানন্দ (১৯০৬এ) চাকরিতে ইস্তফা দেন। জীবনে আর তিনি চাকরি করেননি।

এই প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন:

"রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করেন। ইহাও সত্য যে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাঁহার মতভেদ ঘটিতেছিল। তবুও তখন তিনি পরিবার-ভারগ্রস্ত, আত্মীয় স্বজন-দিগকেও অনেক সাহায্য করিতে হয়, 'প্রবাসী'তে তখনও লাভ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই সব কিছু না ভাবিয়া তাঁহার কর্মে ইস্তফা দিলেন। ইহাতে আর একজন রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণের কথা মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়েরই জন্মভূমি রাঢ় দেশে, কাছাকাছি স্থানে। এই তেজস্বিতার জন্যই তিনি লীগ অফ নেশন্স-এ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াও পাথেয় বাবদ বহু সহস্র টাকা প্রত্যাখান করিলেন। সরল অনাড়ম্বর ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি নিজের এই স্বাধীনতাটুকু বলি দিলেন না। এতগুলি টাকা অস্বীকার করা বড় সহজ কথা নয়।

"নিবেদিতা বলেছিলেন: 'ভারতের অন্তর্গূঢ় ব্যথাকে প্রকাশের ভার যাঁহাকে বিধাতা দেন, তাঁহার কি আর চাকুরী করা চলে? শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও ভুলিলে তাঁহার চলিবে না। তিনি বাঙালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী।' "[৩]

১৯০৮ সালে রামানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ বর্ধিত হতে থাকে। এলাহাবাদে অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দের যোগ কেবল যে চিঠিপত্রাদিতেই

---

৩. ক্ষিতিমোহন সেন: রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাঙলা পৃ—১০-১১

সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ সহজ হওয়ায়—সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল। রামানন্দ শান্তিনিকেতনে এবং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, রামানন্দের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

১৯১১ (১৩১৭) সালে দোলের সময় রামানন্দ, জ্যেষ্ঠকন্যা শান্তার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন করেন। ১৩১৮ সালের ২২শে বৈশাখ, দুই কন্যা শান্তা ও সীতার সহিত তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি আশ্রমের 'শারদোৎসবে' যোগদান করেন।

তখন থেকে প্রতি বৎসরই তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। রামানন্দ তখন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিদ্যালয় বিষয়ক সর্বপ্রকার আলাপ আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে চলতে থাকে। এ বিষয়ে রামানন্দের উপর রবীন্দ্রনাথ কতটা নির্ভর করতেন—তা এই উদ্ধৃত পত্রখানি থেকে জানা যায়।

"বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষ-সভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।... আমি এখানে থাকিতে আপনি কি দুই-একদিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? একবার যদি আসা সম্ভব হয় ত আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।" ২৬শে মাঘ, ১৩১৮ (১৯১২)।[৪]

রামানন্দের সমস্ত পরিবারসহ (স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ) শান্তিনিকেতনে আগমন ১৯১৭ সালের বৈশাখ মাসে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে। এই সময় গ্রীষ্মের ছুটিতেও তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

অতঃপর ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে, শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ি কিনে রামানন্দ সপরিবারে আশ্রম বাস করতে থাকেন। এই সময়

৪ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ. ১৬৪

৬

সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয় ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ সহজ হওয়ায়—সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল। রামানন্দ শান্তিনিকেতনে এবং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, রামানন্দের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

১৯১১ (১৩১৭) সালে দোলের সময় রামানন্দ, জ্যেষ্ঠকন্যা শান্তার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন করেন। ১৩১৮ সালের ২২শে বৈশাখ, দুই কন্যা শান্তা ও সীতার সহিত তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি আশ্রমের 'শারদোৎসবে' যোগদান করেন।

তখন থেকে প্রতি বৎসরই তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। রামানন্দ তখন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিদ্যালয় বিষয়ক সর্বপ্রকার আলাপ আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে চলতে থাকে। এ বিষয়ে রামানন্দের উপর রবীন্দ্রনাথ কতটা নির্ভর করতেন—তা এই উদ্ধৃত পত্রখানি থেকে জানা যায়।

"বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষ-সভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।··· আমি এখানে থাকিতে আপনি কি দুই-একদিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন ? একবার যদি আসা সম্ভব হয় ত আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।" ২৬শে মাঘ, ১৩১৮ (১৯১২)।[৪]

রামানন্দের সমস্ত পরিবারসহ (স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ) শান্তিনিকেতনে আগমন ১৯১৭ সালের বৈশাখ মাসে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে। এই সময় গ্রীষ্মের ছুটিতেও তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

অতঃপর ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে, শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ি কিনে রামানন্দ সপরিবারে আশ্রমবাস করতে থাকেন। এই সময়

৪ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ: ১৬৪

তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র 'মুলু' (মুক্তিদাপ্রসাদ বা প্রসাদ)-কে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্য তার ভালো ছিল না বলেই বিশেষ করে ঐ বাড়িটি কেনা হয়।

এই বাড়ির প্রত্যেক ঘর থেকে 'দেহলী'র উপরতলার কুটীরটি দেখতে পাওয়া যেত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সারাদিনের গতিবিধি রামানন্দ-পরিবারের সতত দৃষ্টিগোচর হতো। বাড়িটির এই বিশেষত্বের কথা, রামানন্দ এবং তাঁর কন্যাগণ উল্লেখ করেছেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলাপ আলোচনা চলত।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন : "পরে যা 'বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ' রূপে প্রকাশিত হয়, এই সময় থেকেই তাঁরা তার পরিকল্পনা করেন। যে-সব ইংরেজি গ্রন্থ সাধারণ পাঠকদের জন্য অনুবাদ করা আবশ্যক— তার একটা তালিকা পর্যন্ত তাঁরা করেছিলেন।

"এইসব আলোচনার মধ্যেই একদিন রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসত্রের' (A Poet's School) পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন।"

এ হলো বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা। এ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা, পশু ও পক্ষী পালনবিদ্যা, বয়নবিদ্যা, কাগজ ও মাদুর তৈরি, মৃৎশিল্প ও বিবিধ কারুশিল্প প্রভৃতি গার্হস্থ্যজীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষাদান।

এইসব বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য স্বভাবত সৃজনোন্মুখ শিশু-মনকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করা। এবং তারই আনন্দে নিমগ্ন রাখা। এই 'শিক্ষাসত্র' প্রথমে শান্তিনিকেতনে খোলা হয়েছিল—এখন এর অবস্থান শ্রীনিকেতনে। গ্রামের ও শ্রীনিকেতনের (এবং শান্তিনিকে-তনেরও কিছু কিছু) ছেলেমেয়ে এখানে অল্পব্যয়ে শিক্ষালাভ করে।

"স্ত্রীশিক্ষা, শিশুশিক্ষা, উপেক্ষিত শিল্পবিদ্যা—যথা সঙ্গীত ও চিত্রকলা, এইরূপ বিচিত্র বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু আলাপ

আলোচনা করতেন।

"তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপর ছিল এই বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত। আমরণ তা বজায় ছিল।

"রামানন্দ বিনা দ্বিধায় তাঁর এক অধিকার বিশ্বভারতীকে দান করেন। এ হলো রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের অধিকার।"[৫]

বিশ্বভারতীর ১৯২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখি 'মুক্তধারা' নাটকের ৩০০০ কপি (অর্থাৎ সমস্তই) রামানন্দ বিশ্বভারতীকে দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু

"মুক্তধারা'র বইগুলি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৭ই মাঘ, ১৩২৯।"[৬]

'মুক্তধারা' ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ মাসেরই 'প্রবাসী'তে নাটকটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদও Modern Review (May 1922)-এ প্রকাশিত হয়।

সেকালে প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার এক একটি পুরা পাতা বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপনের জন্য দান করা হতো।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হতে ১৯১৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দু-বছর রামানন্দ ঐ পূর্বোক্ত (মাটির) বাড়িটিতে বাস করেছিলেন।

বাড়িটি পরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়—এখন তার ভিতের উপর কলেজের হোস্টেলাদি নির্মিত হয়েছে। এখনকার হিন্দীভবনের উত্তর দিকে রাস্তার ধারে বাড়িটি বর্তমান ছিল।

---

৫. Visva-Bharati News, December 1943, pp. 63, 66

৬. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮

অতঃপর ১৯২৪ সালের অগস্ট মাস থেকে পুনরায় কয়েক মাস রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন।

এই সময়ের কথা তাঁর কন্যা শান্তাদেবী রামানন্দের চিঠিপত্র হতে উদ্ধার করেছেন। এই পত্রাংশ হতে রামানন্দের শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সঠিক তারিখ এবং সে-যুগের শান্তিনিকেতনের বা বিশ্ব-ভারতীর কার্যকলাপের একটা চিত্র পাওয়া যাবে ঃ

"শান্তিনিকেতন ১লা ভাদ্র। আমি নির্বিঘ্নে শান্তিনিকেতনে পোঁছিয়াছি ও ভাল আছি।"

"১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৪। আমি বেড়াইবার জন্য বাহির হই না বটে কিন্তু এখন আশ্রম এরূপ হইয়াছে যে দেখা সাক্ষাৎ করিতে এবং মিটিঙে বক্তৃতা শুনিতে হইলেই যথেষ্ট বেড়ানো হয়। তাছাড়া, ইতিমধ্যে দুদিন সুরুল (শ্রীনিকেতন) গিয়াছিলাম। আমি এখানে কোনরূপ কাজের ভার লই নাই। এবং লইব না।"

"৮-১২-২৪*। আমি কাল ১০টার পর সুরুল গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া গিয়াছিলাম। রবিবাবুর সেই গাছের উপর নীড়টিতে আমার আড্ডা হইয়াছিল। স্নানের বন্দোবস্তও ছিল।"

কাশাহারা নামে এক জাপানী মিস্ত্রী এই নীড়টি নির্মাণ করেছিলেন। কবি এখানে মাঝে মাঝে বাস করতেন। বাসস্থানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

"২২-৮-২৪। নন্দলালবাবু আজ একটা বড় রেশমী কাপড়ে আঁকা ছবি জাপানী ধরনে mount করিতেছেন দেখিলাম। এখানে একদিন সন্ধ্যার পর এণ্ডরুজ সাহেব চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেনে। তারপর ক্ষিতিমোহনবাবু ঐ দেশ বিষয়ে অনেক বলিয়াছিলেন।—কলাভবনে গিয়াছিলাম। ছবি আঁকা চলিতেছে।—রবিবাবু বোধহয় কাল আসিবেন।"

"৩১-১০-২৪। এখানে সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা পড়ে। এইজন্য বাহিরে বসিয়া থাকিতে হইলে ঠাণ্ডা লাগা নিবারণের জন্য (শীতের জন্য

ন্নয়) একটা কিছু গরম গায়ে দিতে হয় ! কাল এখানে প্রধানত মেয়েরা গান ও অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের সাজ, নৃত্য, গান বেশ হইয়াছিল ···ডাঃ রজনীকান্ত দাস কালই ফিরিয়া আসিয়াছেন।”

এখানে বলা আবশ্যক সে-যুগে মেয়েদের নৃত্য, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই পছন্দ করতেন না। ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায় এ বিষয়ে কড়া সমালোচনা হতো। রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্য প্রবর্তনে রামানন্দের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

“১৮-১-২৫। এখানে কাল মহর্ষির মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে উপাসনা ও সভা হইবে, এখানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা বাংলা নহে। এইজন্য এই উপাসনা ইংরেজীতে হইবে। তাহা আমাকে করিতে হইবে। সভার কতক কাজ ইংরেজীতে হইবে। আমি ইংরেজীতে কিছু বলিব।

“লর্ড কার্জনের কন্যা ও জামাতা এখানে কাল আসিয়াছেন। লোকের যাতায়াত এখানে বেশ আছে। সুতরাং জায়গাটা সহর না হইলেও কাজের ব্যাঘাত মধ্যে মধ্যে হয়।”

এই সময় হতেই বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীন রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে। অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ও শুরু হচ্ছে। চিত্রটি বর্তমান বিশ্বভারতীর সূচনা দিচ্ছে।

“১৬-৭-২৫। এখানে কাল রাত্রি থেকে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। ছেলেরা সকলে দলে দলে ভিজিতে বাহির হইয়াছিল। আমিও খালি পায়ে বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় দিয়া খুব বেড়াইয়াছি।*”

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভ হতে ছেলেদের এই রীতি ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে বেরতেন। বর্ষার ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-দিনেন্দ্রের সুরের ধারা বইত।

“১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেও রামানন্দ বছরের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে

---

* ১২।৮।২৪ ? তারিখগুলিতে ছাপার ভুল আছে কিনা জানি না। বোধহয় ক্রমান্বয়ে লেখা হয়নি।

দীর্ঘকাল ছিলেন। মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি বাড়ীতে তাঁহাদের খুব কাছেই ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আবার নিজের জন্য ছোট একটি বাড়ী করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

"অল্প কয়েক মাসের মধ্যে নানা বাড়ীতে ছিলেন। সকল সময়েই আশ্রমের সকলে তাঁহার প্রতি অনুরাগের নানা পরিচয় দিয়াছিলেন।... মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার খাওয়া দাওয়া তদারক করা, তাঁহার ভৃত্যকে রান্না শেখানো, তাঁহার কখন কি প্রয়োজন, তাঁহার কন্যাকে কলকাতায় জানানো, ইত্যাদি নানাভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তির পরিচয় দিতেন।

"১৯৩০ এবং ১৯৩১-এ তিনি কিছুদিন স্বর্গীয়া সুকেশী দেবীর বাড়ীটি ভাড়া করিয়াছিলেন। কিছুদিন প্রাক্তন ছাত্রদের পুরাতন বাড়ীতে আশা ও ভক্তি অধিকারীদের (অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা) সহিত ছিলেন।"[৭]

সুকেশী দেবীর বাড়ী ভেঙে চীনভবন এবং প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ী ভেঙে চীনভবনের পশ্চিম দিকের ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন যখন কলেজে পরিণত হয়, তখন ১৯২৫ সালে রামানন্দই তার প্রথম অধ্যক্ষ হন। এ বিষয়ে তাঁর কন্যা শান্তাদেবী লিখেছেন ঃ

"১৯২৫ এর জুলাই মাসে রামানন্দকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করার কথা হয়। এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে একদল অধ্যাপক ১১ই জুলাই শান্তিনিকেতন যান। তাঁহারা ১২ই জুলাই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। রামানন্দ বিশ্বভারতী কলেজের অবৈতনিক প্রিন্সিপ্যালের পদ সেই সময় না গ্রহণ করিলে কলেজের অনেকগুলি অসুবিধা হইত। একথা তাঁহার নিকট শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।"

৭ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ. ১৮১-৮২

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "১৯২৫ সন হইতে বিশ্বভারতীর নূতন ব্যবস্থা হইল।...বিশ্বভারতীর পূর্ব বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একদল বিশ্বভারতীর নিজস্ব ধারায় ও একদল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন...'কলেজে'র নাম 'শিক্ষাভবন' ও স্কুলের নাম 'পাঠভবন' হইল। এই শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"[৮]

রামানন্দ প্রধানত অধ্যক্ষ, তবু কোনো কোনো ক্লাস নিতেন।

রামানন্দের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিদ্যাভবনের (Post-graduate Research Department) তৎকালীন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন:

"শিক্ষাভবনের অধ্যাপকগণের মধ্যে তখন এণ্ডরুজ সাহেবও ছিলেন। বিশ্ববন্ধু দীনবন্ধু এণ্ডরুজের বিশ্বজোড়া কাজ, এজন্য বাহিরের কাজে তাঁহাকে অনেক সময় যাইতে হইত। এবং তাহাতে কলেজের ছাত্রদের পড়াবার ক্ষতি হইত। রামানন্দবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া এণ্ডরুজ সাহেবকে একটু মৃদুমন্দ তিরস্কার করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অধ্যাপক তখন তিনি কিছুতেই নিয়মিতভাবে না পড়াইয়া পারেন না। উদারমতি এণ্ডরুজ ইহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হইয়া সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আর কখনও ওরূপ করিতেন না। রামানন্দবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা কেমন ছিল তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।"[৯]

১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৬ সালের মধ্যে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের তিনজন অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যক্ষ রামানন্দ, দ্বিতীয় নেপালচন্দ্র রায় এবং তৃতীয় (১৯২৬ জুলাই) জাহাঙ্গীর ভকিল।

রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে বহু প্রকারে সাহায্য করতেন। রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করবার জন্য তিনি যেন সতত উন্মুখ থাকতেন।

---

৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী পৃ-২২২

৯ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ-১৮৩

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদেও রামানন্দ কখনো কখনো সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

"কণিকার তর্জমাগুলি Modern Review-তে বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলাম। কেননা, সে গুলা কাঁচা অবস্থার লেখা। তাহার পরে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম ভয়ের কোনো কারণ নাই—আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।...নভেম্বর ১৯১৩।"

রামানন্দ যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন তখন কোনো কোনো দিন, রবীন্দ্রনাথ দু একটি ইংরেজি লেখা রামানন্দের হাতে দিয়ে বলতেন, "এই নিন মশায়, আপনি ইস্কুল মাস্টার মানুষ; ব্যাকরণের ভুলগুলো মেজে ঘষে ঠিক করবেন।"

রামানন্দ কিন্তু কন্যাদের বলতেন—"আমি কখনও তাঁহার লেখার উপর কলম চালাইবার প্রস্তাব করি নাই, যদিও এরকম গল্প আমার নামে রটিয়াছে। কবির লেখায় আর্টিকেলের গোলমাল ও কমা-সেমিকোলন ছাড়া বিশেষ কিছু বদলাইবার প্রয়োজনও হইত না।"[১০]

রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র 'মুলু' পিতার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাল্যকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৩০৯ সালের ২৩শে চৈত্র তাঁর জন্ম এবং ১৩২৬ সালের ১৯শে ভাদ্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

"তার জীবনের কীর্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময় মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্ছে নিজের সাধ্য দ্বারা নিজের উপার্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেছে। সে পুরানো কাগজ নিজে, বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয়

১০ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ-১৭৩

নির্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয়নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি এবং তার চেয়ে বড় তার এই উৎসাহটি আশ্রমে রয়ে গেল।"[১১]

মুলুর মৃত্যুর পর রামানন্দ এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০০ টাকা দান করেন। এর নাম হয়—'প্রসাদ শৈশবিদ্যালয়।'

পূর্বেই বলেছি—বিশেষ করে 'মুলুর' জন্যই রামানন্দ একটি (মাটির খোড়ো) বাড়ী কেনেন। বর্তমান হিন্দীভবনের উত্তরদিকে রাস্তার ধারে এই বাড়ীটি তৈরি হয়েছিল। মুলুকে নিয়ে রামানন্দ পরিবারের অনেকে এবং অধিকাংশ সময় স্বয়ং রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বাস করতেন।

রামানন্দ লিখছেন ঃ

"প্রায় ২৩ বছর পূর্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) বাড়ীর (দেহলীর) সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম। মাঝখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো নিবতে দেখিনি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারান্দায় উপাসনায় বসেছেন ; নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখিনি ; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাতপাখা চালাতে দেখিনি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্ধক্যে ও ভগ্নস্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন।

---

১১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

এই সেদিনও গান্ধিজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন।"[১২]

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতা হতে একটি ঘটনার উল্লেখ করি :

মৃত্যুর দু তিন বৎসর পূর্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ দুপুরে কি করেন জানার জন্যে আমার বড় কৌতূহল হয়। মধ্যাহ্নের বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আমি তাঁকে কখনো শয়ান অবস্থায় দেখিনি। তিনি তখন এক হেলানো চেয়ারে বসে বিজ্ঞানের বই পড়তেন। কখনো বা 'বেদসার' প্রভৃতি বেদমন্ত্রসংগ্রহ পাঠ করতেন। সেই তাঁর বিশ্রাম (বা recreation)। আমি তাঁকে বলি—'দুপুরের নানা সময়ে আপনার ঘরে ঢুকে পড়ার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।' তিনি স্মিতহাস্যে বলেন—'উদ্দেশ্যটা কি?' আমি উত্তর দিই—'আপনি দিনে ঘুমোন কিনা দেখা।'

তিনি পরিহাসবিজল্পিত স্বরে বলেন—"পৈতের সময় প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল—মা দিবা স্বাপ্সীঃ। দিনে ঘুমিয়োনা। আমরা সেকেলে মানুষ। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করতে হয়—এই আমাদের বিশ্বাস।"

রামানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের যথার্থ গুণগ্রাহী অন্তরঙ্গ সুহৃদ খুব বেশি ছিল না। কবিকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার জন্যই তিনি কবির অন্তরের অন্তঃস্তলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই ভালোবাসা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই বরং উজ্জ্বলতর করেছিল।

১৯১৯ সালে পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নিরীহ স্ত্রী পুরুষ শিশুর উপর যখন নৃশংস গুলিবর্ষণ হয়—তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যে-পত্র লেখেন সেই ঐতিহাসিক পত্র সম্বন্ধে রামানন্দ মন্তব্য করেছিলেন :

"পত্রখানিতে পঞ্জাবের আধুনিক ঘটনাবলী ও অবস্থা সম্বন্ধে দেশের

[১২] প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮ (বিবিধ প্রসঙ্গ)

লোকের ধারণা ও মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সত্য। 'কবিজনসুলভ ভাবপ্রবণতা' বশতঃ হঠাৎ বিচলিত হইয়া তিনি এই কাজ করেন নাই। ধীর, সত্যনিষ্ঠ, হৃদয়বান, নির্ভীক, মানবপ্রেমিকের যাহা করা উচিত, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

"ইতিহাসে এবং মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে নানা ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি সহজে সামান্য উপকরণ হইতে বুঝা যায়। ইতিহাসের স্রোত কি কি কারণে কোন্ পথে ধাবিত হয়, জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন কি কি কারণে হয়, জনসমাজ কি কি কারণে সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, অবসাদগ্রস্ত বা নববলশালী হয়, ঐতিহাসিক নানা ঘটনার নিগূঢ় কারণ কি কি, এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অসাধারণ; তিনি ইতিহাসের তত্ত্বদর্শী, উহার মর্মস্থলে তিনি পৌঁছিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টির বলে ভারতেতিহাসের কোন কোন যুগ সম্বন্ধে বহু বৎসর পূর্বে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, বহু অধ্যয়ন-ও-গবেষণা পরায়ণ নিরপেক্ষ ও সত্যভাষী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার নানা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও অধ্যয়নের পর সেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্বরচিত কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যে-শক্তির বলে রবীন্দ্রনাথ পুঞ্জীকৃত মূল ঐতিহাসিক উপাদানে পরিবেষ্টিত না হইয়াও ইতিহাসের মর্মস্থলে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন, সেই শক্তি অল্প সংবাদ হইতেও তাঁহাকে পঞ্জাবের ঘোর দুর্দশা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি কেবল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করেন নাই, হৃদয়েও অনুভব করিয়াছেন। কবিদের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা কল্পনা ও অনুকম্পার (Sympathy) বলে সকল রকম মানুষের সঙ্গে অভিন্নাত্মা ও অভিন্নহৃদয় হইতে পারেন, সকল রকম মানুষের চিন্তা ধারণা, ভাব, উত্তেজনা, অবসাদ, বেদনা ও হর্ষ আপনাদের আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য মানুষদের বিষয় যখন তাঁহারা ভাবেন ও লেখেন, তখন তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া যেন ঐসব মানুষ হইয়া যান।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিশক্তি অসামান্য। এই শক্তি থাকায় মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের দুর্দশা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, পঞ্জাবীদের অপমান, নিগ্রহ ও বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, উহা তাঁহার মর্মে বিঁধিয়াছে।

"রবীন্দ্রনাথ জগৎ বিখ্যাত লোক; তাঁহার পত্র চাপা থাকিবে না। সভ্য জগতের বহু 'সাধারণ' লোক ও বহু মনীষী তাঁহার পত্রের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। প্রভুত্বোন্মাদ ও স্বার্থান্ধতা বশতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানরা বুঝিবে না, কিংবা না বুঝিবার ভান করিবে। লর্ড চেমসফোর্ড যদি এংলো-ইণ্ডিয়ান দলভুক্ত হন, তাহা হইলে তিনিও চিঠিটির দ্বারা উপকৃত হইবেন না। কিন্তু সভ্য জগতের লোকে চিঠিটি পড়িয়া কি ভাবিবে, এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে, ইংরেজদিগকে ও বড়লাটকে চিঠিটি কি ভাবাইবে ও করাইবে, তাহা আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় নহে। কারণ চিঠিটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, কাহারও কাছে আবেদন ও ভিক্ষুকের ক্রন্দন নহে।

"...আমাদের মধ্যে যদি সাংসারিক ক্ষমতা, সম্মান ও পদমর্যাদায় কাহারও মাথা ঘুরিয়া গিয়া থাকে, তিনি বুঝুন, যে, 'badges of honour make our shame glaring in their context of humiliation' এবং রবীন্দ্রনাথের মত অন্তরের সহিত বলুন 'I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings' যাঁহারা উপাধিধারী তাঁহাদিগকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আমরা একথা বলিতেছি না। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন রকমের অহংকার আছে, আভিজাত্যের, ধনের, শিক্ষার, বিদ্যার, পদমর্যাদার শক্তির বা রূপের অহংকার আছে। এই সব অহংকার বিসর্জন দিয়া যদি আমরা, দেশে ও সমাজে ভ্রমবশতঃ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বা ইতর

বলিয়া বিবেচিত সকল মানুষের পাশে তাহাদেরই দশজন বলিয়া কথায় কাজে ও অন্তরে দাঁড়াইতে পারি, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্র সার্থক হইবে। আর যদি আমরা আশা করিয়া বসিয়া থাকি যে, তাঁহার পত্র পড়িয়া সভ্য জগৎ বা সভ্য জগতের কোন অংশ দয়ার্দ্র হইয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিবে, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপমান আমাদের দ্বারা হইতে পারে না, আমরাও ইহা অপেক্ষা আমাদের নিজের গুরুতর অপমান করিতে পারি না এবং অধিকতর আত্মপ্রতারিত হইতে পারি না। যে নিজের দুঃখ মোচন করিতে পারে না, নিজের দুঃখ মোচন জন্য সর্বোৎসর্গের সত্যপণ করিতে পারে না, অন্য কেহ তাহার দুঃখ মোচন করিতে পারে না।"[১৩]

রামানন্দের এই সুচিন্তিত আলোচনায় ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তি, বন্ধুপ্রীতির চেয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোপরি মানুষ রামানন্দের, মনীষী রামানন্দের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এ মন্তব্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শান্ত, শমীবৃক্ষসম অগ্নিগর্ভ রামানন্দের উপযুক্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের অতি গুণগ্রাহী ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও সব সময়েই যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে যেতেন তা নয়, প্রয়োজন হলে তাঁর বিরোধিতাও করতেন।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের যুক্তি শ্রদ্ধাভরে শ্রবণ করতেন এবং অনেক সময়েই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ 'অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন।'[১৪]

২৫-১-১৯৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"আপনি আমাকে অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।"

১১-১০-১৯২৮ তারিখে লিখেছেন :

"সেদিন···সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরই মনে সংশয় উপস্থিত

১৩ প্রবাসী, (বিবিধ প্রসঙ্গ) আষাঢ়, ১৩২৬

১৪ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮

হয়েছিল…আপনি ওটা ছাপাতে চান না শুনে আরাম বোধ করলাম।"[১৫]

যে স্বল্প সংখ্যক মনীষী বিশ্বভারতীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী সেবক ছিলেন রামানন্দ তাঁদের অন্যতম। ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর পত্রিকা-গুলির দ্বারা বিশ্বভারতীর যে সেবা তিনি করে গেছেন—তার তুলনা নাই। তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের ঐ পূর্বোদ্ধৃত পত্রে রয়েছে ঃ

"তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়—এ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা যারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বা বিশ্বভারতীতে দীর্ঘকাল এঁদের উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য লাভ করি—তারা জানি, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ও বিশ্বভারতীর কত আপনজন ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ যে কী প্রবল তা যাঁরা শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন, তাঁরা জানেন। যখনই সুযোগ পেতেন রামানন্দ শান্তি-নিকেতনে চলে আসতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এই আসা যাওয়া কমেনি। প্রতিমাসের শেষ দশদিন তিনি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যেতেন। অনেকবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—তবু কলকাতা ফিরে যাবার ইচ্ছা করেননি। শান্তিনিকেতনে অবশ্য তাঁর সেবার কোনো ত্রুটি হতো না। তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্রছাত্রীদের স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা তাঁকে ঘিরে রাখত।

শেষ দিকে তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেনের বাড়ীতে থাকতেন। এইখানেই একবার (১৯৪০) তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রায় জোর করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়।

রামানন্দের সর্বশেষ শান্তিনিকেতনে আগমন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর

১৫ বিধুশেখর শাস্ত্রী—রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ. ২৬২

তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে (৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে তিনি উপাসনা করেন। মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে তিনি বলেন—"যে মহামানবকে গড়িয়া তুলিতে বিধাতার এত যুগ লাগিয়াছিল তাঁহাকে শুধু এই আশীটি বৎসরের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ প্রবাসীতে লিখেছিলেন ঃ

"...কবি মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছিলেন—বিশ্বভারতীরূপ নৌকাতে তাঁর জীবনের সব ধনরত্ন নিহিত হয়েছে। এই বিশ্বভারতীর যে আদর্শ তিনি ব্যক্ত করে গেছেন তা সম্পূর্ণ বজায় রেখে এটিকে স্থায়ী করা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়! সেই উপায় অবলম্বন করা হোক।

"লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। তা অনেক মাস আগে বলেছি।"[১৬]

রামানন্দের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বভারতী আজ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। যার অস্তিত্ব বিলোপের আশংকা দেখা গিয়েছিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের দেশবাসী, জাতীয় সরকারের সহায়তায় রক্ষা করেছেন।

যে অর্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধনা করে গেছেন, বৃদ্ধ বয়সেও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন,—আজ বিশ্বভারতীতে সে অর্থের প্রাচুর্য এসেছে। কোথাও তার দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই।

বিশ্বভারতীর যোগ্য কর্ণধারগণের অক্লান্ত উদ্যোগে শান্তিনিকেতন এখন কবিজন বাঞ্ছিত মনোরম উদ্যানে পরিণত হয়েছে। "বিবিধ দেশ-গ্রথিত বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের মালিকা"[১৭] বিশ্বভারতীর কণ্ঠাভরণ রূপে শোভা পাচ্ছে।

---

১৬ প্রবাসী, (বিবধ প্রসঙ্গ) ভাদ্র, ১৩৪৮

১৭ বিশ্বভারতীর 'সংকল্প বচন' ঃ সেয়মুপাসনীয়া নো বিশ্বভারতী বিবিধ-দেশগ্রথিতাভির্বিচিত্রবিদ্যাকুসুমমালিকাভিঃ......।

নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তর, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকবৃন্দের নব নব বাসভবনে পূর্ণ এবং শিশুদের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। মরুসম তৃণলেশশূন্য কঠিন ভূমি আজ সুজলা, শস্যশ্যামলা হয়ে উঠ্‌ছে। অন্ধকার দিগন্ত আলোকিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ব্যবধান ঘুচে গেছে।

নানাদেশসমাগত প্রতিভাবান, আদর্শপরায়ণ তরুণ অধ্যাপকগণ আজ বিশ্বভারতীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। নম্র, বিনয়ী অথচ তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ এই উদীয়মান তরুণ প্রতিভা বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে।*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সাধনা সার্থক হবে।

জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৭২

---

* প্রবন্ধ রচনায় রামানন্দের দুই কন্যা সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' এবং 'ভারত-মুক্তি সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থ হতে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

ম হা ত্মা গা ন্ধী ও বি শ্ব ভা র তী

আমার জীবনে কয়েকজন মহামানবের সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল ; তাঁদের অন্যতম হলেন—মহাত্মা গান্ধী। আজ তাঁর শততম জন্মদিন। তাই তাঁর কথাই আজ বার বার স্মরণে আসছে।

তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় চারবার শান্তিনিকেতনে এবং একবার ওয়ার্দায়।

ওয়ার্দা দিয়েই শুরু করি। ১৯৩৩ সাল। আমি তখন রবীন্দ্রনাথের আদেশে অনুন্নতজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ আমার কর্মস্থল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অনুন্নতজনের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওয়ার্দায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে অপরাহ্ণে এক মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় নিলাম। শুনলাম কিছু পরেই মহাত্মার আশ্রমে সান্ধ্য-উপাসনা হবে। তাই ধূলাপায়েই আশ্রম-অভিমুখে যাত্রা করলাম।

জীবনে প্রথম মহাত্মার এই মহান্ সর্বজনীন উপাসনায় যোগ দেবার সুযোগ হলো। বয়সে তখন যুবা, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ নই। ভগবদ্ভক্তও নই। তবু মনের মধ্যে উপাসনার একটা ছাপ রয়ে গেল—যা আজও ভুলতে পারিনি।

সেদিন সন্ধ্যায় আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

আমরা যারা সাধারণ, তারাই অসাধারণ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভের জন্যে চেষ্টা করি। অসাধারণ সাধারণকে খুঁজে যেচে এসে আলাপ

করেন, এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে। তাই ঘটেছিল—তাই বলছি, আশ্চর্য ঘটনা।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপাসনার পরে আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন; "আপনি কি হরিজনকর্মী? বাংলাদেশ থেকে আসছেন?"

আমি চমকে উঠলাম। কেননা, আমাকে সেখানে চিনতে পারেন —এমন কেউ ছিলেন না। আমি যাঁর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তিনি উপাসনায় আসেননি, সঙ্গেও কোনো লোক দেননি। উপাসনায় যোগদানে ইচ্ছুক জনতাকে অনুসরণ করেই আমি গান্ধী-আশ্রমে আসি। সুতরাং এক ব্রিটিশের গুপ্তচর ছাড়া—এমন সর্বজ্ঞ কে আছেন, যিনি আমার পরিচয় জানতে পারেন।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন:

"আমার নাম অমৃতলাল ঠক্কর। আমি হরিজনসেবক। আজ রাত্রে আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার অতিথি হন, তাহলে আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ করার সুযোগ হয়।"

আমি মুগ্ধ। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম: "এতো আমার সৌভাগ্য!"

সঙ্গে করে তিনি আমায় তাঁর ডেরায় নিয়ে গেলেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযমুনালাল বাজাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে অমৃতলাল তাঁর অস্থায়ী ডেরা বানিয়েছেন। তারই একটি কুটিরে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

'অতিথি দেবতা'—এই বাক্যের তাৎপর্য অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করলাম। পিতার বয়সী মানুষটি স্বহস্তে আমার শয্যা রচনা করলেন। আহারের পর, আমার শয্যার পাশেই রাখলেন লোটাভর্তি পানীয় জল এবং একটি গেলাস। শৌচাগার দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন: "আমি পাশের ঘরেই আছি, রাত্রে উঠলে আমাকে জাগাবেন কোনো সংকোচ করবেন না।"

রাত্রে আর তাঁকে জাগাইনি। এমন সব নিখুঁত ব্যবস্থা ও নির্দেশের পর তাঁকে জাগাবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

প্রভাতেই অমৃতলাল ওয়ার্দা ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সে বিদায়-দৃশ্য আজও হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। নিতান্ত শিশু, বালক বালিকা, তরুণ তরুণী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, সকলেই পরম আগ্রহে তাঁর পায়ের ধূলা নিচ্ছেন—সকলেরি তিনি 'ঠক্কর বাপা'।

তাঁর বিদায়কালে 'ঠক্কর বাপা' 'ঠক্কর বাপা' ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হলো।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে, যা কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি—কারণ তারও প্রয়োজন আছে। কবি বলেছেন ঃ

"যারা আমার সাঁজসকালে গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরণা-স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা
চলছে ব'য়ে চতুর্দিকে---।" পলাতকা।

সুতরাং গান্ধী-চরিত্রের আলোচনার পূর্বে তাঁর 'মনের মানুষ'দের চরিত্র আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক তো নয়-ই, বরং অতীব প্রাসঙ্গিক।

মন্দিরে দেবতার দর্শনলাভের পূর্বে, মন্দিরের পথপার্শ্বে যে ফুলের গাছগুলি ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সৌরভ বিতরণ করছে, তারা মন্দির প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, মনকে দেবতা দর্শনের উপযোগী করে তুলছে।

অবশ্য মন্দিরের আশেপাশে কাঁটাগাছ যে দু'একটা নাই, তা নয়। সাবধানে না চললে, কণ্টকবিদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। তারা দেব-দর্শনে বাধাসৃষ্টিও করে থাকে।

অমৃতলালের ওয়ার্দা ত্যাগের পর, আশ্রম-অভিমুখে রওনা হলাম। সেখানে তখন মহাত্মার একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই ছিলেন না। একজন অস্থায়ী মদ্রদেশবাসী একান্তসচিব কয়েকদিনের জন্যে দ্বাররক্ষা করছিলেন।

"দূরদেশ থেকে এসেছি—মহাত্মার দর্শন অভিলাষী—" শুনেও তিনি আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না। বললেন—"তিনি এখন মৌন অবলম্বন করে আছেন—এখন কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করেন না।" তাঁর ভাষাতেই বলি ঃ

"Even if god Shiva comes, Bapuji will not meet him !"

আমার হতাশ হবার কথা। কিন্তু সে-বয়সে অত সহজে হতাশ হতাম না। তাই তাঁকে বললাম—"ঠিক আছে। তবে আপনি কি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ? দয়া করে আমার এই কাগজপত্রগুলি কি তাঁকে দেবেন ?"

তিনি আমার এই অনুরোধ রাখবেন বলে কাগজপত্রগুলি হাতে নিলেন। সেই কাগজপত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া আমার 'পরিচয়পত্র' ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেগুলি দেখে মহাত্মা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

যাই হোক, আমি সেদিন গান্ধী আশ্রমের আতিথ্যলাভ করলাম।

বয়স অল্প, ভোজনবিলাসী বলে খ্যাতি ছিল—সুতরাং খুঁজে পেতে, প্রথমেই পাকশালায় উপস্থিত হলাম।

সেখানে নারী পুরুষ উভয়ে মিলে কুটনা কুটছিলেন। তাঁদের নেত্রী মহাত্মার সহধর্মিণী পূজনীয়া কস্তুরবা।

জীবনে এক পরম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এলাম। 'কস্তুরবা'—এমন মহীয়সী নারী দেখি নাই। আর দেখব বলেও মনে হয় না।

'জগজ্জননী' কথাটা অনবরত উচ্চারণ করি। যাঁকে উদ্দেশ করে এ-শব্দের প্রয়োগ—বলা বাহুল্য, তাঁকে দেখি নাই—এবং এ-জীবনে দেখব কিনা তাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কিন্তু মানুষের মধ্যেই যে একদিন জগজ্জননী দেখব—একথা কল্পনারও অতীত ছিল।

সেই কল্পনার অতীতকেও প্রত্যক্ষ করলাম। যেমন সহজভাবে নিজের জননীকে প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁর কোলের কাছে বসেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁকে সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম—তাঁর কোলের কাছে বসলাম। পরিচয়ের প্রয়োজন হলো না। সেখানে উপস্থিত অন্য আশ্রমিকদের মতোই আমিও নিঃসংকোচে তরকারী কুটতে লেগে গেলাম।

মনে হলো, আজ নতুন নয়, এই ভাবেই এই অন্নপূর্ণার সঙ্গে দিনের পর দিন, সকলের অন্নপ্রস্তুতে অংশ নিয়েছি।

এমন সহজ সরল মানুষ আর দেখব কি ?

পত্নীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। ইনি যে মহাত্মার অর্ধাঙ্গিনী—তাতে কি আর সন্দেহ আছে।

দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরেও সেদিনের সে স্মৃতি বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। আজও চক্ষের সম্মুখে কস্তুরবার সেই জগজ্জননী অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রত্যক্ষ করছি।

স্নানাহারের পরই খবর পেলাম, মহাত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎলাভ হবে। স্বয়ং সেই একান্তসচিবই হাসিমুখে এ-খবর আমায় দিয়ে গেলেন। বললেন : "যতক্ষণ ইচ্ছা, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে, মহাত্মাও বলতেন—'গুরুদেব।' সেই গুরুদেবের 'পরিচয়পত্র' দেখেই তিনি তাঁর কড়া নিয়ম শিথিল করলেন—এও এক আশ্চর্য ঘটনা।

যথাসময়ে তাঁর মুখোমুখি বসলাম। জীবনে প্রথম এবং শেষ, এই-রূপ অতিসন্নিকটে, প্রায় নির্জন গৃহে, মুখোমুখি বসে মহাত্মার সঙ্গে কথা বললাম।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম, শান্তিনিকেতনে-ঘটা হপ্তাখানেকের ঘটনাও তাঁর জানা আছে। একটা নতুন খবর দিয়ে মহাত্মাকে খুশির চমক দেব ভেবে মনে যে দর্প এসেছিল, দর্পহারী তা চূর্ণ করে দিলেন।

মহাত্মাই আমাকে চমকিত করে, বিনীতভাবে বললেন :

"Yes, I know।"

মহাত্মার অমূল্য সময় বেশিক্ষণ নষ্ট করলাম না। করজোড়ে বিদায় নিলাম। তিনিও ঠিক তেমনি করজোড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

পরিতৃপ্ত হয়ে ওয়ার্দা ত্যাগ করলাম।

এরপর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সর্বশেষ দেখা ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, শান্তিনিকেতনে। সেই তাঁর শেষ শান্তিনিকেতনে আসা।

সেই প্রথম রবিজ্যোতিহীন শান্তিনিকেতনে মহাত্মা প্রবেশ করলেন!

রবি অস্ত গেছে। সন্ধ্যা সমাগত। গৌর প্রাঙ্গণে চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীরণ করে, মহাত্মা সান্ধ্য-উপাসনায় বসলেন।

মহাত্মাকে কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু তাঁর এমন আশ্চর্য রূপ আর কখনো দেখি নাই।

আমাদের সাধারণের ধারণা, সৃষ্টিকর্তা যাকে যা রূপ দিয়েছেন, সেই রূপ, আমরা যতই ঘসা মাজা করি এবং যত বহিঃসজ্জায় সজ্জিত করি না কেন, তার আর বড় বেশি পরিবর্তন করা যায় না।

কিন্তু 'খোদার উপরও খোদকারী' করা যায়! মহামানব বিধাতার সৃষ্টির উপরেও নিজের রূপ সৃষ্টি করেন। সাধনায় অর্জিত সে রূপ। সর্বসাজসজ্জাবিরহিত জ্যোতির্ময় অপরূপ রূপ!

পূর্ণতাকে যিনি স্পর্শ করতে চলেছেন, পূর্ণ যা, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন যিনি, তাঁকে দেখলাম! ওয়ার্দায় দেখা সেই গান্ধী আজ, আর এক রূপে আবির্ভূত হলেন!

মৃত্যুর পর-ই কি নতুন জন্ম হয়? এ জীবনেই কি আমরা বার বার জন্মগ্রহণ করি না?

গান্ধী-দেহে তাঁর সেই অন্তিম জন্ম প্রত্যক্ষ করলাম।

শ্রীঅরবিন্দ নাই! রবীন্দ্রনাথ গত! মহাত্মা গান্ধীও গত! সে-রূপ কি আর কোনো মহামানবের মধ্যে, এ জন্মে দেখব? জানি না!

পরদিন সকালে, মহাত্মা, বিশ্বভারতীর কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলেন —উত্তরায়ণের উদয়ন প্রাসাদের পশ্চিমদিকস্থিত সভাগৃহে, যেখানে

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

মহাত্মা সমবেত কর্মীমণ্ডলীকে যদৃচ্ছা প্রশ্নের অনুমতি দিলেন।

মহাত্মার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রায় সকলেরই! কারো কারো আবার (যৌবনে যেটা স্বাভাবিক) প্রশ্ন করে মহাত্মাকে চকিত করার ইচ্ছা—প্রশংসা লাভের কামনা!

জীবনে যাঁর অভিজ্ঞতার আর অন্ত নাই, অনবরত অনন্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন যিনি, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর যিনি পেয়ে গেছেন—তাঁর কাছে নতুন প্রশ্ন আর কী বা আসতে পারে!

সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁর ওষ্ঠাগ্রে। প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই, সুচিন্তিত উত্তর আসছে, দেখে আমরা অভিভূত হলাম!

উত্তর দিচ্ছেন যিনি তিনি আত্মমগ্ন, শান্ত, সমাহিত! যেন নিজের প্রশ্নেরই নিজে উত্তর দিচ্ছেন। আর কী মধুর সে-উত্তর!

অবিনীত প্রশ্নেরও সুবিনীত উত্তর। 'পিতা যেমন পুত্রকে, সখা যেমন সখাকে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে'—পরম প্রীতিভরে, প্রশ্নের উত্তর দেন, ঠিক তেমনি প্রীতিভরা মধুক্ষরা উত্তর!

প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি প্রশ্নকর্তার অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দর্শন করছিলেন। এমন মানুষকে প্রশ্ন করাও বিপজ্জনক!

প্রশ্নকারী এক অধ্যাপককে মহাত্মা বললেন ঃ

"এ জিনিস ভালো নয়! এ মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস করে! এর থেকে সদা সতর্ক হয়ে, আপনাকে রক্ষা করবেন!"

আত্মগরিমার আভাস পেয়েছিলেন তিনি, প্রশ্নকারীর প্রশ্নে।

মহাত্মার উত্তরের যথাযথ ভাষা মনে নাই; কিন্তু ওই যে বলেছি—'পিতা যেমন পুত্রকে, সখা যেমন সখাকে—'তেমনি মধুরভাবেই তিনি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

দিকভ্রান্তকে দিক, পথভ্রষ্টকে পথ দেখানোই যাঁর স্নেহনির্ঝর হৃদয়ের একান্ত আকৃতি, তিনি ঐভাবে সতর্ক না করে পারেন না।

অপ্রিয় সত্য আমরা বলতে চাই না। বলতে কুণ্ঠিত হই! কিন্তু অপ্রিয় সত্যকেও মধুরভাবে বলা যায়; সেদিন তা হৃদয়ঙ্গম হলো।

সারাজীবন যিনি ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় বার বার অধ্যয়ন করেছেন, আপনাকে সেই স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শের অভিমুখে প্রাণপণে পরিচালনা করেছেন, জীবনের প্রান্তভাগে এসে তিনি সেই স্থিত-প্রজ্ঞার স্পর্শলাভ করেছেন—মনে-প্রাণে তা উপলব্ধি করলাম।

একটি প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মার মহান্ হৃদয়ের অপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় পেলাম।

সত্য কথা বলতে কি, মহাত্মার সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল—তিনি পরমতসহিষ্ণু হতে পারেননি।

'হয়ত' পূর্বে-তা পারেননি, কিন্তু যেদিন তাঁর সঙ্গে সেই উদয়ন প্রাসাদে শেষ সাক্ষাৎকার হলো, সেদিন দেখলাম তাঁর আশ্চর্য পরমতসহিষ্ণুতা!

"বিশ্বভারতীর কর্মীদের রাজনৈতিক কার্য-কলাপে যোগ দেওয়া উচিত কিনা"—এই প্রশ্নটি করলেন, এক প্রাচীন অধ্যাপক।

মহাত্মা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন:

"না! উচিত নয়! বিশ্বভারতী রাজনীতির ঊর্ধ্বে! এখানে আপনারা যা গড়ে তুলছেন, স্বাধীন ভারতে তার স্থান হবে খুব উচ্চে!

"আমরা তো এখন সব ভাঙ্‌ছি। গড়ব যখন, গড়ব কী দেখে! বিশ্বভারতীই হবে সেই নতুন ভারত গড়ার আদর্শ!"

বিশ্বভারতীর কর্মীগণও রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ নেবেন, গান্ধীপ্রবর্তিত আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবেন, বলে যে-সব গান্ধীভক্ত আশ্রমিক, তদানীন্তন কর্মসচিব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুমুল তর্ক করতেন—তাদের মুখ বন্ধ করা হলো!

সেদিনকার সেই পরিণত, মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষ আর দেখতে পেলাম না।

—নবজাতক, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী-চীনভবন

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙিব পাষাণকারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা[১]।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'--উপনিষদের এই মন্ত্রটি যেমন মহর্ষির জীবনে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও তার প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—ইহা কাজের কথা। ইহা কাল্পনিক কিছু নহে, ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণ দ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া, তাহার পরে দিনে দিনে, পদে পদে, ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী স্বদেশি ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।"[২]

এই বীজমন্ত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে, রবীন্দ্রজীবনে বিশ্বমৈত্রীরূপ বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয়েছিল। যে বিশ্বমৈত্রী তাঁর সাহিত্যকে, তাঁর জীবনকে উত্তরোত্তর মহিমান্বিত করেছে—তার মূলে রয়েছে, উপনিষদের এই মন্ত্রটি।

---

১ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—প্রভাতসংগীত—১৮৮২-৮৩ (১২৮৮ চৈত্র-১২৮৯ পৌষ)

২ 'ধর্মপ্রচার'—১৯০৪ (ফাল্গুন ১৩১০), ধর্ম, পৃ ৬১

যেমন উপনিষদ্ তেমনি বৌদ্ধসাহিত্য তাঁর জীবনে বিশ্বপ্রেম উদ্বোধনে সতত সহায়তা করেছে।

"তাহা (করুণা) জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে, আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহা পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য।···বুদ্ধদেব বলিয়াছেন: মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের (একমাত্র) পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্ব দিকে, অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে, অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে।—ইহাকে 'ব্রহ্মবিহার' বলে।"[৩]

ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে পুনরায় তিনি লিখছেন:

"মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।···অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে, মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে 'ব্রহ্মবিহার' বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

"ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁর সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, না মেশালে সেতো 'ব্রহ্মবিহার' হল না।

"কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন: ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই জানতে চাইবে।

"সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী, সেতো স্পষ্ট করে পরিষ্কার

---

৩ 'উৎসবের দিন'—১৯০৫ (মাঘ ১৩১১), ধর্ম, পৃ ৯১

করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেচেন—তাকে ছোটো করে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

"অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।"[৪]

ব্রহ্মোপাসক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোকে বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহারের' কী অপূর্ব সুন্দর ব্যাখ্যাই না এখানে করেছেন।[৫]

উপনিষদের মন্ত্রকে অবলম্বন করে অন্যত্র তিনি 'ব্রহ্মবিহারের' এইরূপ ব্যাখ্যা করছেন: "...ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে 'ব্রহ্মবিহার'। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?—যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।"

যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ। অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন, সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে, শরীর দিয়ে নয়, তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব। সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা, আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি, সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগতকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য

---

৪ ব্রহ্মবিহার—১৯০৯ (চৈত্র ১৩১৬), শান্তিনিকেতন, পৃ ৩০৭-৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ২৪৯-৫০।

৫ আচার্য বুদ্ধঘোষ 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' গ্রন্থে 'ব্রহ্মবিহার'-এর এইরূপ অর্থ করেছেন: 'ব্রাহ্মগণ সেরূপ নির্দোষচিত্তে বিহার করেন, ইহাতে (মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাতে) যুক্ত হইয়া যোগিগণ ব্রহ্মার ন্যায় (নির্দোষচিত্ত) হইয়া বিহার করেন। শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্দোষত্বের জন্য (ইহাদিগকে—মৈত্রী, করুণা মুদিতাকে) 'ব্রহ্মবিহার' বলা হয়।' 'বিশুদ্ধিমগ্‌গ'—নবম পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীকে টানছে। তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য, সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই, তা হলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে।

"…ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল—এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে; এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে, ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন[৬]; এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে, সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন। যাতে মানুষের মন হিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।"[৭]

এইরূপ এক বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ববোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত আশ্রমকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করেছিলেন, যা ক্রমে ক্রমে একদিন (১৯১৯-২১) বিশ্বভারতীতে পরিণতি লাভ করেছিল।[৮]

১৯১৩ সালের (৭ই পৌষ, ১৩২০) বার্ষিক উৎসবের দিনে মন্দিরে

---

৬ যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ঈশোপনিষদ্—৬

৭ 'বিশ্ববোধ'—শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৮-৪০

৮ এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
—১৯১০ (১৮ই আষাঢ় ১৩১৭)

তিনি বলেছেন : "...এ আশ্রম—এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস-সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয়, তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে, এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে, একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না।...এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে, সকলেই আশ্রয় পাব—এইজন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে, যে-কোনো সমাজ থেকে, যেই আসুক না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে, আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর, দূর-দূরান্তর থেকে, যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে, যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে, কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সঙ্কুচিত না হয়।"[৯]

'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' কি ভাবে 'বিশ্বভারতীতে' পরিণত হতে চলেছে, এই অপূর্ব ভাষণ তার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

'বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহাসদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।'[১০] 'যোগী সেই পরমসত্যকে দর্শন করলেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যিনি বিরাজমান। যাঁর মধ্যে বিশ্ব একনীড়ে আশ্রয় পেয়েছে।'

'বিশ্ব একনীড়ে আশ্রয় পেয়েছে'—বেদমন্ত্রের এই চরণটিকে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ করলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিশ্বভারতীতে পরিণত হলো।

—শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে—

—১৯১১—১৩ (১৩১৮)?

---

৯ 'মুক্তির দীক্ষা'—শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৮৫
—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২ শ, পৃ ৪৮৮

১০ বাজসনেয়ি ৩২।৮

বিশ্বভারতীতে আর্য, অনার্য—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন,পারসীক, মুসলমান, খ্রীস্টান, পূর্ব, পশ্চিম—একটি স্নেহময় নীড়ে আশ্রয় পেয়েছে।

'বিবিধ দেশগ্রথিত বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের মালিকার দ্বারা বিশ্বভারতীর উপাসনা করিতে হইবে'—

বিশ্বভারতীর 'সংকল্পবচন' অনুযায়ী ১৯১৯-২১ খ্রীস্টাব্দেই এই উপাসনা শুরু হয়ে গেল। প্রাচীন ভারতের সাধনার দুই প্রধান ধারা যাতে রবীন্দ্রনাথের অভিষেক হয়েছিল, সেই বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধনার ধারা-সিঞ্চিত সাহিত্যের সুগন্ধি পুষ্পের মালিকার দ্বারা বিশ্বভারতীর উপাসনা আরম্ভ হলো। ক্রমে ক্রমে, জৈন, পারসীক, মুসলমান সংস্কৃতিও বিশ্বভারতীর গবেষণার অন্তর্গত হলো। তারপর পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য দর্শন বিশ্বভারতীর পাঠ্যভুক্ত হলো।

ভারত সিংহল বলি সুমাত্রা জাভা তিব্বত চীন জাপান পারস্য ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি ইতালি প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বদেশের বিদ্বান ও বিদ্যার্থিগণ বিশ্বভারতীতে সমবেত হলেন।

পূর্বেই বলেছি বৌদ্ধধর্ম রবীন্দ্রনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নানা প্রবন্ধ আছে। বহু কবিতা গান নাটক গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য তিনি বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে, পাশ্চাত্ত্যদেশীয়গণ অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা করেছেন। অথচ আমাদের দেশে সে-সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য কিছুই করা হয়নি—এ তাঁকে বড়োই ব্যথিত করে। তিনি লিখছেন: "এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।...সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চিরজীবনের ব্রতস্বরূপে

স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?"[১১]

পনের বৎসর পূর্ব হতেই যে-ভাব তাঁর অন্তরকে এইভাবে আলোড়িত করত—বিশ্বভারতীর প্রারম্ভেই তিনি সেই ভাবকে রূপদান করলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের উদ্ধার—বিশ্বভারতীর ব্রতস্বরূপ হলো। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন 'তরুণযুবার উৎসাহ এইপথে ধাবিত' হলো।

রবীন্দ্রনাথের উদার আহ্বানে, তাঁর অলৌকিক চরিত্রের আকর্ষণে, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi) বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপকরূপে আগমন করলেন।

চীন ও তিব্বতীভাষায় বৌদ্ধধর্মের অমূল্য সম্পদ সুরক্ষিত আছে। যে সম্পদের অনেকাংশ পালিতে নাই এবং ভারতবর্ষে নাই, সেই সম্পদ, চীন ও তিব্বতী ভাষা হতে উদ্ধার করতে হবে। তাই অধ্যাপক লেভি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে চীন ও তিব্বতী ভাষায় দীক্ষা দান করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক প্রবোধ বাগচী, অসীম জ্ঞানপিপাসায় অধ্যাপক লেভির নিকট উপস্থিত হলেন। আগামীকালের বিশ্ববিশ্রুত চীন ভাষাবিৎ বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ উপাচার্য প্রবোধচন্দ্রেরও দীক্ষা হলো। বিশ্বভারতীর এ-এক স্মরণীয় দিন।

তিব্বতী ত্রিপিটক তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর ক্রয় করা হলো। বিশ্বভারতী তখন দরিদ্র। তবু রবীন্দ্রনাথ এর জন্য পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া বিশ্বভারতীর পক্ষে সহজ ছিল না। বিশ্বভারতীতে তিব্বতী ভাষার চর্চা অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চীনদেশে গেলেন। তাঁর এই

---

১১ ধম্মপদ—১৯০৫ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২), প্রাচীন সাহিত্য পৃ ৯১

ঐতিহাসিক অভিযানে যাঁদের তিনি সঙ্গে নিলেন তাঁরা ভারত সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রতিনিধি—রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর সুধীশ্রেষ্ঠ ক্ষিতিমোহন সেন, স্বনামধন্য নন্দলাল বসু এবং অধ্যাপক কালিদাস নাগ।

ভারত ও চীনের সে এক সৌভাগ্যের দিন। দুহাজার বছর পূর্বে স্থাপিত মৈত্রীর সম্বন্ধ সেদিন থেকে আবার নতুন করে শুরু হলো।

চীন ও ভারতের মধ্যে ৬৭ খ্রীস্টাব্দ হতে সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ যে অবিচ্ছিন্ন মৈত্রীর সম্বন্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনারূপে চিহ্নিত ছিল, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে, তৎকালীন বিচ্ছিন্ন ও বিস্মৃতপ্রায় সেই সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপিত হলো। চীনের জনগণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের পরমারাধ্য বুদ্ধের ন্যায় সাদরে পরমশ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করলেন।

হাজার বছর ধরে ধর্ম ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান চীন ও ভারতের মধ্যে অনবরত যেভাবে চলছিল, ভারতীয় শ্রমণগণ চীনে এবং চীন-পরিব্রাজকগণ ভারতে যেভাবে গমনাগমন করেছেন, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথ চীনবাসীদের পুনরায় ভারতে আহ্বান করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

তাঁর এই চীনভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হলো। চীন ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান পুনরায় কিভাবে কার্যকর করা যায়, চীনদেশীয় সুধীগণ সে কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে ১৯২১ সাল হতেই বিশ্বভারতীতে চীনে-ভাষার চর্চা চলেছে। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে কিছুকাল অবস্থান করে চলে যান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিশ্বভারতীর অমোঘ আকর্ষণে পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক লেভি দেশে ফিরে গেলেন। তার বৎসরখানেক পরেই অধ্যাপক লিন্ ও-চিয়াং (Dr Lin Wo-Chiang) বিশ্বভারতীতে এলেন। তিনিই বিশ্বভারতীর প্রথম চীনদেশীয় অধ্যাপক। তাঁর সময়ে (১৯২৪-২৫) বিশ্বভারতীতে নিয়মিতভাবে 'চীনে ক্লাস' চলতে থাকে। কয়েকজন

অধ্যাপক ও তরুণ ছাত্র পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে, এই দুরূহ ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন। অধ্যাপক লিন্ চলে গেলেন। কিন্তু চীনভাষার চর্চা বন্ধ হলো না।

১৯২৬ সালে বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, চীন ও তিব্বতী ভাষায় অভিজ্ঞ অধ্যাপক জি. তুচ্চি (G. Tucci) বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ তদানীন্তন ইতালি সরকার তাঁকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে প্রেরণ করেন। বিশ্বভারতীতে অবস্থান-কালীন তাঁর যাবতীয় ব্যয় ইতালীয় সরকারই বহন করেছিলেন।

অধ্যাপক তুচ্চির নেতৃত্বে চীনভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধশাস্ত্রের গবেষণা আরম্ভ হলো। 'মূলমধ্যমক-কারিকা' প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধদর্শনগ্রন্থের চীনে অনুবাদ মূলের সঙ্গে তুলনা করে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতে লাগল।

অবশেষে ১৯২৮ সালে স্বনামধন্য অধ্যাপক তান য়ুন-শান বিশ্ব-ভারতীতে আগমন করেন। তাঁর আমগন বিশ্বভারতীতে এক নবযুগের সূচনা করে।

এরপর চীনদেশ হতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য বিশ্বভারতীতে কয়েকজন বিদ্যার্থী এলেন। ক্রমে ক্রমে গৃহস্থ ও ভিক্ষু উভয় শ্রেণীর চীনে ছাত্র চীনদেশ হতে আসতে লাগলেন। তাঁরা সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা এবং ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া থেকেও গৃহস্থ ও ভিক্ষু বিদ্যার্থী এবং শিক্ষকের আগমন হতে থাকে। এঁদের মধ্যে ১৯২৬ সালে আগত সো নম্ ঙগ্ ডুব এবং ১৯৩১ সালে আগত গে, শে খুব, তেন, সো, বর (কল্যাণমিত্র—* মুনিশাসন প্রজ্ঞ) এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

চীন ও তিব্বতী ভাষায় গবেষণার কাজ অত্যুদ্যমে চলতে থাকে। কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থ চীন তিব্বতী ভাষা হতে উদ্ধার করা হয়।

* তিব্বতের 'ডেপুঙ্' মঠের উপাধি

লুপ্ত গ্রন্থের এই উদ্ধারকার্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন গবেষক বিদ্যার্থী 'নৈরাত্মপরিপৃচ্ছা' নামক একখানি গ্রন্থ তিব্বতী হতে সংস্কৃতে উদ্ধার করেন। দৈবক্রমে মূলগ্রন্থখানি তারপর পাওয়া যায়। উদ্ধার করা গ্রন্থ, মূলগ্রন্থের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণ তিব্বতীভাষা হতে গ্রন্থোদ্ধার কার্যের এই অপূর্ব সাফল্যে আহ্লাদিত হন। এই ঘটনায় কেবলমাত্র বিশ্বভারতীতে নয় পৃথিবীর সর্বত্র, তিব্বতী অনুবাদ হতে মূল গ্রন্থের উদ্ধারকার্যে বেশ উৎসাহ দেখা যায়।

এদিকে অধ্যাপক তান য়ুন শানের আগমনে এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশ্বভারতীতে চীনসংস্কৃতির ভিত্তি দৃঢ়মূল হলো। অবিচ্ছিন্ন-ভাবে তিন বৎসর অধ্যাপনার পর, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক অনু-প্রেরণায় অধ্যাপক তান এক বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত দূতরূপে চীনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এবং তান য়ুন-শানের উদ্যোগে চীনে 'চীনভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ' (Sino-Indian Cultural Society)-এর উদ্ভব হলো। চীনদেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এবং চীন সরকারের প্রতিনিধিগণ এর সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন।

১৯৩৪ সালে তান য়ুন-শান পুনরায় ভারতে আগমন করেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কৃতকার্যের পরিচয় দিলেন। এই সময় ভারতেও (শান্তিনিকেতনে) 'চীন ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ' (চীন-ভারতী) স্থাপিত হলো। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে অধ্যাপক তান, ভবিষ্যৎ 'চীনা ভবনের' এক বিস্তৃত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন।

চীনবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীপূর্ণ আমন্ত্রণ এবং উপরোক্ত পরিকল্পনাসহ তান য়ুন-শান, ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় চীনে প্রত্যাবর্তন করেন।[১২]

---

১২ এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দুটি ঐতিহাসিক পত্র এখানে উদ্ধৃত হলো:

তান য়ুন-শানের এই শারদীয় দিগ্বিজয় সাফল্যমণ্ডিত হয়। এক বৎসরের মধ্যেই বিশ্বভারতীর এক অভিনব বিদ্যাভবনের জন্য প্রচুর অর্থ এবং অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত হলো। রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক দৌত্যকার্যে কৃতিত্ব লাভ করে, ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক তান্ ভারতে ফিরে এলেন। সেদিন ভারতে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হলো।

My friends in China,

The truth that we received when your pilgrims came to us in India, and ours to you···that is not lost even now.

What a great pilgrimage was that ! What a great time in history ! It is our duty to-day to revive the heroic spirit of that pilgrimage, following the ancient path which is not merely a geographical one but the great historical path that was built across the difficult barriers of race difference and difference of language and tradition, reaching the spiritual home where man is in bonds of love and co-operation.

Rabindranath Tagore,
Santiniketan, 23rd April, 1934.

রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীপূর্ণ আমন্ত্রণ পত্র :

Santinketan, Bengal
September 22, 1934.

I gladly offer hospitality to the Sino-Indian Cultural Society to use my University at Santiniketan as the centre of activity in India. It is my hope that my Chinese friends will heartily welcome the Society and give generous help to my friend Prof. Tan Yun-Shan to realize this scheme of making a permanent organisation for facilitating closer cultural contact between China and India.

Rabindranath Tagore

অবশেষে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে, বাংলা নববর্ষের দিনে, এযুগে চীন ও ভারতের মৈত্রীর অভিনব নিদর্শন-স্বরূপ বিশ্বভারতীতে 'চীনভবন' প্রতিষ্ঠিত হলো।

চীন ও ভারতের ইতিহাসের এ এক গৌরবময় অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর এ-এক অভূতপূর্ব সাফল্য।

বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যে 'চীনভবন' বিশ্বভারতীর মধ্যমণি। এর গ্রন্থাগারে প্রায় একলক্ষ চীনে তিব্বতী জাপানী সংস্কৃত পালি বাংলা ইংরাজি প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। ভারতের কোনো গ্রন্থাগারে নাই এবং চীন ও জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র যা দুর্লভ এইরূপ অর্ধলক্ষের উপর চীনে গ্রন্থ চীনভবনের গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে। এই সমস্ত চীনে গ্রন্থই চীনদেশের জনগণের অমূল্য উপহার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে চীনভবনকে এক নতুন মর্যাদা দান করলেন। তিনি এর গুরুত্ব ও মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করে একে একেবারে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখলেন।[১৩]

চীনভবনকে বিদ্যাভবনের (বিশ্বভারতীর পূর্বতন গবেষণা বিভাগের) মর্যাদা দিলেন। কিন্তু তাকে বিদ্যাভবনের অন্তর্গত করে তার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের গৌরব ক্ষুণ্ন করলেন না। বিদ্যাভবনেরই মতো এ এক বিদ্যার ও গবেষণার কেন্দ্র হলো। যেখানে বিশেষভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও গবেষণা চলতে লাগল।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ব্যতীতও ভারতীয়গণ চীনেভাষা ও চীনে সংস্কৃতির

---

১৩ I. The Chinese Hall—shall form an integral part of the Visva-Bharati and constitute one of its separate departments, called the Visva-Bharati Cheena Bhavana.

II. Cheena Bhavana shall work directly under the control and guidance of the Founder-President. Adopted by the Samsad (Governing Body), Resolution No. 1137, dated 19. 9. 37

চর্চায় এবং চীনে ছাত্রছাত্রীগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় ভাষা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলেন।

বিশ্বভারতী চীনভবন ক্রমে ক্রমে নালন্দার ন্যায় এশিয়ার বিদ্যাপীঠে পরিণত হলো। ভারত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান এশিয়ার নানা দেশ ও নানা দ্বীপ হতে বিদ্যার্থী ও বিদ্বানগণের সমাগম হলো।

চীনের সুপ্রসিদ্ধ সুধীগণ ভারতে এবং ভারতের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ চীনে যাতায়াত করতে লাগলেন। চীন ও ভারত সরকার এতে সক্রিয় সহযোগিতা করলেন। জগদ্বিখ্যাত ধর্মাচার্য পরমপূজ্য তাই-শু (His Holiness Tai-hsu) সুধীন্দ্রবর ডক্টর তাই চি তাও (Dr. Tai Chi-tao) সুবিখ্যাত শিল্পী জু পিয়ঁ (Ju Pe'on) মহাশয়ের ভারত আগমন ও সুধীশ্রেষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের চীন গমন, উভয় দেশের সংস্কৃতির মিলনে অশেষ সহায়তা করল।

১৯৩৭ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চীনভবনের সুবর্ণযুগ। ভারতের সুবিখ্যাত চীন ও তিব্বতী ভাষাবিদ্ বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ (যাঁরা প্রায় সকলেই বিশ্বভারতীরই ছাত্র ছিলেন) এবং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ চীনদেশী সুধীগণ—এই সময় বিশ্বভারতী চীনভবনে পরস্পরের সহযোগিতায় গবেষণার্থে নিমগ্ন ছিলেন। এঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন পর্যায়ক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। উভয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতী চীনভবনে বহু বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার, সম্পাদনা এবং অনুবাদ হয়েছে। নতুন ঐতিহাসিক নথির উদ্ধার হয়েছে। বহু ভারতীয় ও সিংহলদেশীয় বিদ্যার্থী চীন-ভাষায় দখল লাভ করেছেন—চীনে গিয়ে বিখ্যাত বিদ্যায়তনে বিশ্রুত সুধীগণের অধীনে শিক্ষালাভ করে এসেছেন।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এবং চীনদেশের বহু বিদ্যার্থী সংস্কৃত পালি ও বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্যামদ্বীপবাসী, করুণ কুশলাশয় চীনদেশীয় ডক্টর ফা চাউ

(Dr. W. Pachow) ভিক্ষু পে হুয়ে (Pai hui) শ্রীমতী বু শিয়াও লিং (Wu Hsiao ling)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বিদুষী মহিলা রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন করে কথা ও কাহিনী, শিশু, শিশু ভোলানাথ ও বলাকার কতকগুলি কবিতার এবং মুক্তধারা প্রভৃতি গ্রন্থের চীনভাষায় অনুবাদ করে চীনদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ—'

'এই পরিবর্তনশীল সংসারে চক্রের নেমির ন্যায়, কেউ কখনো উপরে উঠছেন, কখনো বা নীচে নাবছেন।'

রবীন্দ্রনাথের মহতী কীর্তি ভারতের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান চীন-দেশবাসীর সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিশ্বভারতী চীনভবন আজ হতগৌরব, হৃত-আসন ও উপেক্ষিত হয়ে বিশ্বভারতীর একান্তে অবস্থান করছে। সে আজ তার মর্যাদা হারিয়েছে।

চীনভবন বলে বিশ্বভারতীতে এখন কোনো 'ভবন (College)' নেই। অতীতের চীনভবন এখন বিদ্যাভবনের অন্তর্গত নানা বিভাগের একটি সাধারণ বিভাগ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সময় বিশ্বভারতী-চীনভবনের দুরবস্থার কথা বার বার মনে হচ্ছে।

আশার কথা, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য যিনি শান্তিনিকেতনের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আদর্শ প্রাক্তন ছাত্র—যিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁর সজাগ দৃষ্টি বিশ্বভারতী-চীনভবনের এই দুরবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশ্বভারতীর পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্য এবং উপাচার্য উভয়েই এখন চীনভবনকে তার পূর্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁরা উভয়েই এর জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন।

তাঁদের এই মহতী প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

গীতবিতান জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬৮।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

মানবজাতির আদিম সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজও বর্তমান রয়েছে। আদিম কিন্তু অপূর্ব অনুপম। কোনো কোনো অংশ এমনই অভিনব যে মনে হয়—আজকের রচনা। আদিম কবির ভাষায় একে বলতে পারি :

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।

"এ অতি প্রাচীন অথচ আজও মনে হয় নিত্য নবীন।"

এই প্রাচীনতম সাহিত্য হলো ভারতীয় ঋগ্বেদ। ঐ ঋগ্বেদে আছে :

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো মধ্যমাসো
মহসা বি বাবৃধুঃ।
সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নিমাতরো দিবো মর্যা
আ নো অচ্ছা জিগাতন ॥

ঋগ্বেদ, ৫।৫৯।৬

"জন্ম হইতে পবিত্র তারা
নহে ছোট বড় কেহ।
সন্তান তারা দেবী ধরণীর
দিব্য তাদের দেহ।
ভেদ করি বাধা তোলে তারা শির
ঠেলিয়া বিঘ্ন শত।
আসুক সহজে মোর কাছে সবে
মানুষ যেখানে যত।"

ভারতীয় সংস্কৃতির এ-ই মর্মবাণী। মানুষ সকলেই সমান। তারা পরস্পর ভাই :

...এতে সংভ্রাতর ॥ ঐ ৫।৬০।৫

প্রাণীমাত্রকে ভালোবাসা, মিত্রের চক্ষে দেখাই ভারতীয় সাধনা। অতি প্রাচীনকাল হতে ভারতে এই সাধনা শুরু হয়েছে :

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে ॥

(শুক্ল) যজুর্বেদ, ৩৬।১৮

"সমস্ত প্রাণী আমাকে মিত্রের চক্ষে দেখুক।

সমস্ত প্রাণীকে আমি মিত্রের চক্ষে দেখি ॥"

অন্যো অন্যমভিহর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা।

অথর্ববেদ, ৩।৩০।১

"সদ্যোজাত বৎসকে গাভী যেরূপ ভালোবাসে, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেইরূপ ভালোবাস।"

বৈদিক যুগের পর, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সবিশেষ পরিচয় পাই —মহাভারতে। মহাভারতে, ভারতের মহান্ আত্মা অভিব্যক্ত হয়েছে —তাই সত্যই এ মহাভারত। এই মহাভারতের এক জায়গায় দেখি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলছেন :

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি।

ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥

শান্তিপর্ব, ৩০০।২০

"আমি তোমাদের সেই পরম রহস্যময় ব্রহ্মের কথা বলছি :

'মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই'।"

কী অদ্ভুত কথা!

"আমি তোমাদের সেই পরম রহস্যময় ব্রহ্মের কথা বলছি" : এর পরেই শ্রোতৃমাত্রেরই পরম কৌতূহল—কী সেই পরম রহস্যময় ব্রহ্ম! কে তিনি? কেমন তিনি? কোথায় তিনি?

এ সব জিজ্ঞাসার এ কী উত্তর— !

ঋষি কি নাস্তিক ? বৃদ্ধ ঋষির কি মতিভ্রম হয়েছিল ? মতিভ্রম নয়। মহামতিমাত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। উপনিষদ বলেছেন ঃ

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

মৈত্রেয়োপনিষদ, ২।১

"দেহই দেবালয়, জীবই শিব।"

চণ্ডীদাস বলেছেন ঃ

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন
সেবিছে ঈশ্বর।"

রবীন্দ্রনাথের মর্মবাণী ঃ

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;

তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধূলার 'পরে।"
গীতাঞ্জলি

এই ভারতের শাশ্বতবাণী! রবীন্দ্ররচনা যার পড়া নাই, রবীন্দ্রকাব্য যার দৃষ্টিগোচর হয় নাই—সেই অক্ষরপরিচয়হীন সাধারণজনের উক্তি :

"কোথায় তোমার শঙ্খঘণ্টা? কোথায় সিংহাসন?
পাতকীজনার মাঝে পেতেছ আসন।
কোথায় তোমার ছত্রদণ্ড ধূলাতে লুটায়
পাতকীচরণরেণু শোভে তোমার গায়!"
বাউলসঙ্গীত

সুসংস্কৃত অভিজাত কবি যে কথা বলতে সংকুচিত, অসংস্কৃত পাগল কবি তাই নিঃসংকোচে বলে বসল : "পাতকীচরণরেণু শোভে তোমার গায়!"

দেবতা মন্দিরে নাই, প্রতিমায় নাই, স্বর্গে নাই, বৈকুণ্ঠে নাই; মানুষের মধ্যে, সর্বপ্রাণীর মধ্যে, তিনি নানারূপে বিরাজমান :

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ ॥

উতৈষাং পিতা উত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ
উত বা কনিষ্ঠঃ।

একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ স উ জাতঃ
স উ গর্ভে অন্তঃ ॥

অথর্ববেদ, ১০।৮।২৭-২৮

"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ। তুমি কুমার, তুমি কুমারী। তুমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ—দণ্ডধারণ করে, ঘুরে বেড়াচ্ছ। সমস্ত বিশ্বে, দিকে দিকে, তুমিই জন্মগ্রহণ করেছ।"

"পিতারূপে, পুত্ররূপে, জ্যেষ্ঠরূপে, কনিষ্ঠরূপে, সেই একই দেবতা বিশ্বে বিরাজমান। অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে সেই একই দেবতা অবস্থান করছেন। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম নিয়েছেন, তিনি সেই

দেবতাই ! আজ এখনও জন্ম নেন নি, গর্ভে রয়েছেন যিনি—তিনিও সেই দেবতা।”

সেই দেবতার সেবা করো। সেই দেবতাকে তুষ্ট করো। তাঁকে অগ্রাহ্য করে মন্দিরে প্রতিমার পূজা করে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিও না। এ যুগের ধর্মশাস্ত্র ভাগবতে ভগবান বলছেন ঃ

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতের্চাবিড়ম্বনম্ ॥
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।২১-২৭। মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ৮

“সর্বজীবে জীবাত্মরূপে আমি সর্বদা অবস্থান করছি। সেই জীবরূপী আমাকে অবজ্ঞা করে' মানুষ কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমার পূজারূপে আমাকে বিদ্রূপ করছে। সর্বজীবে অবস্থিত ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করে' মূঢ়তাবশতঃ যে কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমার পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। অতএব, সর্বজীবে আশ্রিত জীবাত্মারূপী আমাকে, দান ও মানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা এবং সমদৃষ্টির দ্বারা আরাধনা করো !”

বৌদ্ধগণও সেই এক কথাই বলেছেন ঃ

দৃশ্যন্ত এতে ননু সত্ত্বরূপাস্ত এব নাথাঃ কিমনাদরোত্র।

শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ১৫৬, মৈত্রীসাধনা পৃঃ ১২

“প্রভু বুদ্ধগণ জীবরূপে বিরাজমান—তাঁদের অনাদর করি কিরূপে ?”

সর্বমেতৎ সুচরিতং দানং সুগতপূজনম্।
কৃতং কল্পসহস্রৈর্যৎ প্রতিঘঃ প্রতিহন্তি তৎ ॥

বোধিচর্যাবতার, ৬।১

মৈত্রীসাধনা পৃঃ ১১

"জীবের প্রতি বিদ্বেষ, সহস্রকল্পসঞ্চিত সমস্ত পুণ্যকর্ম, দান, বুদ্ধের পূজা বিনষ্ট করে।"

আদীপ্তকায়স্য যথা সমন্তাৎ ন সর্বকামৈরপি
সৌমনস্যম্।
সত্ত্বব্যথায়ামপি তদ্ বদেব ন প্রীত্যুপায়োঽস্তি
মহাকৃপাণাম্ ॥

শিক্ষাসমুচ্চয়, ৭ম পরিচ্ছেদ পৃঃ ১৫৬;
মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ১২

"যে চতুর্দিক হতে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে, দগ্ধ হতে থাকে, সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দান করেও যেমন তাকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না, প্রাণীগণকে ব্যথা দিতে থাকলে, মহাকারুণিক বুদ্ধগণকেও সেইরূপ কোনোরূপে তুষ্ট করা যায় না।"

অতএব সকল প্রাণীকে ভালোবাসো। সকল প্রাণীর সেবা করো!

সে কি সামান্য ভালোবাসা? সামান্য সেবা?

মাতা যেমন তার একমাত্র সন্তানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, প্রাণ দিয়ে সেবা করে, সেইভাবের ভালোবাসা—সেই ভাবের সেবা!

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তম্ অনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ॥

সুত্তনিপাত, ১।৮।৭; মৈত্রীসাধনা পৃঃ ১৬

"মাতা যে মনোভাবের সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেন, সর্বজীবের প্রতি সেই অপরিমেয় মনোভাব সৃষ্টি করো!"

বেদ, মহাভারত, ভাগবত, বৌদ্ধশাস্ত্র সমস্ত আর্যশাস্ত্রই একসুরে সেই একই কথা বলেছেন:

"সর্বজীবের তিনি (সাধক) পিতা এবং
মাতার ন্যায়।"

মহাভারত, অনুশাসন, ১১৬।৪১

"মৃগ, মূষিক, মক্ষিকা, সর্প, কীটপতঙ্গাদি—সমস্ত প্রাণীকে নিজের পুত্রের

ন্যায় দেখবে। নিজ পুত্র এবং এইসব প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কোথায়?"

ভাগবত, ৭।১৪।৯

"গাভী তার সদ্যোজাত বৎসকে যেরূপ ভালোবাসে, তোমরা পরস্পরকে সেইরূপ ভালোবাসো।"

অথর্ববেদ, ৩।৩০।১ ; মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ৩

ভারতের কিশোর বালক প্রহ্লাদ বলেছেন :

"যাঁরা আমাকে হত্যা করতে এসেছিলেন, যাঁরা আমাকে বিষ খাইয়েছিলেন, যাঁরা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করেছিলেন, যাঁরা আমাকে হস্তীর দ্বারা পীড়ন এবং সর্পের দ্বারা দংশন করিয়েছিলেন, তাঁদের সকলকেই আমি সমানভাবে মিত্র মনে করি। কারো অনিষ্ট কামনা করি নাই।"

বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৮।৩৯-৪০, মৈত্রীসাধনা, পৃঃ ১১

এ কি কেবল মুখের কথা? এইভাবে কি কেউ ভালোবেসেছিল? মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগতে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের ইতিহাস নাই। কেবল কতকগুলি উপাখ্যান আছে। সে-সব উপাখ্যানকে এ যুগে কেউ ইতিহাস বলে গ্রহণ করেন না। তাই চীনদেশের ইতিহাস হতে এক ভারতীয় সাধকের জীবন-কথা এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"বৌদ্ধ ভিক্ষু আর্যদেব বিরোধীপক্ষের বহু পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করে 'শূন্যবাদ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরাজিত পণ্ডিতের এক শিষ্য তাঁকে হত্যা করবে—প্রতিজ্ঞা করে।

নির্জন তপোবনে আর্যদেব যখন একাকী ধ্যানমগ্ন তখন সেই ব্যক্তি সেই সুযোগে তাঁকে হত্যা করে। মুমূর্ষু আর্যদেব সেই হত্যাকারীকে বলেন—'তুমি সত্বর আমার ঐ গেরুয়া বসন ও ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে ভিক্ষুর বেশে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করো।' হত্যাকারী যখন সেইভাবে পলায়ন করলো—তখন আর্যদেব পরম শান্তিতে দেহত্যাগ করলেন।"

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার, পৃঃ ৭৮-৭৯

'সমস্ত প্রাণী আমার সন্তান'—ভারতীয় সংস্কৃতির এই মর্মবাণী ভারতের আকাশ-বাতাস ভরে ছিল। মস্ত-ভারতের দিকে দিকে পাহাড়ে পর্বতে অঙ্কিত ছিল। অল্পদিন হলো তা আবিষ্কৃত হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে, ভারতে ঐতিহাসিক 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই 'রামরাজ্যের' সম্রাট ছিলেন—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক।" এমন মহান্ সম্রাট পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত আর জন্মগ্রহণ করেননি। এমন মহান্ মানবও পৃথিবীতে অতি অল্প জন্মেছেন। ভারত সংস্কৃতির পরম প্রতিভূ সম্রাট অশোক বলেছেন :

"সমস্ত মানব আমার সন্তান। আমি যেমন কামনা করি, আমার নিজের সন্তানগণ ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বপ্রকার হিতসুখ লাভ করুক, সমস্ত মানবের জন্যও আমি ঠিক সেইরূপ কামনা করি।"

পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন, ১-২

তিনি যে কথা ঘোষণা করেছিলেন, আমরণ তাই কাজে করে গেছেন। তাঁর এই ঘোষণা কার্যকর করার জন্যে, তিনি তাঁর সমস্ত কর্মচারীদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে বলেছিলেন :

"আমি আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছি, আদেশ দিচ্ছি, সেই আদেশের মধ্যে আমার দৃঢ়সংকল্প, অটল প্রতিজ্ঞা জানিয়ে দিচ্ছি। সেইভাবে আপনারা কাজ করবেন, সেইভাবে তাঁদের অনুপ্রাণিত করবেন, যাতে তাঁদের বিশ্বাস হয়, রাজা আমাদের পিতা। নিজের প্রতি তাঁর যেমন স্নেহ, আমাদের প্রতিও তাঁর তেমনি স্নেহ। আমরা রাজার সন্তান।"

পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন, ২

"সমস্ত মানুষ আমার সন্তান"—একথা তো তাঁর কাছে কথার কথা ছিল না। কিন্তু মহামানবের বিপদ এই যে, তাঁর কথা তাঁর অনুগামীগণ ঠিক বুঝতে পারেন না। কেমন করে বুঝবেন—তাঁরা তো সেই স্তরের মানুষ নন! তাই অশোক তাঁর উচ্চপদস্থ অধিকারীবর্গকে বলছেন :

'সমস্ত মানুষ আমার সন্তান'—আপনারা বুঝতে পারেন না এ বিষয়ে আমার মনোভাব কী এবং তা কত ব্যাপক। হয়তো বা আপনাদের মধ্যে দু' একজন একথা বুঝছেন, কিন্তু তাও সঙ্কীর্ণভাবে, অংশত বুঝছেন, ব্যাপকভাবে, পূর্ণভাবে নয়।"

পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন, ১

অশোকের প্রেম, প্রীতি কেবল মনুষ্যজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূক, অসহায় পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁর প্রেম ছিল সুগভীর।

প্রচীনকাল হতে ভারতীয় রাজাদের পাকশালায় প্রতিদিন শত শত পশুপক্ষীর মাংস পাক করা হতো। সেই মাংস অন্নসহ প্রত্যহ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো[১]। ঐ প্রথানুযায়ী অশোকের রাজকীয় মহানসেও প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী বধ হতো। অশোক এ প্রথা উঠিয়ে দিলেন। তাঁর পাকশালায় প্রতিদিন মাত্র দু'টি ময়ূর ও একটি হরিণ হত্যা করা হতো। অবশেষে তাও একেবারে বন্ধ করা হয়।

২৬০-৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের রাজ্যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পশুর জন্যে চিকিৎসালয় নির্মিত হয়।

যেখানে ভেষজের উপাদান ঔষধিবৃক্ষ পাওয়া যেতো না, সেখানে অন্যস্থান হতে তার আমদানী করা হতো। তারপর সেখানে তার চাষ করা হতো।

কেবলমাত্র নিজ সাম্রাজ্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করেন নাই। প্রতি-বেশী রাজ্যে দূরদূরান্তেও তিনি মনুষ্য ও পশুর জন্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর শিলালিপি হতে জানা যায়, সিংহল, পশ্চিম এশিয়া বা সিরিয়া, ইজিপ্ট, ম্যাসিডোনিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের রাজাদের রাজ্যে, প্রিয়দর্শী অশোক দুই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। মনুষ্য চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা।

'সমস্ত মানুষ (বা প্রাণী) আমার সন্তান'—একথা এইভাবে তিনি প্রমাণ করে গেছেন। সে-যুগে পৃথিবীতে এ যে কত বড় কঠিন কাজ ছিল, তা আজ কল্পনা করাও কঠিন।

মহাপরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ সম্রাট হয়েও দিগ্বিজয় বা পররাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নিজরাজ্য এবং পররাজ্যের সমস্ত প্রজার হিতসুখের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর দ্বিতীয় কোনো সম্রাটের কথা পাওয়া যায় না।

তিনি যে কেমন পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ সম্রাট ছিলেন, কলিঙ্গ যুদ্ধে

---

১ প্রজাদের মধ্যে এইরূপ মাংসসহ অন্ন বিতরণের প্রথা, কিছুকাল আগে পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যগুলিতে বর্তমান ছিল।

তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ।[২]

ভারত ও পাকিস্তান—এই উভয় রাজ্যের সম্মিলিত ভূখণ্ডের চেয়েও বড় ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। সেই যুগে সেই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যেও তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় নাই।

প্রতিবেশী মহাপরাক্রান্ত, গ্রীকরাজগণও কখনো কোনোদিন তাঁর সীমান্ত আক্রমণ করেন নাই।

তিনি ছিলেন 'কুসুমের মতো কোমল অথচ বজ্রের মতো কঠিন' প্রতিবেশী রাজগণ তা ভালো করেই জানতেন।

অশোক যুদ্ধবর্জন করে থাকলেও, অশোকের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে চোড়, পাণ্ড্য প্রভৃতি সীমান্তের অধিপতিগণ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অশোক তাঁদের অভয় দান করেছিলেন—বীরের অভয় দান। সেই অভয় বাণী যেমন মধুর আশ্বাসজনক—তেমনি দৃঢ়, বীর্যবন্ত।

"আমার অবিজিত সীমান্তবাসীদের মনে হতে পারে—'আমাদের প্রতি রাজার না জানি কী মনোভাব।' তাঁদের জানিয়ে দিতে হবে যে—রাজার ইচ্ছা তাঁরা যেন আমা হ'তে উদ্বেগ বোধ না করেন। তাঁরা যেন আমার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। আমার কাছ হতে তাঁরা সুখই পাবেন—দুঃখ নয়।

তাঁরা যেন একথা অবগত হন, যাঁরা ক্ষমার যোগ্য, তাঁদের রাজা ক্ষমা করবেন। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন ধর্মাচরণ করেন—তাতে তাঁরা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখলাভ করবেন।"

পৃথক কলিঙ্গ শৈলানুশাসন, ২

যাঁরা ক্ষমার অযোগ্য—এবং অধর্মাচারী, তাঁদের জন্যে—'মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' 'মহাভয় বজ্রের মতো উদ্যত আছে'—রাজার বীর্যবন্ত মধুর অভয়বাণীর অন্তর্নিহিত এইরূপ ইঙ্গিত সীমান্ত রাজাদের সীমান্ত লঙ্ঘনের দুঃসাহস হতে সংযত রেখেছিল।

অকৃত্রিম প্রেমে উদারতা থাকে। যেখানে উদারতার অভাব, সেখানে সত্যিকারের প্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। প্রেম, মৈত্রী ও

২. ২৭০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অশোকের অভিষেক হয়, ২৬২ খ্রীঃ পূঃ তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। ২৩২ খ্রী পূঃ পর্যন্ত (৩৮ বছর) তিনি রাজত্ব করেন।

উদারতার সম্মিলনই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতাতেই এই উদারতার অভিব্যক্তি। অশোকের মধ্যে আমরা দেখি এর পূর্ণ বিকাশ।

অশোকের সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্মসম্প্রদায় ছিল। তাদের মধ্যে বৈদিক, বৌদ্ধ, নির্‌গ্রন্থ (জৈন) ও আজীবিকই প্রধান। এই ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অশোকের মাহাত্ম্যে এবং মধ্যস্থে এদের মিলন সম্ভব হয়েছিল।

সকল ধর্মের স্ব স্ব বিশেষত্ব আছে। কোনো ধর্ম, অন্য ধর্মের প্রভাবে নিজের বিশেষত্ব না হারাক, উপরন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই অভ্যুদয় হোক—এই ছিল অশোকের অন্তরের আগ্রহ।

তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে রাজশক্তির সাহায্যে রাজ্যের অধিবাসীদের সবাকার ধর্ম করবার প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। বরং রাজ্যের সর্বত্র সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের জনগণ অধিষ্ঠিত থাকুক—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। (শিলানুশাসন ৭)

সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর প্রেম, সেবা এবং দান ছিল সমান। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল এমনই সাম্যপূর্ণ যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ আজও সন্দেহ করেন—অশোক বৌদ্ধ ছিলেন কিনা। কিন্তু বস্তুত তিনি বৌদ্ধ ছিলেন।

আদর্শবাদী হলেও অশোকের বাস্তবজ্ঞান কত প্রখর ছিল, তা তাঁর প্রচলিত ধর্মলিপিসমূহ হতে জানা যায়। যা সর্বধর্মের সারকথা, যা নিয়ে ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো মতভেদ নাই, যা আচরণ করলে সকলেই সচ্চরিত্র, সুনাগরিক হতে পারে এবং যা আচরণ করা সাধারণ লোকের পক্ষেও খুব কঠিন নয়, এমন সব ধর্মকথা বা নীতিকথাই তিনি তাঁর প্রজাবর্গকে উপদেশ দিয়েছেন :

"ধর্ম কি? অসদাচার কম এবং সদাচার অধিক। দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্য ও শুচিতা।" স্তম্ভানুশাসন, ২

"অসদাচার বা পাপ কি? চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, মান (গর্ব), ঈর্ষা।" স্তম্ভানুশাসন, ৩

"সদাচার বা পুণ্য কি ? প্রাণীহত্যাবিরতি, জীবহিংসানিবৃত্তি, জ্ঞাতিবর্গের প্রতি, ব্রাহ্মণশ্রমণের প্রতি, যথোচিত ব্যবহার। পিতা, মাতা, বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।" শিলানুশাসন, ৪

"বন্ধু, পরিচিতগণ, আত্মীয়-স্বজনকে ও ব্রাহ্মণশ্রমণকে দান সাধুকার্য। প্রাণীহত্যা বিরতি সাধুকার্য। অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয় সাধুকার্য।" শিলানুশাসন, ৩

সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে দু' চারজন বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ হবেন এবং বাকি জনগণ যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই অবস্থান করবেন, যাতে এইরূপ অবস্থার অবসান হয়, সৎ নাগরিকের সংখ্যা, সজ্জনের সংখ্যা যাতে শতকরা হারের সর্বোচ্চ কোটির দিকে ওঠে, লোকচরিত্রে পরম অভিজ্ঞ অশোক সেই চেষ্টাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

"অসদাচার কম ও সদাচার অধিক," "অল্পব্যয় ও অল্পসঞ্চয় সাধু-কার্য"—এইরূপ উপদেশের মধ্যে অশোকের প্রখর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্যসংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারের জন্যে ব্রাহ্মণশ্রমণকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে। তাঁদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সেই শক্তিশালী ব্রাহ্মণশ্রমণের দ্বারা ধর্মের দিগ্বিজয় সম্ভব হবে—এই ছিল সম্রাট অশোকের স্বপ্ন—তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

সে-যুগের প্রবল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদিক ও বৌদ্ধসম্প্রদায়কে সম্মিলিত করে, তিনি দেশের, জাতির, মানব সম্প্রদায়ের, কেবল মানব সম্প্রদায়ের নয়, সমস্ত প্রাণীজগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন—এই তাঁর মহত্ত্বের, কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ বলতে মূর্খ ও গুণহীন জাতিব্রাহ্মণমাত্রই পূজ্য ছিল না এবং শ্রমণ বলতে বৌদ্ধ, জৈন, বৈদিক ও আজীবিক সন্ন্যাসী-মাত্রই শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন না। অশোকলিপি হতে জানা যায়, অযোগ্য শ্রমণকে অশোক বিহার হতে বিতাড়িত করতেন। তাঁদের কাষায় বস্ত্র কেড়ে নিয়ে গৃহস্থের বেশ (শ্বেতবস্ত্র) দিতেন।

(সংঘভেদ অনুশাসন দ্রষ্টব্য)

গুণগ্রাহী সম্রাট অশোকের ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে বেশ

অনুমান করতে পারি, তখনকার ব্রাহ্মণসমাজে সদ্‌ব্রাহ্মণের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। বিরাট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অপূর্ব নৈতিক উন্নতির দৃষ্টান্তে, ব্রাহ্মণ সমাজেও চারিত্রিক উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

ব্রাহ্মণের মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বৌদ্ধের সাম্য ও মৈত্রী, উভয়ের অপূর্ব সম্মিলনে এবং নিরগ্রন্থ (জৈন), আজীবিক, শৈব, পাষণ্ড প্রভৃতি সর্ব সম্প্রদায়ের স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রতিভার সহযোগিতায় ধর্মরাজ অশোক ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বজ্রের মতো কঠোর এবং কুসুমের মতো কোমল—সম্রাট অশোক, ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ।

এ যুগে সম্রাট অশোকের গুণাবলী বহুল পরিমাণে যে মহামানবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি—যিনি এ যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তিনি হলেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমৈত্রী এবং পরম ঔদার্য এই মহাকবির কাব্যে এবং শুধু কাব্যে নয়, জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি
নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগাথা এইভাবে তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত
মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে
হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।

বৈদিক যুগ হতে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত এ-ই ছিল ভারতের সাধনা। এই

সাধনার ধারা বহু শতাব্দী অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছিল। তারপর স্রোতস্বিনী যেমন পর্বতশিখর হতে দুর্বার গতিতে বয়ে চলে, দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ উৎপ্লাবিত করে—শস্যশ্যামলা করে সহসা একদিন গতিহারা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়; তার বিষাক্ত জল গ্রামকে গ্রাম মড়কে ধ্বংস করে ফেলে, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারারও একদিন সেই অবস্থা হয়েছিল। তারপর নবীন বর্ষার প্রবল বর্ষণে—তার গতি সে পুনরায় ফিরে পেয়েছে। পুনরায় সে বয়ে চলেছে—দেশের পর দেশ, উর্বরা শস্যশ্যামলা করে তুলছে।

মানব সভ্যতার আদিযুগে বৈদিক ঋষি-আচার্যগণ যেমন উদাত্তকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—

> যথাপঃ প্ররতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
> এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতর্ আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

"জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস যেমন স্বভাবতই সম্বৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দেশ হতে, সকল দিক হতে, ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন।"

ভারতের নবীন আচার্যও পৃথিবীর দেশে দেশে গমন করে, সমস্ত বিশ্ববাসীকে সেই আহ্বান জানালেন—

> "এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
> এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো
> খৃস্টান।
> এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত
> সবাকার।"
>
> গীতাঞ্জলি (১৯১০)।

তাঁর আহ্বান কেবল কাব্যের মধ্যেই ধ্বনিত হলো না, কাব্য ও জীবন একাকার হয়ে গেল।

ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ হতে আর্য এলেন, অনার্য এলেন, হিন্দু এলেন, মুসলমান এলেন। ইংরাজ এবং খ্রীষ্টান—এন্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন (১৯১৪) এলেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সাদরে

স্থান লাভ করলেন। ক্ষুদ্র আশ্রম ক্রমে ক্রমে বিশ্বভারতীতে পরিণত হলো। বিশ্ব এক পরিবারে স্থান লাভ করল।

ফ্রান্স থেকে এলেন সিলভাঁ লেভি, বেনোয়া, জার্মানী থেকে উইনটারনিজ্, ইতালী থেকে ফরমিকি, তুচ্চি, নরওয়ে থেকে স্টেন কোনো, চেকোশ্লোভাকিয়া হতে লেসনি, অস্ট্রিয়া হতে ক্র্যাম্রিশ, হলাণ্ড থেকে বাকে, আমেরিকা থেকে প্র্যাট, রাশিয়া থেকে বোগদানব, ইংল্যাণ্ড থেকে কলিনস্, জেমস্ কজিন্স্, এলম্‌হারস্ট, হাঙ্গারী থেকে গেরমানুস, চীন থেকে লিন ও চিয়াং, তান য়ুন-শান, পারস্য থেকে দায়ুদ, তিব্বত থেকে সোনম নগ ডুব এবং সিংহল থেকে রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির।

এঁরা সকলে রবীন্দ্রনাথের এই মৈত্রীসাধনায় যোগ দিলেন। শুচিমনাঃ ব্রাহ্মণ বিধুশেখর শাস্ত্রী ব্যগ্রভাবে এদের 'সবাকার হাত ধরলেন।' শান্তিনিকেতনে সে এক অপূর্ব মিলনমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হলো।

সর্বপ্রকার মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বধর্মের প্রতি সমান সম্মান, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

ধরিত্রীর ন্যায় অসীম ধৈর্যে, পরম স্নেহে, তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের তাঁর আশ্রমে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁদের রক্ষা করেছেন। আশ্রম-বাসীদের কেউ ছিলেন হিংসাত্মক বিপ্লবী, কেউ অহিংসাপন্থী, কেউ মুসলমান, কেউ ইহুদী, কেউ পার্সী, কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীস্টান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ সাম্যবাদী, কেউ বা নাস্তিক।

জাতিভেদে অবিশ্বাসী সংস্কারপন্থী রবীন্দ্রনাথ এবং জাতিভেদে বিশ্বাসী সনাতনপন্থী বিধুশেখর শাস্ত্রী একই আশ্রমে পরম অন্তরঙ্গভাবে বাস করেছেন। রবীন্দ্র-মতাবলম্বীর চেয়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা কম ছিল না। প্রথমদিকে বরং তাঁর মতের লোকই বেশি ছিল। কিন্তু তার জন্যে কোনদিন শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হয়নি।

এইরূপ মতবিরোধ সত্ত্বেও শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্ত। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। উভয়ের ঐক্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধায়।

নিরক্ষর গ্রামবাসী এবং পরম পণ্ডিত, অভিজাত নাগরিক সকলেই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যলাভ করতেন। তথাকথিত অন্ত্যজ, অবনত, অবজ্ঞাতদের জন্যে হৃদয়ে তাঁর বেদনার অন্ত ছিল না।

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
...শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান।"

গীতাঞ্জলি।

এই বেদনার অভিব্যক্তি কেবল কাব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পূর্বেই বলেছি—কাব্য ও জীবন তাঁর একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্রীনিকেতনে এইসব দুর্ভাগা নর-নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্যে তিনি কার্যকর ব্যবস্থা করে গেছেন।

পতিতকে তুলে নেওয়া, অবনতকে উন্নত করা, ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা। ঋগ্বেদ্ বলছেন ঃ

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থাঃ পুনঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০।১৩৭।১, মৈত্রীসাধনা পৃঃ ৪

"হে ব্রাহ্মণ, পতিত যে তাকে তুলে নাও, অবনত যে তাকে উন্নত করো। পাপে যে মৃতপ্রায় তাকে পুনরায় প্রাণ দান করো।"

বৈদিক যুগের ঋষিগণ, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, রাম, কৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি মহামানবগণ এই কার্যেই আত্মোৎসর্গ করেছেন।

শিশু, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সর্ববয়সের, সর্বশ্রেণীর নর-নারীর সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ, সবার মনের মতন হয়ে মিশতে পারতেন। ১৯০১ সাল হতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালক-বালিকাগণ যেরূপ ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাঁর সাহচর্য লাভ করে, তার তুলনা নাই। পিতা বা পিতামহের সঙ্গে, গৃহে যেভাবে শিশু, কিশোর এবং তরুণেরা মেলামেশা করে, ঠিক সেইভাবে, আশ্রমের ছাত্রছাত্রীগণ তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সকাল ছ'টা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তাঁর অব্যবহিত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন যাঁরা, আমি তাঁদের অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের দুই রূপ। একটি কবিরূপ, একটি কর্মীরূপ। উভয়ের মধ্যেই প্রাচীন ভারত নবীনরূপে বিকশিত হয়েছে। তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম, বৈদিক আশ্রমজীবনকে উজ্জীবিত করেছে। তাঁর 'শান্তি-নিকেতন' গ্রন্থ বেদ, বেদান্তকে, আমাদের কাছে সরল, সরস করেছে। তাঁর কাব্যে যেমন বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছে, তাঁর শান্তিনিকেতনে তেমনি বিশ্বমানব তার ঘর খুঁজে পেয়েছে। ভারতী, বিশ্বভারতী হয়েছে।

নিত্য আলোচিত, ধ্বনিত, নন্দিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাট্য, সঙ্গীত, শান্তিনিকেতনে এমন এক পটভূমি, এমন এক বাতাবরণ, এমন এক পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করেছে যে রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরও তাঁর অশরীরী প্রভাব, বিশ্বভারতীর সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সেবক-সেবিকাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে।

পূর্বেই বলেছি, পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সন্তান রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তাই বিশ্বভারতীর প্রত্যেক কর্মী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। পৃথিবীর অন্যত্র তা দুর্লভ।

আমার প্রবন্ধে, রবীন্দ্রকাব্য অপেক্ষা রবীন্দ্রচরিত্রই বেশি আলোচিত হলো; কারণ, আমরা যারা শিশুকাল হতে রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত সঙ্গ পেয়েছি—তারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, রবীন্দ্রকাব্যের চেয়ে রবীন্দ্রের ব্যক্তিত্ব নিয়েই বেশি আলোচনা করে বসি। "তোমার

কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—রবীন্দ্র কাব্যের এই পংক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায়।

সুরূপ এবং সুকণ্ঠের একত্র সমাবেশ সুদুর্লভ। শারীরিক সৌন্দর্য, সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব, উজ্জ্বল বর্ণ, জ্যোতির্ময় মনোহর মুখমণ্ডল এবং বিচিত্র গুণোৎকর্ষের একত্র অভিনব সমাবেশ—এক ব্যক্তিতে যুগ-যুগান্তরেও দেখা যায় না।

একদা যাঁর চরণস্পর্শে ধরণী ধন্য হয়েছিল, সামান্য ধূলিকণার মধ্যেও যিনি আনন্দময়ের আনন্দরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই মহামানবের জীবনসায়াহ্নের অমৃতবাণী দিয়ে আমি আমার সামান্য রচনা সমাপ্ত করি:

—মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।
...শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

—আরোগ্য (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১)।

সঞ্চয়—শ্রাবণ-আশ্বিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭১

র বী ন্দ্র সা হি ত্যে বুদ্ধ ও বৌ দ্ধ ধ র্ম

বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—বাল্যকালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। যেদিন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতায় প্রথম পড়লাম—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
ওগো পুরবাসী, কে রয়েছ জাগি'
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
নিনাদে।
সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন
আলস্যে অরুণ সহাস্য লোচন
শ্রাবস্তীপুরীর গগন-লগন
প্রাসাদে।

সেদিন মনের মধ্যে যে কী এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয় তা বলবার নয়।

বুদ্ধ—অনাথপিণ্ডদ এবং শ্রাবস্তী, বৌদ্ধধর্মের সূত্রে সূত্রে এই নাম-গুলি গাঁথা আছে। কোনো একটি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের পাতা উল্টান, দেখবেন—এবং ময়া শ্রুতং তস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম, জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্য আবাসে—অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের উপবনে অবস্থান করছিলেন। সেই বুদ্ধ—শ্রাবস্তী এবং অনাথপিণ্ডদের কথা পেলাম কৈশোরের প্রারম্ভে—রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'তে :

কৈলাসশিখর হতে দূরাগত
ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মতো
সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত
ভবনে।

আমাদের শিশুমনের সুখতন্দ্রারত ভবনেও রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি দূরাগত মহাসঙ্গীতের মতো প্রবেশ করেছিল। শিশুমনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করে এ-এক অপরূপ সুরজাল রচনা করেছিল :

রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন
অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন
বালিকা।

এই সুললিত ভাষা, বিচিত্র ছন্দ এবং রহস্যময় ভাবের আস্বাদ পেয়ে আমাদেরও কি চোখের কোণে অশ্রু জমেনি !

ফেলি দিল পথে বণিকধনিকা
মুঠি মুঠি তুলি রতনকণিকা
কেহ কণ্ঠহার, মাথার মণিকা
কেহ গো।

ধনী স্বর্ণ আনে থালি পূরে পূরে
সাধু নাহি চাহে, পড়ে থাকে দূরে
ভিক্ষু কহে, "ভিক্ষা আমার প্রভুরে
দেহো গো !"

শিশুমনের সে কি বিস্ময় ! সে কি অপূর্ব কৌতূহল ! এ কেমন ভিক্ষুক ! কেমন বা তার প্রভু। স্বর্ণ মণি-মাণিক্য—যা সর্বজনকাম্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তা অগ্রাহ্য করে চলে যায় !

তারপর যখন রাজা, শেঠ, বণিক সকলেই মাথা হেঁট করে ফিরে গেল, যখন সেই স্বর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ বিশাল শ্রাবস্তী নগরীর পথ অতিক্রম করে অনাথপিণ্ডদ পুরপ্রান্তে কাননে প্রবেশ করলেন তখন—

দীন নারী এক ভূতলশয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ-
কমলে।

অরণ্য-আড়ালে রহি কোনমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভিক্ষু ঊর্ধ্ব ভুজে করে জয়নাদ
কহে "ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে।"

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর
আলোকে।

আশ্চর্য! অদ্ভুত! যেমন মহাভিক্ষুক তেমনই তাঁর শিষ্য! ঐ ছিন্নবস্ত্রখানায় কার কি লাভ হলো। তার চেয়ে ঐ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য সংগ্রহ করলেই তো লোকের যথার্থ উপকার হতো!

শিশুর কাছে এই কবিতার ভাব কি স্পষ্ট হয়েছিল? সে কি এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেছিল? সম্ভব নয়! কিন্তু তাই বলে সে কি এতে কম আনন্দ পেয়েছিল? এই কিছু বোঝা, কিছু না-বোঝার রহস্যই তাকে গভীর আনন্দ দিয়েছিল। বসন্তে সূর্যপ্রদীপিত রৌদ্রঝলকিত পৃথিবীর সুস্পষ্ট রূপের চেয়ে শ্রাবণে ঘনঘোর ঘটাচ্ছন্ন অস্পষ্ট রূপ কি কম আনন্দ দেয়?

সেই ধনধান্যে ভরা শ্রেষ্ঠী বণিকের আবাসভূমি শ্রাবস্তীপুরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য বুদ্ধ সকলের নিকট আবেদন করলেন। এবারও রাজা, শেঠ, বণিক সকলেই পিছিয়ে পড়লেন। এগিয়ে এলেন আবার সেই অনাথপিণ্ডদের এক কন্যা।

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক সে সভাঘরে   ব্যথিত নগরী-পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

যখন ব্যথিত জনগণের দুঃখে মহাকারুণিকের করুণ আঁখি দুটি সমবেত সকলের মুখের পানে সন্ধ্যাতারার ন্যায় চেয়ে রইল,

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা   বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে'
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—
"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা   আমার সন্তান তারা
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'র ন্যায় এবারেও দেখা গেল ধনিকের চেয়ে এক অভাজনের শক্তি বেশী। এই 'কথা ও কাহিনী'তেই বৌদ্ধধর্মের আর এক অপূর্ব শিক্ষা লাভ করলাম 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটিতে।

দীনের রক্ষক, দুর্বলের প্রতিপালক কোশল-নৃপতির যশোগান শুনে ঈর্ষা-জর্জরিত কাশীরাজ কোশলরাজ্য আক্রমণ করলেন। কোশল-নৃপতির রণে পরাজয় ঘটল। তিনি রাজ্যহীন হয়ে বনে গেলেন।

এদিকে কাশীর রাজা ঘোষণা করলেন—যে কোশলরাজকে ধরে এনে দেবে, তাকে এক শত মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে
মলিনচীর দীনবেশে,
পথিক একজন অশ্রুনীরে
একদা শুধাইল এসে,

"কোথা গো বনবাসী, বনের শেষ,
কোশলে যাব কোন্ মুখে?"
শুনিয়া রাজা কহে-"অভাগা দেশ,—
সেথায় যাবে কোন্ দুখে?"

সেই পথিক ছিলেন এক বণিক, বহু ধনের মালিক। কিন্তু তাঁর বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়ায় তিনি সর্বস্বান্ত হন। কোশলরাজের নাম এবং তাঁর দানধ্যানের কথা তাঁর শোনা ছিল, তাই বহু আশা করে তিনি কোশলরাজ্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এদিকে যে কোশলরাজ্যে অঘটন ঘটেছে, সে সংবাদ তিনি জানতেন না। বণিক যখন তাঁর দুঃখের কাহিনী বললেন তখন,

শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে
রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে
কহিলা নিঃশ্বাস ছাড়ি',
"পান্থ, যেথা তব বাসনা পূরে
দেখায়ে দিব তারি পথ,
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।"

অতঃপর এই পান্থের মনোরথ পূরণের জন্য কোশলরাজ কাশীরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করবেন স্থির করলেন। এই আত্মসমর্পণের অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু। তথাপি সমস্ত জেনে শুনেই তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন। উদ্দেশ্য বণিকের উপকার করা।

পাত্রমিত্র পরিবৃত কাশীরাজ সিংহাসনে বিরাজ করছেন। অকস্মাৎ সম্মুখে এক জটাজুটধারীর আগমন। রাজসভায় অপরূপ বেশধারী এক ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে দেখে রাজা বিদ্রূপের হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ কাজে হেথায় আগমন হয়েছে?'

"কোশলরাজ আমি বনভবন"
কহিলা বনবাসী ধীরে,

"আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথিটিরে।"
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হোলো গৃহতল ;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছলছল।

যে-কেহ এই কাহিনী পাঠ করে, তারই চোখ ছলছল করে ওঠে! রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে এই এক অপরূপ রাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা শৈশবেই!

ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে আরও অগ্রসর হলাম। এই অপূর্ব রাজ্যের বীথিতে বীথিতে অলিতে-গলিতে অনেক নয়নলোভন চিত্ত-বিমোহন বস্তুর সন্ধান পেলাম :

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা!
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পাকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

এই অপরিচিতা কাশীরাজ-মহিষীর শত সখীর সঙ্গে সঙ্গে মাঘ মাসের শীতের বাতাসে নগর হতে দূরে, এক নির্জন গ্রামে স্বচ্ছসলিলা বরুণা নদীর সুগন্ধি সুবর্ণকান্তি চম্পকবন পরিবেষ্টিত শিলাময় ঘাটে আমাদের শিশুচিত্তও স্নানে চলল!

"আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলে ছলে—
লক্ষ মাণিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

স্বচ্ছসলিলা বরুণারই মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের তটিনী প্রবাহিত হয়ে চলল :

ঘনঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল
দেখিতে দেখিতে ধূম্রবিদারী
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।
পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী
ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিণী !

রাজমহিষীর ক্ষণকালের শীত নিবারণের জন্য একখানি গ্রামের সব কুঁটি কুটির ভস্মীভূত হলো।

রাজদ্বারে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভিযোগে চিরকাল ধনীরাই একতরফা ডিক্রী পান। এখানে ঘটল বিপরীত। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের সবই ভিন্নরূপ। দরিদ্র প্রজার অভিযোগে রাজা রাণীকে দারুণ দণ্ড দিলেন :

রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া—
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
"মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের লীলায় তোমার

যে-কটি কুটীর হোলো ছারখার
যত দিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।"

গ্রামে মানুষ। জন্মে অবধি তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ভক্তি করতে শিখেছি, নানা দেবদেবীর মূর্তি দেখেছি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বপ্রথম নরদেবতার মূর্তি দেখলাম। সেই দেবতা :

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি,
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

দেবতার দুয়ারে গিয়ে গৃহস্থ ধন, মান, পুত্র-পরিবার কত কি কামনা করে। কিন্তু এই 'দেবতা'র অপরূপ রূপ দেখে সব ভুলে গিয়ে নির্নিমেষ নয়নে সে তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে থাকে।

সুদাস রহিল চাহি নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম-'পরে।
বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ সুধালেন হাসি,
"কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা।"
ব্যাকুল সুদাস কহে, "প্রভু, আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

এই নরদেবতা বুদ্ধকে চর্মচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রতিরূপ কি আমরা দেখিনি! বুদ্ধের ন্যায় আর একজনের—সেই

"নিরঞ্জন আনন্দমুরতি
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।"

আমরা কি দেখিনি?

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' 'মস্তক বিক্রয়', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'অভিসার', 'পূজারিণী'র মধ্য দিয়ে, আমি বুদ্ধের মৈত্রী করুণার, সেবা ও ন্যায়ধর্মের আস্বাদ পেয়েছি।

তারপর যখন বড় হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকার লাভ করলাম, তখন দেখলাম, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ রচনাই রয়ে গেছে।

বুদ্ধকে এবং বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মকে অভিনব আলোকে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে, কত রূপে, কত প্রসঙ্গেই না তিনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের কথা প্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি অসীম অনুরাগ! কি অপরিমেয় শ্রদ্ধা! 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে, আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি! এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে, নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি— সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

"একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেইদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল—যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাইনি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্য প্রভাব অনুভব করিনি।...

"ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ, কেউ ছিল কি আর্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড় তপস্যা আজ

কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে ?···

"পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধং' আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে, মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে, বলবার দিন এল—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে-মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক। যে-মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে। যে-মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে, সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"[১]

বৌদ্ধশাস্ত্র যে আমাদের অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তার জন্য তাঁর কি বেদনা, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'ধম্মপদ' প্রবন্ধে সেকথা তিনি বলেছেন :

"এই (ভারতবর্ষের) ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।···

"সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধশাস্ত্র উদ্ধার করাকে চির-জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না ? এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরি-চয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।—একথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না।···[২]

---

১ 'বুদ্ধদেব' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২)

২ প্রাচীন সাহিত্য, 'ধম্মপদ'

"ভারতবর্ষ বৌদ্ধরাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে—আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই।"[৩]

সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী এবং করুণা বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে এই মর্মে বলা হয়েছে, 'করুণা যেখানে, সমস্ত বুদ্ধধর্মই সেখানে।' করুণা কি—না 'আর্তে সুত ইব পিতুঃ প্রেম জগতি'—আর্ত পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ স্নেহ—সমস্ত প্রাণিজগতের প্রতি সেইরূপ স্নেহের নাম করুণা! মহাকারুণিক বুদ্ধের এই করুণা সম্বন্ধে কবি তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে 'উৎসবের দিন' নামক প্রবন্ধে বলেছেন:

"তাহা (করুণা) জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে, আপনাকে নির্বিশেষে, সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র—ইহাই ঐশ্বর্য। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন:—'মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের (একমাত্র) পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় দয়া ভাব জন্মাইবে! ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে, সমস্ত জগতের প্রতি, বাধাশূন্য, হিংসা-শূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে, অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মিত্র ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে! ইহাকে 'ব্রহ্মবিহার' বলে।' "[৪]

"এত বড় উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গম্ভীর হয়ে আছে সোঽহং তত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন। তাই বলেছেন—অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।"[৫]

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'আদেশ' প্রবন্ধে, কবি বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের মর্ম এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

"বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে, ধ্যানের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর

৩ 'অত্যুক্তি', ভারতবর্ষ ও স্বদেশ

৪ সুত্তনিপাত ১।৮।৭

৫ 'মানুষের ধর্ম'

খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন, বিকার, বিকাশ কেন, দুঃখ, জরা, মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে—মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেখানেই তার পাপ।

"এই জন্য তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন—'তুমি লোভ করো না, হিংসা করো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে' ধরেছে, সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে' ফেল্‌বার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হ'লেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

"সেই স্বরূপটি কি? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে, মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেননি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই, আত্মা আপন স্বরূপকে পায়; সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

"বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন—এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনা নেই।"

"ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন, কোনো পাবার যোগ্য জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

"তিনি বলেছেন—শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা।...প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহমুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ

দেখিয়েছেন।...অর্থাৎ এক দিকে বাধা কাট্‌ছে, আর এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে।"[৬]

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'ভূমা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন :

"বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী! সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখস্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকমের ক'রে ব্রত পালনের মাহাত্ম্য, মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে, মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।"

ভারতবর্ষে আর্য ও অনার্যের সংঘাতে, যে অনিবার্য বর্ণসঙ্কর ও ধর্মসঙ্কর উৎপন্ন হয়, তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কি নীতি অবলম্বন করেছিল এবং বৌদ্ধধর্মই বা তা কি ভাবে নিয়েছিল 'পরিচয়' গ্রন্থে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে কবি সেকথা আলোচনা করে বলেছেন :

"এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল, ততই সমাজের আত্মরক্ষণী শক্তি বারংবার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে।

"মনুতে বর্ণসংকরেরর বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তিপূজা ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও, তাহাকে বাধা দিবার প্রয়াস কোনোদিনই নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তে সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছে।

"একদিন ইহারই এক প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজ-সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রবল শক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম-

৬ 'ব্রহ্মবিহার'—শান্তিনিকেতন

নীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে, তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল।"

বৌদ্ধধর্মের এই বিশেষত্বের কথাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্রে' (বোরোবুদর মন্দির দেখে) লিখেছেন :

"এই মন্দিরে দেখতে পাই—সর্বজনকে। রাজা থেকে আরম্ভ করে' ভিখারি পর্যন্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে।

"জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে। তাতে বলেছে—যুগ যুগ ধরে, বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল যে ভালোমন্দর দ্বন্দ্ব চলেছে, সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই, ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত।"

'দয়া করো', 'ক্ষমা করো', 'ধর্মপথে চলো', এ সকল উপদেশ কে না শুনেছে! পূর্বে এরূপ উপদেশ নিতান্ত নীরস শুষ্ক বলেই আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু যখন একদিন আমরা কাব্যে, সুমধুর ভাষায়, বিচিত্র ছন্দে, পাঠ করলাম—নিদারুণ মারীগুটিকায় আক্রান্তা, পরিত্যক্তা, অস্পৃশ্যা, অশুচি এক গণিকার প্রাণ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী উপগুপ্ত রক্ষা করছেন, যখন দেখলাম, মালিনী তাঁর সমধর্মী, সহকর্মী, পরমপ্রিয় সুপ্রিয়ের হত্যার দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে দেখেও, সেই সময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করবার জন্য রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন, তখন ঐ উপদেশগুলি আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করল!

ধর্মপথে চলার অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখলাম 'নটীর পূজায়'। দেবজনভোগ্য শতদলপদ্মের উৎপত্তি হলো পঙ্কে। রাজমহিষী রাজদুহিতা, শত

শত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গৃহপতির ভার্যা এবং কন্যা থাকতে বুদ্ধের ধর্মকে অন্তরে বরণ করে নিলে কিনা এক নটী।

ক্ষত্রিয়কন্যার আভিজাত্যের গর্বে পতিতার এ ধর্মভাব সহ্য হলো না। তার এই স্পর্ধাকে দণ্ড দেবার জন্য, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের কুটিল বুদ্ধি এক কুৎসিত উপায় উদ্ভাবন করল। নটী সে, সারাজীবন সে তার নৃত্যের দ্বারা বিলাসী পুরুষের লালসা জাগিয়েছে। আজ তাকে তার আরাধ্য দেবতার বেদীর সম্মুখে নৃত্য করাতে হবে। সেই হবে তার উপযুক্ত দণ্ড!

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। নটী তার আরাধ্য দেবতার বেদীর সম্মুখেই নৃত্য করল! কিন্তু সে কি নৃত্য! সমস্ত চিত্ত যখন ভক্তিভাবে ভরপুর—সমস্ত অস্তিত্ব যখন ইষ্টদেবতার আরাধনার জন্য ব্যগ্র, যখন দেহের প্রতি অণু-পরমাণু এক অলৌকিক ভাবাবেগে ব্যাকুল—তখন সে তার চরম নৃত্যের তালে তালে মুখর হয়ে বলে ওঠে:

আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বাঁয়ে ছন্দ নামে
নবজনমের মাঝে।
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

...আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

এই তার জীবনের শেষ নৃত্য! এ নৃত্যের অবসান হলো মৃত্যুতে অথবা মুক্তিতে!

বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার আর অন্ত ছিল না। বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মকে জানবার—বোঝবার, তাঁর কি আগ্রহ! তখনকার দিনেও একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

কত অজ্ঞাত, অখ্যাত 'অবদান' হতে তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কে তাদের কথা জানত?

—প্রবাসী, মাঘ, ১৩৫৭

চণ্ডালিকা প্রকৃতি ও শ্রমণ আনন্দ

অতীত জনম হতে ব্যাপিয়া এ নতুন জনম
অন্তরে জনমে প্রেম, কুমুদের প্রতি শশী সম।
—শাদূ'লকর্ণারদান[১]

দু হাজার বৎসর আগে রচিত এক অপূর্ব প্রেম-কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যের গভীর অরণ্যে লুকিয়ে ছিল। ১৮৮২-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তখনও এই দেশের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পুঁথি তালিকার মধ্যে এবং কাউয়েল সাহেবের রোমান অক্ষরের ব্যূহের মধ্যে ঐ কাহিনী লুকিয়ে পড়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় ওই কাহিনীটি, পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এড়ালেও কবির দৃষ্টি এড়াতে পারল না। রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী এটিকে নতুন

১ মূল (সংস্কৃত) গ্রন্থের নাম 'শাদূ'লকর্ণাবদান'। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চণ্ডালিকা-গীতি নাট্যের উপাখ্যান গ্রহণ করেছেন। শাদূ'লকর্ণাবদানের চারটি চীনা অনুবাদ, এবং একটি তিব্বতী অনুবাদ আছে। পরবর্তী দুটি চীনা অনুবাদ এবং তিব্বতী অনুবাদ মূলের সঙ্গে অনেকটা মেলে। কিন্তু এই প্রাচীনতম চীনা অনুবাদ—অনেকটা পৃথক। এর মধ্যে জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। একটি সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমই এর সর্বত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এই অপূর্ব গাথাটি মূলে এবং সব কয়টি অনুবাদেই আছে। চীনা অনুবাদে উপমাটির একটু পার্থক্য আছে —'কুমুদের প্রেম যথা জলে।'

জীবন দান করল। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষিত জনসমাজের সামনে একাধিকবার অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গীতিনাট্য চণ্ডালিকা। যা এককালে শুধু ভারতবর্ষে নয়, এশিয়ার বৃহত্তম অংশে কোটি কোটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাই দুই হাজার বৎসর পরে যেন সঞ্জীবনীসুধা লাভ করে জীবিত হয়ে পুনরায় শত সহস্র নরনারীর চক্ষু, কর্ণ এবং চিত্তকে একত্রে আকর্ষণ করতে লাগল।

কে কবে এটি রচনা করেছিলেন—তা আজ অজ্ঞাত। ১৪৮-১৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদই আজ এর প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করছে। আমরা এই চীনা কাহিনীটি যেভাবে পেয়েছি, তাই এখানে বিবৃত করছি ঃ

বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডদের জেতবন-বিহারে বিহার করছিলেন। প্রত্যুষে আনন্দ তাঁর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষায় বের হলেন।

মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্ন ভোজন করে, আনন্দ যখন নদীতীর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন এক বালিকা কলসি করে জল নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ঐ বালিকার নিকট পানীয় চাইলেন। বালিকা তাঁকে জলদান করল এবং তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাসস্থান দেখে এল।

বালিকা তার গৃহে এসে মাতা মাতঙ্গীকে ঐ ঘটনার কথা বলল। তার পর ধূলিশয্যায় শয়ন করে রোদন করতে লাগল। সে বলল—"মা তিনি শ্রমণ। নাম তাঁর আনন্দ। নদীতীরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমার কাছে জল চেয়েছিলেন। মা, তুমি যদি আমার বিবাহ দিতে চাও, তাঁর সঙ্গেই আমার বিবাহ দিও। তাঁকে না পেলে আমি বিবাহ করব না।"

বালিকার মাতা আনন্দের সন্ধানে বার হলো। অনুসন্ধানে সে জানল, আনন্দ বুদ্ধের ভক্ত। গৃহে ফিরে সে কন্যাকে বলল—"আনন্দ বুদ্ধের শিষ্য। সে বিবাহ করতে চায় না।"

একথা শুনে বালিকা ক্রন্দন করতে লাগল। সে আহার পরিত্যাগ

করল। অবশেষে জননীকে বলল—"মা তুমি তো মন্ত্র জানো। কেন সেই মন্ত্র প্রয়োগ করছ না?"

মাতঙ্গী তার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য আনন্দকে নিমন্ত্রণ করতে গেল। বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হলো। আনন্দ আগমন করলে মাতঙ্গী বলল—"আমার কন্যা তোমার স্ত্রী হতে চায়।" আনন্দ বললেন—"আমি শীল গ্রহণ করেছি—স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।"

মাতঙ্গী বলল—"তোমাকে পতিরূপে না পেলে কন্যা আমার আত্মহত্যা করবে।"

আনন্দ উত্তর দিলেন—"আমি বুদ্ধের শিষ্য। স্ত্রী-সঙ্গ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

অতঃপর মাতঙ্গী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে কন্যাকে বলল—"আনন্দ বলছেন, তিনি বুদ্ধের শিষ্য, স্ত্রী-গ্রহণ তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ।"

বালিকা রোদন করতে করতে বলল—"মা তোমার মন্ত্র কোথায় গেল?"

মা বলল—"পৃথিবীতে এমন কোনো মন্ত্র নেই যা বুদ্ধ এবং অর্হৎ-গণের ধর্মকে অভিভূত করতে পারে।"

কন্যা বলল—"দ্বার বন্ধ করো। ওঁকে যেতে দিও না। রাত্রি হলে স্বভাবতই উনি আমার পতি হবেন।"

দ্বার রুদ্ধ করে মাতঙ্গী আনন্দকে মন্ত্রের দ্বারা বদ্ধ করল। রাত্রি হলে সে তার কন্যার শয্যা রচনা করল। বালিকা উৎফুল্ল হলো। আনন্দ কিন্তু তার শয্যায় গেলেন না।

মাতঙ্গী তখন (মন্ত্রবলে) পৃথিবীকে অঙ্গন-মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালনের আদেশ দিল। অতঃপর আনন্দের কাষায়বস্ত্র ধরে আবর্ষণ করতে করতে অগ্নিসম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলল—"যদি তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ না কর, তোমাকে এই অগ্নিতে নিক্ষেপ করব।"

আনন্দ চিন্তা করতে লাগলেন—বুদ্ধের শ্রমণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়েও আজ তিনি এর (মন্ত্রের) প্রভাব অতিক্রম করতে পারছেন না।

করজোড়ে বুদ্ধকে ডাকতে লাগলেন। বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তা অবগত হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে আনন্দকে উদ্ধার করলেন।

আনন্দ বুদ্ধের নিকট প্রত্যাগমন করে বললেন—"গতকাল আমি যখন ভিক্ষায় বাহির হই, তখন নদীতীরে, এক বালিকাকে দেখি। আমি তার নিকট জল চাই। তারপর, আমি বিহারে ফিরে আসি। আজ এক মাতঙ্গী আমাকে নিমন্ত্রণ করে। আমি যখন চলে আসছিলাম তখন সে আমাকে আবদ্ধ করে, এবং তার কন্যাকে গ্রহণ করতে বলে। আমি তাকে বলি—আমি শীল গ্রহণ করেছি, সুতরাং স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।"

দুই

এদিকে মাতঙ্গী-কন্যা যখন দেখল আনন্দ চলে যাচ্ছেন তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠল। মা বলল—আমার মন্ত্রের এমন শক্তি নেই যে বুদ্ধের শিষ্যকে অভিভূত করতে পারে। এ কথা কি আমি পূর্বেই বলিনি?

মাতঙ্গ-কন্যা ক্রন্দন হতে বিরত হলো না। সে অবিরত আনন্দের চিন্তা করতে লাগল। রাত্রি প্রভাত হলে সে স্বয়ং আনন্দের সন্ধানে বাহির হলো। আনন্দকে ভিক্ষা করতে দেখে সে তাঁকে অনুসরণ করল। আনন্দ দণ্ডায়মান হলে সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আনন্দ লজ্জিতচিত্তে তাকে এড়াতে চান কিন্তু বালিকা ক্রমাগত তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে।

অবশেষে আনন্দ বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। বালিকা দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগল। আনন্দ বের হলেন না দেখে বালিকা ক্রন্দন করতে করতে গৃহে ফিরে গেল।

আনন্দ বুদ্ধকে বললেন যে, সেদিনও মাতঙ্গ-কন্যা তাঁকে অনুসরণ করেছে। বুদ্ধ বালিকাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কী চাও ? কেন তুমি আনন্দকে অনুসরণ করছ ?"

বালিকা বলল—"আমি শুনেছি আনন্দের স্ত্রী নেই। আমারও স্বামী নেই। তাই আমি তাঁর স্ত্রী হতে চাই।"

বুদ্ধ বললেন—"আনন্দ শ্রমণ। তার মস্তকে কেশ নেই। কিন্তু তোমার মস্তকে এখনও কেশ রয়েছে। যদি তুমি মস্তক মুণ্ডন করতে প্রস্তুত হও, আমি আনন্দকে তোমায় দান করব।"

বালিকা বলল—"আমি কেশ পরিত্যাগ করব।"

বুদ্ধ বললেন—"তুমি গৃহে গিয়ে মাকে বলো। তারপর মস্তক মুণ্ডন করে এখানে এসো।"

বালিকা গৃহে গিয়ে তার মাকে বলল—"মা, তুমি আনন্দকে আনতে পারনি। বুদ্ধ বলেছেন, তুমি মস্তক মুণ্ডন করে এসো। আমি আনন্দকে দান করব।"

মাতঙ্গী বলল—"আমা হতে তোমার জন্ম হয়েছে। আমার কথা শোন, কেশ পরিত্যাগ কোরো না। শ্রমণকে কেন বিবাহ করতে চাও ? দেশে কত বড়লোক, কত ধনী রয়েছে, তাদেরই মধ্যে কারোর সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দিতে পারি।"

বালিকা উত্তর দিল—"মরি কিংবা বাঁচি, আমি আনন্দেরই স্ত্রী হব।"

মাতা বলল—"তুমি আমাদের জাতির লজ্জা।"

বালিকা বলল—"মা, তুমি যদি আমাকে ভালোবাস, তা হলে আমি যা চাই তাই করতে দাও।"

মাতা তখন অশ্রুবর্ষণ করতে করতে ক্ষুর দিয়ে কন্যার মস্তক মুণ্ডন করে দিল।

অতঃপর বালিকা বুদ্ধ সমীপে গমন করে বলল—"আমি মস্তক মুণ্ডন করেছি।"

বুদ্ধ বললেন—"তুমি আনন্দকে ভালোবাস। কিন্তু তার দেহের

কোন্ অংশকে ভালোবাস ?"

বালিকা উত্তর দিল—"আমি আনন্দের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, কণ্ঠস্বর, তাঁর অঙ্গভঙ্গী, চলন সমস্তই ভালোবাসি।"

বুদ্ধ বললেন—"চক্ষে, কর্ণে, নাসিকায়, মুখে, সর্বত্রই ঘৃণিত মল রয়েছে। দেহের অন্যত্র মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তু রয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের সম্মেলনে অপবিত্র বস্তু হতেই সন্তানের জন্ম হয়। জন্ম হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আবার মৃত্যু হলে দুঃখ শোক অবশ্যই আসবে। এই অবস্থায় দেহকে ভালোবেসে কী লাভ হয় ?"

বালিকা একাগ্র-চিত্তে বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করল। তাই-ই মনে করতে করতে সে মনশ্চক্ষে দেহস্থিত সমস্ত অপবিত্র বস্তু প্রত্যক্ষ করল। এই ভাবে মাতঙ্গ-কন্যার দিব্যজ্ঞান হলো। তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

বুদ্ধ যখন অবগত হলেন মাতঙ্গ-কন্যা অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন, তিনি তাঁকে বললেন—"এখন তুমি আনন্দের গৃহে যেতে পার।" লজ্জায় বালিকার মস্তক নত হলো। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণতা হয়ে বললেন : "মূঢ়তাবশত আমি আনন্দকে অনুসরণ করেছিলাম। অন্ধকারবর্তী বর্তিকার ন্যায় চিত্ত আমার দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে। ভগ্নতরী হতে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন তীর লাভ করে, আমিও সেইরূপ তীর লাভ করেছি। অন্ধ আজ যষ্টি লাভ করেছে। ভগবান, আপনি আমাকে ধর্মদান করে আমার চিত্ত জাগ্রত করেছেন।"

ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন—"মাতা যার অভিচার মন্ত্রের দ্বারা অনর্থ সৃষ্টি করে, কন্যা তার কীরূপে অর্হত্ত্ব লাভ করল ?"

বুদ্ধ বললেন—"এই বালিকা সম্বন্ধে তোমরা কিছু শ্রবণ করতে চাও ?" ভিক্ষুগণ আনন্দের সঙ্গে শ্রবণ করতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন :

"পঞ্চশত অতীত জন্মব্যাপী এই বালিকা আনন্দের পত্নী ছিলেন। এই পঞ্চশত জন্ম ধরে তাঁরা উভয়ে উভয়কে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা

করতেন। আজ তাঁরা উভয়েই আমার শাসনমার্গ লাভ করেছেন। আজ সেই দম্পতি ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায় মিলিত হয়েছেন।"

এইখানে ভগবান তথাগত, এই অপূর্ব গাথাটি উচ্চারণ করলেন :

"অতীত জনম হ'তে ব্যাপিয়া এ নূতন জনম।
অন্তরে জনমে প্রেম, কুমুদের প্রতি শশীসম।"

—জগজ্জ্যোতিঃ, আশ্বিনী পূর্ণিমা, সংখ্যা ১৯৫৩

কবি চরিত্র

অনুপম উদারতা ● সহৃদয় সহাবস্থান ● নির্লিপ্ত ● কড়ি ও কোমল
কবির সমধর্মী ● কবির চক্ষে বিপ্লবী তরুণ ● পূজার বেদীতে কবি
কবি ও সংস্কার-সমিতি ● দুর্ভাগাদরদী কবি ● ত্রৈবিদ্য পণ্ডিতের চক্ষে
কবি ● কবি ও বৈদিক বিবাহপদ্ধতি ● লোকোত্তর
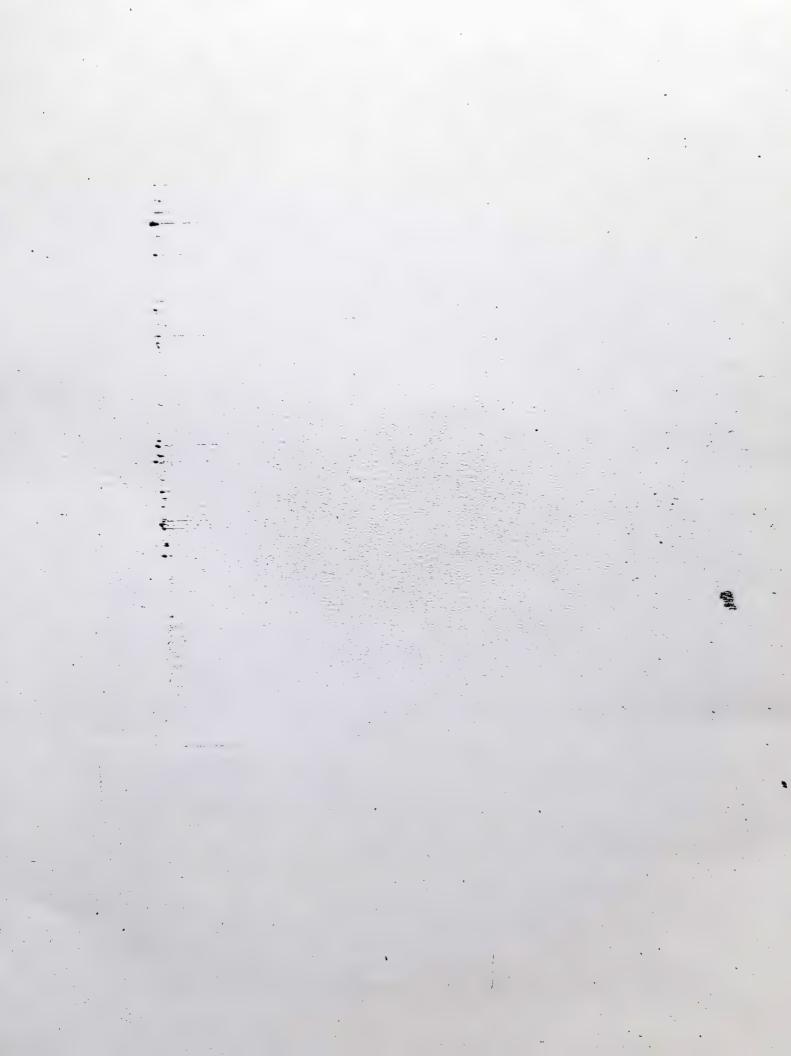
রবীন্দ্র-চরিত্রের যে মহৎ গুণ আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে সে তাঁর পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। বাল্যকাল হতে সুদীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯১৭ সালে এগারো বারো বৎসর বয়সে আমি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করি। শান্তিনিকেতন তখন একটি আদর্শ পরিবার। যে পরিবারে কর্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একই রকম সাদাসিধে আবাসে সকলের বাস। একই পাকশালায় সকলের আহার।

গ্রাম থেকে এসেছিলাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কখনো অব্রাহ্মণের হাতে অন্ন গ্রহণ করিনি। কিন্তু তার জন্য কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। পাকশালায় ব্রাহ্মণদের পংক্তি ছিল পৃথক। ব্রাহ্মণেরাই তাতে পরিবেশন করতেন। অবশ্য কোনো ব্রাহ্মণ যদি অন্য পংক্তিতে বসতে চাইতেন, তাতে আপত্তি ছিল না।

দীর্ঘকাল ভোজনগৃহে এক দীর্ঘ ব্রাহ্মণ পংক্তি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেননি—"এখানে ব্রাহ্মণ পংক্তি রাখা চলবে না, একে উঠিয়ে দিতে হবে।"[১] কিন্তু একদিন সেই ব্রাহ্মণ পংক্তি নিজের থেকেই

---

১ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম কার্যপ্রণালীতে আছে: যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দু সমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান, তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ।

রন্ধনশালায় বা আহার স্থানে হিন্দু আচার বিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

উঠে গেল। কেমন করে গেল, কবে গেল কারো লক্ষ্য হয়নি। দীর্ঘ পংক্তি হ্রস্ব হতে হতে একদিন একেবারেই অস্তিত্ব হারাল।

জোর জবরদস্তির কোনো প্রয়োজন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সাহচর্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্র-নাট্য-অভিনয় ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব-পূর্ণ আশ্রমিক আবেষ্টনীতে সর্বপ্রকার মানসিক সংকীর্ণতা ধীরে ধীরে দূর হতো।

জাতিভেদে অবিশ্বাসী সংস্কারপন্থী রবীন্দ্রনাথ এবং জাতিভেদে বিশ্বাসী সনাতন পন্থী বিধুশেখর শাস্ত্রী একই আশ্রমে পরম অন্তরঙ্গ-ভাবে বাস করেছেন। রবীন্দ্র মতাবলম্বীর চেয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা কম ছিল না। প্রথম দিকে বরং তাঁর মতের লোকই বেশী ছিল। কিন্তু তার জন্য কোনোদিন শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হয়নি।

এইরূপ মতবিরোধ সত্ত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমে যখনই নতুন কিছু প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছেন কিন্তু কবি তার জন্য কোনোদিন কারো উপরে জবরদস্তি করেননি। মতানৈক্যের জন্য কাউকে আশ্রম ত্যাগ করতে বলেননি। কখনো তাঁকে এজন্য ধৈর্যচ্যুত হতে দেখিনি। ধরিত্রীর ন্যায় অসীম ধৈর্যে পরম স্নেহে তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের তাঁর আশ্রমে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁদের রক্ষা করেছেন। আশ্রমবাসীদের কেউ ছিলেন হিংসাত্মক বিপ্লবী, কেউ অহিংসপন্থী, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বা নাস্তিক।

প্রভাতে পাঠারম্ভের পূর্বে বৈতালিক এবং ছুটির দিনে মন্দিরে উপাসনা হতো, যা এখনো হয়। সকলকে তাতে যোগ দিতেই হবে এমন কোনো জুলুম ছিল না। তবু প্রায় সকলেই তাতে যোগ দিতেন।

শান্তিনিকেতনের মন্দিরটি পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় দেবস্থান। এ

শান্তিনিকেতন আশ্রমের হৃৎপিণ্ড। এর প্রতি স্পন্দনে ধ্বনিত হচ্ছে—"এ আশ্রম, এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস সরোবরে পদ্ম যেমন বিকশিত হয়, তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে, এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে, একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না।"

আশ্রমেরই মতো এ মন্দির কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নয়—এ সর্ব মানবের। যেকোনো ধর্মের, যেকোনো সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি এ মন্দিরে আচার্যের আসনে বসতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সর্বধর্মাবলম্বী সজ্জনকেই আচার্যের আসনে বসতে দেখেছি।

জুলুমকে আমরা সভ্য মানুষ নিন্দা করি। কিন্তু সে সাধারণত দেহের উপর জুলুমকেই। সকলকে নিজের মতে আনবার জন্য আমরা অন্যের মনের উপর জুলুম করি। কিন্তু তাতে আমাদের সভ্য মন ক্ষুণ্ণ হয় না। আমাদের পরিবারে, সমাজে, দেশে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এ ঘটতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের সময় শান্তিনিকেতনে এ কখনো দেখিনি। এ এক মহৎ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের সংসর্গে এসে পেয়েছি।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীষ্টান।

—১৮ই আষাঢ়, ১৩১৭ (১৯১০)।

রবীন্দ্রকাব্যের এই সাদর আহ্বান রবীন্দ্রজীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর সেই ক্ষুদ্র আশ্রমের ক্ষুদ্রতর বিদ্যালয়ে তাঁর আন্তরিক আহ্বানে আর্য, অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ, খ্রীষ্টান সকলেই এসেছেন।

খ্রীষ্টান ব্রহ্মবান্ধবই প্রথমে (১৯০১-২) এই শিশু বিদ্যালয়ের ভার নিয়েছিলেন। ইংরেজ এণ্ডরুজ (১৯১৪-৪০) এবং পিয়ার্সন (১৯১৪-২৩) আমরণ এই আশ্রমের সেবা করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের গঠনকার্যে তাঁদের দান কম নয়।

শুনি তব উদার বাণী—
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক
মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে।

(১৯১১-১২—১৩১৮)

রবীন্দ্রনাথের উদার বাণীর আকর্ষণে-হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পূর্ব, পশ্চিম, চীন, তিব্বত, জাপান, পারস্য, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের বিদ্যার্থী ও বিদ্বজ্জন রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর বিশ্বের নীড় বিশ্বভারতীর রূপদানে সহায়তা করেছেন।

সুদূর নরওয়ে থেকে ষোল বছরের বালক এসেছে ছাত্র হয়ে। ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে একই ছাত্রাবাসে বাস করেছে। একই পাক-শালায় অন্ন গ্রহণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহ-ভাজন—সর্বজনপ্রিয় পঞ্চনদবাসী ৺জিয়াউদ্দিন ছিলেন বিশ্বভারতীর আদর্শ অধ্যাপক। তেমন মধুর চরিত্র বেশি চোখে পড়েনি।

নানা দেশীয়, নানা জাতীয়, নানা ধর্মীয় ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের উপর রবি-কিরণের ন্যায়, রবীন্দ্রের স্নেহ সমভাবে বর্ষিত হতো।

তিনি ছিলেন সকলের সমান প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে ধর্ম বা মতের অনৈক্যের জন্য বিশ্বভারতীর পরিবারে কখনো অশান্তি ঘটেনি। শান্তিনিকেতন নাম সার্থক হয়েছিল।

শিশু বিদ্যার্থীগণ, কেবলমাত্র ভূগোল পুস্তকে নয়, চোখের সামনে পৃথিবীর জীবন্তরূপ প্রত্যক্ষ করত।

রবীন্দ্রনাথের পরমত-সহিষ্ণু উদার কবি চরিত্রের এক মধুর নিদর্শন আমার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা হতে দিচ্ছি—

আমি তখন যুবক। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ছাত্র। ১৯১৭ সালে আগত সেই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বালকটি—অব্রাহ্মণের হাতে অন্ন গ্রহণ

করলে যার জাত যেত, তার তখন আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই বালক তখনকার আমাকে দেখে চিনতে পারত না। ভগবদ্‌-ভক্ত রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আমি ভগবদ্‌-দ্রোহী। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব আমি কঠোর ভাষায় কবিতায় ব্যক্ত করি। এরূপ একটি কবিতা সেদিন আমি প্রকাশ্যে সাহিত্য সভায় পাঠ করি। সেদিন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক আচার্য ছিলেন সভাপতি। কবিতাটির তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। ক-দিন খুব বিমর্ষতার মধ্যে কাটল। শেষে একদিন কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে এলাম। পরদিন প্রত্যুষে তাঁর মতামত জানতে গেলাম। সেদিনের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। উৎকণ্ঠা, ভয়, উদ্বেগ, আশা-নিরাশা—কত না বিচিত্র মনোবৃত্তি অন্তরে একত্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের মুখে হাসি দেখে বুক বল এলো। তিনি বললেন—'কবিতাগুলি ভালো হয়েছে।' আমি চমকে উঠলাম। তখন বলেই ফেললাম—'আপনি ভগবদ্‌ভক্ত হয়ে এ কথা বললেন। আচার্য কঠোর মন্তব্য করেছিলেন।' উত্তরে তিনি বললেন—'কবির কী মত তা তো আমার দেখবার নয়। কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি না তাই আমার দেখবার। কবির অন্তরের ভাব কবিতায় রূপ পেয়েছে তাই আমার ভালো লেগেছে। তোর সঙ্গে আমার মতের মিল নাই বা হলো।'

আমি মুগ্ধচিত্তে তাঁকে প্রণাম করে খুশি হয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

রবীন্দ্রনাথের পরমত শ্রদ্ধাশীল বিশাল কোমল কবি হৃদয়ের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিধবা পত্নী সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিকেতনের আদর্শ শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর তিনটি ভগ্নী অবিবাহিতা। প্রথমা রমা (নুটু) সুললিতকণ্ঠী রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী।

রমা তাঁর শিক্ষাবসানে সংগীত ভবনের শিক্ষয়িত্র হয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর বিবাহ হলো। তারপর তাঁর নিজের বিবাহ। বিবাহ স্বজাতির মধ্যে নয়। তাই মাতা তাঁর অত্যন্ত ব্যথিতা। কিন্তু কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যাবেন না। কন্যা যাতে সুখী হন—তাতেই তিনি কৃতসংকল্প। তবে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা —হিন্দু মতে সনাতন পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে কন্যার বিবাহ হোক।

জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। আশে-পাশের গ্রামের কোনো পুরোহিতকেই রাজী করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ শেষে তাঁর বিশেষ পরিচিত বাইরের এক অধ্যাপককে পৌরোহিত্যের জন্য অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্র-ভক্ত সেই অধ্যাপক তাতে রাজী হলেন না। উপরন্তু কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়ে পত্র লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুপত্নী 'নুটুর' মা-র ইচ্ছা পূরণ না করতে পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন, এ কথা আশ্রমের সর্বত্র আলোচিত হচ্ছিল। আমি তখন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের ছাত্র। সংস্কারপন্থী ছাত্রদের একজন নেতা। বন্ধুদের মধ্যে একদিন নেহাৎ পরিহাসচ্ছলে বলে-ছিলাম—'ভারি তো এক কাজ। তার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছে না। এ তো আমিই সেরে দিতে পারি।'

কথাটা কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

প্রাতঃকাল। উদয়নের উপরতলায় শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ মহাশয়ের সংগে রবীন্দ্রনাথ প্রাতরাশে বসেছেন। আমি যেতেই বললেন 'তোকে নুটুর বিয়ে দিতে হবে।'

আমি স্তম্ভিত। নুটু আমার দিদির বয়সী। যাঁর সঙ্গে তার বিবাহ তিনি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক! তাঁদের বিবাহে আমার মতো অর্বাচীন পৌরোহিত্য করবে—এও কি সম্ভব?

পরিহাসবিজল্পিত বাক্যকে স্বয়ং গুরুদেব যে গুরুত্ব দেবেন—তা কল্পনা করতে পারিনি।

গুরুদেব অত্যন্ত গম্ভীর। ব্যথিত স্বরে তিনি বলে চললেন—'হুটুর মা জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। শেষ বয়সে আবার এমন এক আঘাত পেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা আমি বেশ অনুভব করতে পারছি। আমি অনেক চেষ্টা করলুম—ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাওয়া গেল না। তুই এ কাজ কর। তোর ভালো হবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন—'হুটু তোর সঙ্গে পড়েছে, তোর বন্ধু। তাকে সাহায্য করবি নে?'

তাঁর কথায় আমি ব্যথিত হলাম। বললাম—'কিন্তু আমি কি পারব? কখনো যে এ কাজ করিনি।'

তিনি বললেন—'তার জন্য ভাবিস নে। ক্ষিতিমোহনবাবু সব ঠিক করে দেবেন।'

শুভদিনে শুভলগ্নে (২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল), শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হোম করে হিন্দু মতে, হিন্দু পদ্ধতিতে যথারীতি রমার বিবাহ হলো। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ সেই বিবাহবাসরে নীরবে শ্রদ্ধাভরে উপবিষ্ট হলেন। দীর্ঘ বিবাহ-পদ্ধতির শেষের দিকে, রাত্রি অধিক হওয়ায় পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে তিনি গৃহে ফিরে যান।

'গল্পভারতী' রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা (১৩৬৮)

সহৃদয় সহাবস্থান

১৯৩৪-৩৬ সালের কোনো এক সময়। আমি তখন আসামে—শ্রীহট্টে। বছর খানেক পর শান্তিনিকেতনে আসছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করব। তিনি তখন 'শ্যামলী'-তে।

উত্তরায়ণের সিংহদ্বার পার হয়ে, 'উদয়ন' এর আঙিনা থেকে দেখি রবীন্দ্রনাথ বাইরে বসে আছেন। কিন্তু একি! তাঁর যে সন্ন্যাসীর বেশ! সর্বঅঙ্গে গেরুয়ার আচ্ছাদন। অবশেষে তাঁর এমনই পরিবর্তন!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। প্রথম চমক্‌টা কাটিয়ে ধীরপদে অগ্রসর হতে লাগলাম। খানিক এগিয়েই বুঝলাম—গেরুয়াধারী রবীন্দ্রনাথ নন—'গাঙ্গুলীমশায়'।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলের অদ্ভুত সাদৃশ্য। রং যদিও শ্যামলবর্ণ। দূর থেকে রঙ বড় নজরে পড়েনি। কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

প্রণামান্তে রবীন্দ্রনাথকে ঐ চমক লাগার কথা বললাম। তিনি হাসলেন। বললেন: "ও এখন আমার কাছেই থাকে। কোথায় আর যাবে।"

গাঙ্গুলীমশায়ের জন্ম ধনীর ঘরে—হঠাৎ দরিদ্র হয়ে গেছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁকে একটি চাকরি দেওয়া হয়েছিল। চাকরি করার অভ্যাস নেই—তাই বেশি দিন সে-কাজ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথই এখন তাঁকে নিজ কুটিরে আশ্রয় দিয়েছেন।

গাঙ্গুলীমশায় অতি উচ্চৈস্বরে কথা বলেন। নিম্নস্বরে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ঘরে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন—তখন পাশের ঘরে, গাঙ্গুলীমশায়ের উচ্চকণ্ঠস্বরে কয়েকবার তাঁর কথার ব্যাঘাত হয়।

অবশেষে পাশের ঘরে এমনই জোর আওয়াজ হতে লাগল যে রবীন্দ্রনাথকে বাক্যলাপ বন্ধ করতে হলো।

সমস্ত মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল। বুঝলাম তাঁর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

কিন্তু তখনই তিনি নিজেকে সংযত করে মন্তব্য করলেন ঃ

"এত সশব্দ মানুষ!" তারপর পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

এরকম একজন মানুষের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ, 'শ্যামলী'র মতো একটি ছোট্ট কুটিরে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

একেই বলে—'সহাবস্থান'!

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

নির্লিপ্ত

দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁর মহৎ চরিত্রের বিভিন্ন দিক এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

রবীন্দ্রচরিত্রের অন্য আর এক দিক আমি আজ দেখাবার চেষ্টা করব। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা—তার মধ্য থেকেই তাঁর এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সাল তারিখ মনে নাই। সেদিন বসন্তোৎসব। বিপুল তার আয়োজন। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত আম্রকুঞ্জের প্রতি গাছের ডালে ডালে, নানা রঙের জাপানী ফানুস টাঙানো হয়েছে—তার মধ্যে বাতি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে স্থানটি আমোদিত।

বসন্তোৎসব পূর্বে অনেক দেখেছি। কিন্তু এবারের সাজ, সকল উৎসবের সাজকে ছাড়িয়ে গেছে। কলাভবনের শিল্পীদের নিপুণ পরিকল্পনায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে, উৎসবের এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বসন্তোৎসব শুরু হবে। এমন সময় অকাল কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলা শুরু হলো। সে কী ভয়ানক ঝড়। তেমন ঝড় বর্তমান শান্তিনিকেতনে দেখা যায় না। তার কারণ তখনকার শান্তিনিকেতন ছিল ফাঁকা। এখনকার শান্তিনিকেতন গাছপালা বাড়ি ঘরে পূর্ণ।

নিমিষে সারাদিনের সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। কোথায় গেল জাপানী ফানুস! কোথায় গেল মাল্যদল। কোথায় গেল আলপনা।

ঝড়ে বৃষ্টিতে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রী কর্মিবৃন্দ সকলের কী মনোবেদনা। কী নৈরাশ্যজনক অবসাদ—বিশেষ কলাভবনের শিল্পিবৃন্দের। গুরুদেবের নিকট তাঁদের আপশোষের আর অন্ত নেই।

গুরুদেব কিন্তু নির্বিকার। তিনি যেন ধ্যানস্থ। আমি তখনও বালক কাজেই সেই সময় তাঁর মনোভাব উপলব্ধি করতে পারিনি। আজ বুঝেছি তখন তিনি ছিলেন অন্য এক রসধারায় নিমগ্ন। তিনি তখন নটরাজের নৃত্য উপভোগ করছেন। সেই আনন্দেই মন তার ভরপুর। তাঁর কাছে মানুষের আয়োজিত বসন্তোৎসবের সাজসজ্জার সৌন্দর্য তুচ্ছ হয়ে গেছে।

তিনি মৃদুহাস্যে শিল্পীদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আমাদের ইচ্ছার উপর বিধাতার ইচ্ছা কাজ করে। তার উপর আমাদের হাত নেই।"

"যাও লাইব্রেরীর দোতালায়—বসন্তোৎসবের ব্যবস্থা করো। সেইখানেই আজ বসন্তোৎসব হবে।"

সাজসজ্জাহীন এক হল ঘরে বসন্তোৎসব উদ্‌যাপিত হলো।

শিশুসাথী, শ্রাবণ, ১৩৭০

৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রজীবনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। সে-যুগে বিদ্যালয়ে ছিল প্রচণ্ড শাসন। এবং নির্মম শাস্তি। স্নেহ, প্রীতি সৌহার্দ্য খুব কম শিক্ষকের কাছেই পাওয়া যেতো। একমাত্র কঠোর শৃঙ্খলাই ছিল শিক্ষকদের লক্ষ্য। তারই জন্যে অত্যাচারের আর অন্ত ছিল না।[১]

৬০ | ৬২ বছর পূর্বে আমাদের ছাত্রজীবনেও গ্রামের পাঠশালায় এবং মধ্য ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়েও যে ভীষণ শাসন প্রত্যক্ষ করেছি—তা স্মরণ করলে আজও হৃৎকম্প হয়।

নিজ ছাত্রজীবনের বিভীষিকার কথা মনে থাকায়, রবীন্দ্রনাথ সংকল্প করলেন—তিনি এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন, যার মনোরম পরিবেশ ও শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের সহজেই আকৃষ্ট করবে। যার শিক্ষকগণ হবেন পিতার মতো সহৃদয়, মাতার মতো স্নেহপরায়ণ এবং বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

এই কথা মনে রেখে, তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মনোরম শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে ঐরূপ এক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মনের মতো শিক্ষকও কয়েকজন পাওয়া গেল। এই

---

১ "যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।"
—জীবন-স্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২

বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পরম আনন্দে, তাদের ছাত্রজীবন যাপন করত।

কিন্তু এই বিদ্যালয়েও শৃঙ্খলা ছিল। এবং শাসনও ছিল। তবে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শাসনের ভার—শিক্ষকদের হাতে ছিল না—ছিল ছাত্রদেরই হাতে।

ছাত্ররাই তাদের নায়ক, অধিনায়ক প্রভৃতি, গোপন ভোটের দ্বারা নির্বাচন করত। এই নায়ক, অধিনায়কগণই নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিত। নিয়মশৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রকে শাসন করত—শাস্তি দিত।

নায়কের যে কোনো আদেশ তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে পালন করতে হতো। পরে সে-বিষয়ে অধিনায়কের কাছে নালিশ চলত। অধিনায়কের কাছেও সুবিচার পাওয়া না গেলে—'বিচারসভায়' আবেদন করা যেত। বিচার-সভার সভ্যগণও ছাত্রদের দ্বারাই নির্বাচিত।

এই বিচারসভাই শান্তিনিকেতনের সর্বোচ্চ আদালত।

মনে রাখতে হবে—এই ছাত্রেরা সে-যুগের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। তাদের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারও সবসময় ঠিক সুবিচার হতো না। তখন ছাত্র পরিচালক-শিক্ষক অথবা শিক্ষকগণের সর্বাধ্যক্ষ বা রবীন্দ্রনাথকে হস্তক্ষেপ করতে হতো। তাঁরা ছাত্রদের যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝিয়ে তাদের বিচারের ত্রুটি দেখিয়ে দিতেন।

শীতকালেও ছাত্রেরা ভোর সাড়ে চারটায় উঠত। এবং সাড়ে পাঁচটায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করত। ঘর ঝাঁট দেওয়া, নিজের নিজের থালা বাটি গেলাস মাজার কাজ—যা নিজের বাড়িতে কেউ করেনি—তা সকলেই শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছায় খুশিমনে করত।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে, রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ছাত্রদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। সকালে ক্লাস নেওয়া, বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, রাত্রে গল্প বলা, রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক দৈনন্দিন কৃত্য ছিল।

এ হলো—প্রাক্ বিশ্বভারতী যুগের, ১৯১৬-১৮ সালের কথা।

কোনো ছাত্র অবাধ্য হয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গ করলে, কোমলহৃদয় কবিও যে কত কঠোর হতেন—তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা শেষ করি।

১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। অমর বিপ্লবী যতীন দাস সেদিন অনশনে দেহত্যাগ করেছেন।

মধ্যাহ্নে আমরা এ খবর পেলাম। সকলেই শোকাহত, তরুণেরা উত্তেজিত।

আমি তখন স্নাতকোত্তর বিভাগে বিদ্যাভবনের বয়স্ক গবেষণারত ছাত্র। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে ছুটি চাইলাম। তিনি বললেন:

"বিশ্বনাথের আরতি কোনোদিন বন্ধ হয় না। বিদ্যাচর্চাও সেইরূপ বন্ধ রাখা যায় না।"

বেলা দুটোর সময় তাঁর কাছে আমার ক্লাস ছিল। তাঁকে গিয়ে বললাম। :

"আজ ক্লাস করব না।"

"ক্লাস করবে না?"

"আজ্ঞে না!"

তিনি বললেন:

"তুমি এই বিদ্যাভবন ত্যাগ করে চলে যাও।"

"চললাম।"

"শোনো। পনেরো দিন তুমি এখানে আসবে না।"

"আচ্ছা।"

"শোনো। এই পনেরো দিন তুমি বৃত্তি পাবে না।"

"সে তো জানা কথা।"

আমি বিদ্যাভবন থেকে পনেরো দিনের জন্যে বহিষ্কৃত হলাম। বিদ্যাভবনের ছাত্রসংখ্যা কম। যাঁরা ছিলেন—তাঁরাও বেরিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সে-খবর যখন অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পোঁছাল—তখনই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছুটলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি উপবিষ্ট হলে প্রশ্ন করলেন :

"খবর ভালো তো ?"

"ভালো না! আমি বোধহয় একটা অন্যায় কাজ করলাম।"

"সে কি! আপনি অন্যায় কাজ করলেন!"

শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রীমহাশয় অন্যায় করবেন—এ যে অবিশ্বাস্য!

শাস্ত্রীমহাশয় তখন সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললেন। শুনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন :

"শান্তিনিকেতনে ছেলেবেলা থেকে আমাদের কাছে শিক্ষালাভ করে, ও কিনা এইরূপ অবাধ্য হলো। আপনি ওকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন—সেই আপনার আদেশ অমান্য করল ?"

সিংহলের এক বৌদ্ধভিক্ষু এই সময় রবীন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে আমাকে এই খবর দিলেন।

পরদিনই আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই ক্রোধে এবং ক্ষোভে, তিনি আমাকে নিদারুণ ভর্ৎসনা করলেন। পিতা বা পিতামহের মতো স্নেহশীল রবীন্দ্রনাথের কাছে দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে সেই প্রথম এইরূপ কটুতিক্তরসে আপ্যায়িত হলাম। ২৩।২৪ বছরের যুবক আমি, শিশুর মতো কেঁদে ফেললাম।

তাতে রবীন্দ্রনাথ এমনি বিচলিত হলেন যে কী ভাবে আমায় সান্ত্বনা দেবেন,—তা ভেবে পেলেন না।

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছি :

"আমি গরিব—তাই তিনি আমায় বৃত্তি বন্ধ করার ভয় দেখালেন।"

ব্যাকুল রবীন্দ্রনাথ, অতি কোমল স্বরে বলতে লাগলেন :

"ছি-ছি! তুই একথা ভাবছিস কেন ? গরিব বলে কি তোকে

বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে ! তোর চেয়ে তো ঢের গরিব সংসারে আছে। তাদের তো বৃত্তি দেওয়া হয় না ! তুই যোগ্য বলে তোকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে—গরিব বলে নয় !''

আমার কান্না দেখে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ কী বলে যে আমায় সান্ত্বনা দেবেন তা তাঁর মতো বাগ্‌দেবীর বরপুত্রের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে—তাঁর সান্ত্বনা দেবার ওই কথাগুলি শুনে তাই মনে হয়।

যাই হোক, আমাদের এই পারিবারিক মনোমালিন্য সেই দিনই অতি সহজেই মিটে যায়।

কবি বলেছিলেন ঃ ''আমি বিদেশ যাবার পূর্বে যেন জানতে পারি তোদের এটা মিটে গেছে।''

তাই পরদিনই তাঁকে প্রণাম করে এই সুখবর দিই।

"আমি এখন খুশি হয়ে বিদেশ যেতে পারি"—এই বলে হাসিমুখে তিনি তাঁর প্রণত ছাত্রের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ জানালেন।

জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৮০

কবির সমধর্মী

[একটি স্মরণীয় সায়াহ্ন]

“লাখে ন মিলল এক’—মহাপুরুষের সমধর্মী সম্বন্ধে একথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি সমধর্মী মিলেছিল। তাঁদের কেউ কেউ অকালে প্রাণত্যাগ করেন। যেমন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

সমধর্মীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ স্বতোৎসারিত নির্ঝরের ন্যায় শতধারে বর্ষিত হতো। শেষ বয়সে তাঁর অবশিষ্ট সমধর্মীগণ প্রায় সকলেই তাঁকে একে একে ছেড়ে চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব—তিনি সকলকেই ভালোবাসতে পারতেন, সমধর্মী না হলেও সকলের সঙ্গেই পরমাগ্রহে মেলামেশা করতেন। যে যেমন তাঁর সঙ্গে তেমনি ভাবেই মিশতেন। যিনি হাল্কা প্রকৃতির তাঁর সঙ্গে হাল্কা কথাবার্তা, লঘু হাস্যপরিহাসে সময় কাটাতেন। এইভাবে সুকুমার শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ কর্মী, গ্রামবাসী চাষী, গৃহস্থ এবং ভৃত্যদের সঙ্গেও সাগ্রহে বার্তালাপ করতেন।

কিন্তু সমধর্মী পেলে তাঁর অন্তরের সমস্ত আগল খুলে যেতো। তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো।

১৯৩৭-৩৯ সালের কোনো এক সময়ে, একদিন অপরাহ্নে, রবীন্দ্রনাথ উদয়নের দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ আচার্যদেবের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। প্রায় ঘণ্টা-

খানেক তিনি নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। তারপর কতকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ইঙ্গিতজ্ঞ আচার্যদেব বুঝলেন এবার তিনি ক্লান্ত হয়েছেন, সুতরাং বিদায় নেওয়া উচিত।

প্রণাম করে আমরা বিদায় নিচ্ছি—এমন সময় অকস্মাৎ মুষলধারে বর্ষণ শুরু হলো। আমাদের আর বিদায় নেওয়া হলো না।

প্রায় চুপচাপ বসে আছি। রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি তাঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলছেন। হঠাৎ ভেতরের দিক থেকে শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তীর প্রবেশ। তিনি সেই বিকেলের ট্রেনে নেমেছেন এবং নেমেই কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—"অমিয়!"

তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হলো। কোথায় গেল বৃদ্ধের ক্লান্তি! কোথায় গেল তাঁর অবসাদ! 'উজ্জীবিত'—কথাটার অর্থ অক্ষরে অক্ষরে বোধগম্য হলো।

পুনরায় ঘণ্টাধিক কাল কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল। হাস্যোজ্জ্বল মুখে উভয়ের আলাপ চলল। আমরাও সেই হাসি আনন্দের ভাগ পেলাম।

সেদিনের সেই আলাপের মধ্যে কয়েকটি মজার কথা নিয়ে হাস্য পরিহাস চলে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো কবি (লেখক বা লেখিকা) অনেক কাল্পনিক কথা লিখেছিলেন। যেমনঃ

"প্রভাতে সুকণ্ঠী তরুণীগণ গান গেয়ে কবির ঘুম ভাঙান। স্নানের পূর্বে তাঁরা তাঁদের সুকোমল করপল্লবে কবির দেহে তৈল মর্দন করেন—সুগন্ধি জলে স্নান করান—"এমনি বা এই ধরনের অনেক কথা।

রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে বললেন—"কল্পনা করতে মন্দ লাগে না। হ'লে তো ভালই হতো। কিন্তু এ জন্মে আর হলো না।"

তাঁর বলার ভঙ্গিতে আমরা হেসে উঠলাম।

যা হোক, সমধর্মী কাকে বলে সেদিন তা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলাম। এমন একজন সমধর্মীও শেষবয়সে কবিকে ছেড়ে যান। এ যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কত দুঃখদায়ক—তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

জয়শ্রী, চৈত্র, ১৩৭৪

ক বি র চ ক্ষে বি প্ল বী ত রু ণ

অমৃতের পুত্র মোরা—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

—বক্‌সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)
রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য়, পৃ ৮৯৬

সন্ধ্যাবেলায় উদয়নের চত্বরের দক্ষিণ-পূর্বকোণে আবছা আলো-অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়, শিষ্য (লেখক) সহ সেখানে নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করলেন।

কবি দেশকর্মীদের দুঃখবরণের কথা তুললেন। তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই বলে চললেন—"তাদের সঙ্গে এদের তুলনা হয় না। সে কী সহ্যশক্তি! কী আশ্চর্য মনোবল! সে যে না দেখেছে সে বুঝবে না।"

সেকালের বিপ্লবীদের এবং একালের অহিংস স্বদেশকর্মীদের নির্যাতনের প্রসঙ্গে তিনি ঐ মন্তব্য করলেন। তিনি যেন স্বয়ং অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন—এমন ভাবে কথা বলছিলেন।

আচার্য যেখানে নীরব শ্রোতা সেখানে তাঁর অন্তেবাসী আমি প্রশ্ন করব কি? অবাক বিস্ময়ে শুনে গেলাম।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাস। রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন ভালো

যাচ্ছিল না। স্বাস্থ্যোদ্ধোরের জন্য তিনি দার্জিলিঙ যাবেন মত করেছেন —এমন সময় (১৩ই অক্টোবর) হিজলীর বন্দীশালায় 'কপট রাত্রিছায়ে' 'নিঃসহায়' তরুণদের উপর শ্বেতাঙ্গ প্রহরীদের গুলিচালনা। দুজন বন্দী নিহত এবং অনেকের আহত হবার সংবাদ এলো।

সে রাত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘুমুতে পারেননি। সকালে বললেন—"সমস্ত রাত বুকের উপর কে যেন হাতুড়ি পিটেছে! এ কী অত্যাচার। নিরস্ত্র নিঃসহায় বন্দীদের রাত্রির অন্ধকারের আবরণে এমনি করে হত্যা! এ কী বর্বরতা!"

অসুস্থ শরীরেই তিনি কলকাতা গেলেন। সেখানে ময়দানের বিরাট জনসমাবেশে তিনি তাঁর অন্তরের বেদনা প্রকাশ করলেন। দেশ-শাসকের প্রতি তাঁর ধিক্কার জানালেন।[১]

তাঁর সেই অন্তরের আবেগ যে-অনুপম ভাষায় যে-অপূর্ব ভঙ্গিতে পরে কাব্যরূপে নিস্যন্দিত হয়—তা এখানে উল্লেখযোগ্য:

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে!

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,

---

১ এই সময় এক ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রহরী (warder) -দের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করা হচ্ছিল। পত্রিকার বক্তব্য—এইসব বন্দী ছোকরার দল প্রহরীদের স্নায়ুর উপর ক্রমাগত এমনি চাপ দিচ্ছিল যে তাদের ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছিল। হাজার হোক—তারা মানুষ তো (They certainly cannot be expected to retain judicial calm")

Statesman পত্রিকায় (শ্রী অমল হোমের মাধ্যমে) রবীন্দ্রনাথ (২রা নভেম্বর) একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠান। সেই পত্র সম্পাদক Sir Alfred Watson ফেরত পাঠান।

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

রবীন্দ্র রচনাবলী ২য়, পৃঃ ৮৯২
পৌষ, ১৩৩৮ (১৯৩১-৩২)

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সময়কার কথা।

আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এসেছেন কলকাতা থেকে। অপরাহ্ণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিলেন।

কবির কাছে গিয়েই চোখে পড়ল—সেদিনকার খবরের কাগজ তাঁর হাতে। শাস্ত্রীমহাশয়কে দেখেই বললেন—"আজ মন বড় ব্যথিত। সুভাষের জয়কে মহাত্মাজী বলেছেন—তাঁর পরাজয় "my defeat !"

"সুভাষ তাঁর পুত্রের মতো। তার জয়কে তিনি নিজের পরাজয় মনে করেন কেমন করে ?···

"আমার শ্রদ্ধার আসন থেকে তিনি যেন আজ অনেকটা নেবে গেলেন।[২]

—জয়শ্রী, নেতাজী সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০

---

২ নানা মতভেদ সত্ত্বেও মহাত্মাজীকে তিনি যে কী শ্রদ্ধা করতেন—যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ তাঁরা জানেন। তাঁর বহু রচনার মধ্যেও তা প্রকাশিত ("মহাত্মা গান্ধী"—রবীন্দ্ররচনাবলী-শতাব্দীসংস্করণ ; ১১শ খণ্ড, ৪৪৩-৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁর সেদিনের সেই বেদনা, সহৃদয়-সংবেদনীয়।

পূজার বেদীতে কবি

●

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে, তাঁকে পূজার বেদীতে বসাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। হয়েছিল তাঁর বিশ্বভারতীতেই। তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তদের অবচেতন মনেই এই ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে সামান্য একটু উৎসাহ পেলেই, তাঁদের সেই চেষ্টা সফল হতো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা তাকে নিরস্ত করে।

সঠিক সাল মনে নাই। (১৯৩৮-৪০ এ) রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত আম্রকুঞ্জে।

বিস্মিত চক্ষে কর্মসূচী পড়লাম: 'শ্রীশ্রী……গুরুদেবের…… তম জন্মোৎসব……' ইত্যাদি।

জন্মোৎসব শেষ হতে না হতেই একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাদের হাত থেকে ঐ কর্মসূচী প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তা নষ্ট করে ফেলা হয়।

ক্বচিৎ কোথাও, কারো কাছে আজও হয়ত তার একআধখানা থাকতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ভর্ৎসনা লাভ করে কর্মকর্তাগণ জন্মোৎসবের ঐরূপ ছাপানো কর্মসূচী নষ্ট করতে বাধ্য হন।

২

শ্রীনিকেতনের উৎসব। বাৎসরিক উৎসব, না হলকর্ষণ মনে নাই। সাঁওতাল বালকেরা অপূর্ব সাজে সজ্জিত। পরনে লাল কাপড়। তার

উপর লাল জবার অলংকার, সেই নিকষ-কালো দেহসৌষ্ঠবকে আরো সুন্দর করেছে।

দেখা গেল—শ্রেণীবদ্ধ সেই সাঁওতাল বালকগণ একে একে রবীন্দ্রনাথের চরণে লাল জবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেল।

আমাদের কারো কারো এটা একেবারেই ভালো লাগেনি।

সেদিন অপরাহ্নেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলাম। বললাম:

"এবার তো আপনার পূজা শুরু হয়ে গেল—"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন:

"তুই ছিলি সেখানে? দেখলি ব্যাপারটা। বুড়ো হয়েছি। অসহায়। এবার এরা যা-খুশি তাই করবে।"

আমার এবং আরো কারো কারো যে এটা ভালো লাগেনি—তা জেনে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

৩

মৃত্যুর পরে যা ঘটল—তা তাঁর মতবিরুদ্ধ হলেও নিষেধ করবে কে? যাঁরা তা পছন্দ করেননি—তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। পদমর্যাদাতেও নগণ্য।

'রবীন্দ্রনাথের চিতাভস্ম একটি সুদৃশ্য আধারে করে' কলকাতা হতে শান্তিনিকেতনে আনা হলো। সে-দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কেউ অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি। অনেকেই সশব্দে রোদন করেছেন। কেউ বা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

আশ্রমসচিব সুরেন্দ্রনাথ, ধীর, শান্তগতিতে সেই ভস্মাধার মস্তকে ধারণ করে, হিন্দিভবন, চীন ভবন, দিনেন্দ্র-চা-চক্র, বেনুকুঞ্জ, পাকশালা, ছাপাখানা, ছাতিমতলা পার হয়ে উত্তরায়ণে প্রবেশ করলেন। দুদিকে সারিবদ্ধ, শ্রদ্ধাবনত রোরুদ্যমান নর-নারী।

উদয়নের আঙিনায় সকলে মণ্ডলাকৃতিতে দণ্ডায়মান। নীরব নিস্পন্দ হয়ে তাঁরা পরলোকগত, পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়জনের উদ্দেশে

শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কিছুক্ষণ পর কর্তৃপক্ষের এক প্রতিনিধি বললেন ঃ

"প্রণাম করে এবার আপনারা সব ঘরে ফিরে যান।"

সজল আঁখি একজন কি দুজন (?) ছাড়া অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনবাসী নরনারী সেই ভস্মাধারকে প্রণাম করলেন।

রবীন্দ্রনাথের সেই চিতাভস্ম, রবীন্দ্রসদনে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এখানে বলা আবশ্যক রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবী এবং কন্যা শ্রীযুক্তা মীরা দেবী এইভাবে এই ভস্মরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা চান—ঐ ভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হোক।

কিন্তু ঐ ভস্মাধার এখন বিশ্বভারতীর সম্পত্তি। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, সম্ভবত জনমতের ভয়ে, তা গঙ্গায় বিসর্জন দিতে ইতস্তত করছেন।

শান্তিনিকেতনে এইভাবে তাঁর পিতার বা তাঁর নিজের চিতাভস্ম রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের মতবিরুদ্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পাঠ হতে তা পরিষ্কার হবে ঃ

"তাঁর (মহর্ষির) চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মে কর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে; গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে……।

"এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল—তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব।

"তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস করতেন……একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক ষ্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন,

"দেখো আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে

সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধি রচনা করতে দেবে না।

"আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত-শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দ রূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি।"

("সামঞ্জস্য"—শান্তিনিকেতন)

'গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলা'—পিতাপুত্র উভয়েরই কাছে নিন্দনীয় ছিল। যদিও শান্তিনিকেতনে চিতাভস্মের সমাধি রচনা করা হয়নি, তবু চিতাভস্ম এইভাবে সযত্নে রক্ষা করাও প্রশংসনীয় বলে মানতে পারি না।

সেই অসাধারণ রূপবান্ সুদর্শন, সুগঠিতদেহ, সুকণ্ঠ পুরুষের চিতাভস্মকে এইভাবে আঁকড়ে ধরে রাখা—তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের অনেককেই পীড়া দিচ্ছে।

—নবজাতক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৭৬।

কবি ও সংস্কার-সমিতি

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি তরুণ ছাত্র একটি সমিতি গঠন করেন। তার নাম দেন তাঁরা 'সংস্কার সমিতি।'[১] সমস্ত (কু-) সংস্কার ত্যাগ করবেন এই ছিল তাঁদের প্রতিজ্ঞা।

'সংস্কার সমিতির' পাণ্ডাদের অনেকেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে অন্নগ্রহণ তাঁদের বংশে কেউ কখনো করেননি। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ তো সে-বংশে কল্পনারও অতীত ছিল। এমনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তানেরাও সর্বজাতির হস্তে অন্নগ্রহণ, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি বহু ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁদের 'সংস্কার সমিতি' কেবল হিন্দু নয়, হিন্দু মুসলমান, খ্রীস্টান, যে-কোনো সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হলো।

'সংস্কার সমিতির' উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে তাঁরা সর্বসম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানালেন। তাঁদের সেই আহ্বান-বাণীর কিয়দংশ বহুচেষ্টায় উদ্ধার করা গেছে। এখানে তা দেওয়া হলো ঃ

"সর্বপ্রকার অকল্যাণকর সংস্কার ছিন্ন করিয়া এবং সর্বশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া, এই শ্রেয়সী 'সংস্কার সমিতি' যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নিজযুক্তির বিরোধী হইলে এই 'সংস্কার সমিতি' সকলের এমন কি পরব্রহ্মের অনুশাসনও (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র) অগ্রাহ্য করে।

---

১ সকলপ্রকার সংস্কারকে সংস্কার করবার জন্য যে-সমিতি—তাই 'সংস্কার-সমিতি।'

"হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও ইসলামধর্মী সকলকেই এই 'সংস্কার সমিতি' আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সকলের অধিকার আছে।

"সংস্কারের দ্বারা আবিল বুদ্ধি মলিন দর্পণের ন্যায়। সেই বুদ্ধিকে বিমল করিলে তাহাতে আলোক প্রকাশিত হয়।"[২]

স্থির হলো—সমিতির আজীবন সভ্য (Life member)-দের একটা কঠিন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ হিন্দুকে 'গোমাংস' এবং মুসলমানকে 'শূকর মাংস' ভক্ষণ করতে হবে।

খ্রীস্টানকে কোন্ মাংস ভক্ষণ করানো হবে—সে-সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হলো। সমিতির প্রধান যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—'খ্রীস্টানকে বাদুড়ের মাংস খেতে দেওয়া হোক।' আর একজন বললেন—'নাঃ। কাঠবেড়ালীর মাংস।' অন্য আর একজন বললেন—'ইঁদুরের মাংস।'

সৌভাগ্যের বিষয়, সে সময় কোনো খ্রীস্টান ছাত্র সভ্যপদপ্রার্থী ছিলেন না। তাই খ্রীস্টান সম্বন্ধে নিষিদ্ধ মাংসের ব্যবস্থা, তখনকার মতো স্থগিত রইল।

সংস্কার সমিতিতে একটিমাত্র মুসলমান ছাত্র সভ্যপদপ্রার্থী। সে কিন্তু নিরামিষাশী—মাদ্রাজী মুসলমান। কর্তারা ব্যবস্থা দিলেন—আপাতত যে-কোনো মাংস একদিনের জন্য ভক্ষণ করলেই তাঁকে 'সভ্য' করা যাবে। তাঁকে আমরা 'সভ্য' করলাম—কিন্তু তাঁর নাম (খোদাগরজী) মাত্র আমাদের খাতাতে রইল, তিনি আমাদের ছেড়ে গেলেন!

হিন্দু সভ্যই বেশি। তাঁদের জন্য গোমাংসের ব্যবস্থা দেওয়া হলো। ছুটির দিনে বাজারে গোমাংস ক্রয় করতে এক সভ্যকে পাঠানো হলো। তিনি পূর্বেই বহু সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন। বাদুড়, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, ব্যাঙ, অনেক কিছুই তিনি উদরস্থ করেন। কেবল গোমাংস না পাওয়ায়, তা ভক্ষণ করতে পারেননি।

তিনি এবং আমি দুজনে মাংস জোগাড়ের ভার নিয়েছিলাম। কিন্তু

২ এই 'আহ্বান-বাণী' সংস্কৃত, বাংলা, ইত্যাদি একাধিক ভাষায় প্রচারিত হয়।

দুঃখের বিষয় বোলপুর বাজারে 'গোমাংস' পাওয়া গেল না।

এখন কি করা যায়? ঠিক করলাম—খাসির মাংস বড় বড় টুকরায় কাটিয়ে 'গোমাংস' বলে চালাব।

সৌভাগ্যবশত, আমাদের মধ্যে কেউ গোমাংস চিনতেন না। সুতরাং সেই বড় বড় মাংসখণ্ডগুলিতে হলুদ মাখিয়ে আমরা তা 'বাছুরের মাংস' বলে প্রচার করলাম।

এতেই অনেকে কেটে পড়লেন। এই 'কেটে পড়া' দলে অনেক উৎসাহী কর্মী এবং বক্তা ছিলেন। তাঁরা 'সংস্কার সমিতির' আদর্শ প্রচারে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তাঁদের যাতে একেবারে না হারাই —তারই জন্যে, আমরা তিন প্রকার সভ্য নির্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

সভ্যদের শ্রেণী তিনটির সংজ্ঞা যাতে সাধারণের বোধগম্য হয়— তার জন্য আমরা অত্যন্ত সরল ও চলতি বাংলা শব্দ ব্যবহার করি। আজ একথা স্বীকার করতে বাধা নাই, সেই সংজ্ঞাগুলি নিতান্ত হাস্যকর হয়েছিল।[৩] যাহোক সেগুলি এখানে লিপিবদ্ধ হলো ঃ

১. মহাচূড়ন্ত[৪] (আজীবন সভ্য—বা Life member)

---

৩ আমরা এখন বৃদ্ধ এবং প্রবীণ। কিন্তু একদিন আমরা বালক এবং তরুণ ছিলাম। বৃদ্ধ ও প্রবীণ পাঠকগণ, তাঁদের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, বাল্যখিল্যদের এই চাপল্য আশা করি স্নেহপূর্ণ মার্জনার চক্ষে দেখবেন।

৪ "সংস্কারসমিতিতে" সে-সময়, মাত্র পাঁচজন মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "মহাচূড়ন্ত" সভ্যের পদ লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রায় সবাই আজ দেশবিখ্যাত। এখানে তাঁদের নাম দেওয়া গেল।

১. শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (দেশকর্মী, কবি, সাহিত্যিক, ও শিল্পী)
২. শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী (এখন স্বনামধন্য সাধক, শিল্পী এবং কবি— শ্রীনিশিকান্ত)
৩. শ্রীরামকিংকর বেইজ (স্বনামধন্য শিল্পী—"রামকিংকর")
৪. শ্রীপুলিনবিহারী সেন (রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ গ্রন্থন বিভাগ, বিশ্বভারতী)
৫. শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)

২. চূড়ন্ত (সাধারণ সভ্য—বা Ordinary member)

৩. উড়ন্ত (অস্থায়ী সভ্য বা Associate member)

যাঁরা চূড়ান্তভাবে সংস্কার সমিতিতে যোগ দিতে পারেননি—'তাঁরাই উড়ন্ত সভ্য' অর্থাৎ কি না, মন যাঁদের 'উড়ু' 'উড়ু' করছে।

'উড়ন্ত' শব্দের সঙ্গে মিল রেখে কেউ কেউ চতুর্থ শ্রেণীর আর একপ্রকার 'সভ্য' করার প্রস্তাব আনলেন—তাঁরা তাদের নাম দিতে চাইলেন—'পুড়ন্ত'। আমরা অধিকাংশ সভ্য ওটা বাতিল করে দিলাম। অবশ্য বাতিল করার আগে, ঐ নামের অর্থ ব্যাখ্যার সুযোগ তাঁদের দিলাম।

তাঁরা বললেন "'পুড়ন্ত' অর্থাৎ যাঁরা পুড়ছেন। নিজেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে যাঁরা অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন। এর পরই তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করে সংস্কার সমিতিতে যোগ দেবেন।"

আমরা বললাম—"কে কে পুড়ছেন, তা যাঁরা পুড়ছেন, তাঁরাই জানেন। আমাদের জানবার কথা নয়। কেননা, আমরা এখনও অন্তর্যামী হতে পারি নাই। অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়াটা ভিতরের ব্যাপার। এরপর যখন তাঁরা সংস্কার ত্যাগ করবেন, তখন তো 'সভ্য' হবার জন্য আমাদের কাছেই আসবেন। সেই সময় ঐ তিন শ্রেণীর যে-কোন একশ্রেণীতে তাঁদের ভর্তি করা যাবে।"

'পুড়ন্ত' সভ্য আমাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত না হলেও আমাদের আলোচনার বহির্ভূত ছিলেন না। আমরা প্রায়ই কারো কারো সম্বন্ধে ঐ সংজ্ঞা প্রয়োগ করতাম।

এদিকে কিন্তু হুলস্থূল ব্যাপার। শান্তিনিকেতনেও যে-এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, তা আমাদের ধারণা ছিল না। সমিতির সভ্যগণ 'গোমাংস' ভক্ষণ করেছেন এ সংবাদ আগুনের মতো সর্বত্র প্রবলবেগে প্রসারিত হলো—এক বৃহৎ এবং প্রবল গোষ্ঠী, সমিতির সভ্যদের উপর নিদারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের ধারণা—এইরূপ কালাপাহাড়দের মহর্ষি-

প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে স্থান দেওয়া যায় না। সুতরাং অবিলম্বে তাদের বিতাড়িত করতে হবে।

এই বিরুদ্ধ দলের একজন, পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ের[৫] শরণাপন্ন হলেন। ঐ ব্যক্তি এককালে 'সংস্কার সমিতির' একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। গোমাংস দেখে 'কেটে' পড়েন।

হিন্দুসন্তানের—বিশেষত, বাংলার প্রসিদ্ধ আচারনিষ্ঠ সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ পরিবারের এক সন্তানের 'গোমাংস ভক্ষণ' শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে অতি ভয়ংকর অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় শিষ্য মঠজ্যেষ্ঠ (Hostel Superintendent) গোস্বামীকে[৬] ডেকে পাঠালেন। গোস্বামী আসামাত্র নিদারুণ বর্ষণ শুরু হলো। তীক্ষ্ণ, কঠোর, কটু, তিক্ত, বাক্যধারার অবিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ! মিনিট পনেরো গোস্বামী মুখ খুলবার অবসরই পেলেন না।

অবশেষে শাস্ত্রীমহাশয় যখন পরিশ্রান্ত হয়ে নিবৃত্ত হলেন, তখন গোস্বামী বললেন—"জগদানন্দবাবু[৭] জানিয়েছেন—বোলপুরে 'গোমাংস' পাওয়াই যায় না। সুতরাং কেউই 'গোমাংস ভক্ষণ' করেন নি। ছাগমাংসকেই তাঁরা গোমাংস বলে প্রচার করেছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় তাতেও বিশেষ শান্ত হলেন না। তিনি উত্তেজিতকণ্ঠে বলে চললেন—"হিন্দুর ছেলে অন্য মাংসই বা 'গোমাংস' বলে খায় কেমন করে? সংস্কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী এবং প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিকল্প মুখুজ্যেমহাশয়ের বংশধর—এরা এমন কাজ করল কেমন করে? এইরূপ অনাচারে সমস্ত তীর্থস্থানগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। এই

---

৫ আচার্য পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, তদানীন্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাভবন (Post-graduate Research Dept.)।

৬ পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী (বিদ্যাভবনের প্রবীণ গবেষক)।

৭ শ্রীজগদানন্দ রায়—"গ্রহনক্ষত্র" প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতা—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রবীণ অধ্যাপক, Bolpur Union Board-এর Chairman

পবিত্র আশ্রমটিও নষ্ট হতে চলেছে। আমি এখনই গুরুদেবের কাছে যাচ্ছি!"

গোস্বামী সবিনয়ে জানালেন—"গুরুদেবের কাছে গিয়ে কিছু লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এইরূপ নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ব্যাপারকে গুরুদেব তেমন গুরুত্ব দেবেন না।"

শাস্ত্রীমহাশয়কেও সেকথা স্বীকার করতে হলো। অতঃপর তিনি কি করবেন—কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে একজন উৎসাহী আদর্শবাদী শিক্ষক তাঁর বন্ধু এক অতি পুরাতন শিক্ষকের গৃহে উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করলেন। গৃহস্বামী তখন সপরিবারে চায়ের টেবিলে। উত্তেজিত আগন্তুক ঝড়ের বেগে বলে চললেন—"আপনারা এখানে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চা খাচ্ছেন—এদিকে যে আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র 'বিফ' (Beef) খেয়েছে—তার খবর রাখেন?"

বাড়ীর গৃহিনী শুনলেন—"বিষ খেয়েছে!" তিনি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বললেন "বিষ খেয়েছে তো আপনি এখানে কিজন্যে এসেছেন? যান যান, দেখুন গিয়ে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কিনা—এবং চিকিৎসা হচ্ছে কিনা!"

আগন্তুক বললেন—"আরে না না! বিষ নয়—বি—ফ (Beef)।"

ভদ্রলোক বললেন—"বাঁচা গেল! যা ভয় পেয়েছিলাম! তাই বলুন বিষ নয় 'বিফ'।"

গৃহস্বামী ব্রাহ্ম[৮]; 'বিফ' খাওয়ার কথায় তাঁর মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা এলো না। তিনি হেসে বললেন—"আরে 'বিফ' খেয়েছে তো কি হয়েছে?"

আদর্শবাদী আগন্তুক নিতান্ত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড উত্তেজনা নিতান্তই নিষ্ফল হলো।

---

৮. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক ও তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক—অধুনা স্বনামধন্য)।

"সংস্কারসমিতির মহাচূড়ন্তগণের" কোনো ক্ষতিই তাঁরা করতে পারলেন না। সমিতির সভ্যগণ অধিকতর উৎসাহে তাঁদের সংস্কার ভাঙার কাজ করে চললেন।

অতঃপর স্থির হলো—স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ দুটি 'গর্হিত' কাজ তাঁরা একসঙ্গে করবেন। কাজ দুটি হলো—চণ্ডালের অন্নগ্রহণ এবং গ্রাম্য-শূকরের মাংস ভক্ষণ।

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত 'চণ্ডালকে' খুঁজে পাওয়া গেল না। হাতের কাছে পাওয়া গেল—তাঁদের চিরপরিচিত রসিক মেথরকে। তাকেই তখনকার মতো চণ্ডালের পদগৌরব দিয়ে অনুরোধ করা হলো—তার সহধর্মিণীর রান্না-করা শূকর-মাংস যেন সমিতির সভ্যগণকে সেরখানেক দেওয়া হয়। মাংসের দাম এবং তেল, ঘি, মসলার খরচ তাঁরা দেবেন।

রসিক বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। সংস্কার-সমিতির আদর্শের কথা সে তার নিজের মতো করে একপ্রকার বুঝেছিল। তাই এই পবিত্র সাধন-কার্যে পয়সা নিতে তার ঘোর আপত্তি।

সমিতির সভ্যরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রসিক যা যুক্তি দিল, তাতে দাম দেওয়া, বা খরচ দেওয়ার কথা আর তোলাই গেল না।

রসিক বলল—শূকর তার নিজের ঘরের। জীবনে কোনোদিন সে শূকর কেনেনি। তার ঠাকুরদাদার বাবা যা কিনে রেখে গেছলো—তাতেই তারা তিন পুরুষ বিনি পয়সায় মাংস খেয়ে আসছে।

আর মাংসে তেল, ঘি বা মসলা, তারা কোনোকালেই দেয় না। এক নুন দেয়। তা, তার আর কি বা দাম।

রসিক মেথর বা তার পরিবারের রান্না সেই বরাহমাংস দুজন মহাচূড়ন্ত এবং জনা দুই চূড়ন্ত[৯] সভ্য মিলে শ্রদ্ধাস্পদ 'তালধ্বজ'[১০] মহাশয়ের নিবাসে নিঃশেষ করলেন।

---

৯. এই চূড়ন্ত সভ্যদ্বয়ের একজন হচ্ছেন—শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন (বর্তমানে প্রখ্যাত সাংবাদিক)। প্রধানত এঁরই পরিকল্পনায় এবং এঁরই উদ্যোগে সেবারের সেই 'সংস্কারমেধযজ্ঞ' সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় (গ্রাম্য-)

সেদিন তো বিনি পয়সায় ভোজ হলো—পরদিন ভোজ দূরে থাক, ভোজনেরই প্রয়োজন হলো না।

শূকর মাংস যে এতদূর গুরুপাক—তা চূড়ন্ত, মহাচূড়ন্ত কোনো সভ্যেরই জানা ছিল না। ইতিহাসে তাঁরা পড়েছিলেন বটে, বৃদ্ধবয়সে শূকর মাংস ভক্ষণ করে বুদ্ধদেব মারাত্মক অসুখে পড়েন।

যৌবনেই সুস্থ, সবল সভ্যদের যা অবস্থা হলো, তাতে বৃদ্ধবয়সে কী হতে পারে—কল্পনা করতে অসুবিধা হলো না!

সৌভাগ্যের বিষয়, প্রৌঢ় তালধ্বজ মহাশয়কে মাত্র একটুকরো মাংস 'চাখতে' দেওয়া হয়েছিল—তাতেই তাঁর একদিনের রান্নার পরিশ্রম এবং খরচ বেঁচে যায়।

এইভাবে একটার পর একটা সংস্কারে আঘাত দিতে দিতে, সংস্কার-সমিতির সভ্যগণ স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হন। বিরুদ্ধ দলের বাধাদানকে তাঁরা আর তোয়াক্কা করেন না।

সংস্কারসমিতির সর্বশ্রেণীর সভ্যই প্রবল উৎসাহে নবাগত বিদ্বান ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে তাঁদের আদর্শ প্রচার করে চলেছেন। তরুণদের অনেকেই এখন সংস্কারসমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত—প্রবল বিরোধীপক্ষ ক্রমশ তাঁদের সমর্থক হারাচ্ছেন—এবং সেজন্য তথাকথিত আদর্শবাদী বিদ্যার্থী ও কর্মিগণ ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হয়ে পড়ছেন।

এমন সময় এলো ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস।

শূকর মাংস হিন্দুর পক্ষে 'গোমাংস' পর্যায়ের না হওয়ায়, নিতান্ত আগ্রহ থাকলেও সংস্কার-সমিতির কর্তৃপক্ষগণ এঁকে 'মহচূড়ন্ত' উপাধি দিতে পারেননি।

১০. শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরের পাশে, একটি দীর্ঘ তালবৃক্ষকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র গৃহ আছে—যার দেওয়াল মাটির এবং চাল খড়ের। রবীন্দ্রনাথ ঐ গৃহের নাম দেন 'তালধ্বজ'। এখানে গৃহস্বামী অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেনকে 'তালধ্বজ' বলা হয়েছে। ঐ গৃহে তিনি একাকী বাস করতেন এবং নিজ আহার্য নিজেই প্রস্তুত করতেন।

সারা ভারতব্যাপী প্রবল উত্তেজনা—মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করেছেন।

আশ্রমবাসিগণ দুঃখে, উদ্বেগে, মুহ্যমান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন; আমাদের দীর্ঘ আশ্রম-জীবনে তাঁকে এরূপ বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। আশ্রমের পুরনো কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের তিনি বার বার ডেকে পাঠাচ্ছেন; আমাদের কী কর্তব্য সেবিষয়ে আলোচনা করছেন। পুণা থেকে তারযোগে, সংবাদের আদান প্রদান চলেছে।

শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল না। সর্বজাতি, সর্বধর্মাবলম্বী একত্রে একস্থানেই তখন আহার করতেন।

তথাপি সমস্ত দেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আমাদেরও কিছু করা প্রয়োজন—একথা সকলেই অন্তরে অনুভব করছিলেন।

বিশ্বভারতীর প্রবীণ অধ্যাপকগণ বললেন—"আশপাশের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করা হোক। সমবেত গ্রামবাসীদের সেই সভায় আমরা সমাজিকভাবে হরিজনদের জলগ্রহণ করব।"

কর্মিগণ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। গুরুদেবও এতে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, মহাত্মার প্রায়োপবেশনের দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হলো। গুরুদেব তাঁদের উদ্দেশে সেদিন যা বলেছিলেন, দেবী বাগীশ্বরীর কণ্ঠের ন্যায় তাঁর সেই বাঙ্ময় কণ্ঠ হতেও এমন অমৃতনির্ঝর সুলভ ছিল না। সেদিন সে বাণী যে শুনেছে, সে ই তার সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথরের হাতে জলগ্রহণ করেছে। আচারনিষ্ঠ বিধবাগণ পর্যন্ত, সেদিন চোখের জলের সঙ্গে তাঁদের আজন্ম সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। গুরুদেবের সেই অভিভাষণের কিছু পূর্বে কেউ যা কল্পনাও করেননি, তাই ঘটতে দেখেছিলাম।

৪ঠা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপকগণ যখন ঐরূপ সামাজিকভাবে হরিজন-হস্তে জলগ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন বিশ্বভারতীর প্রগতিপন্থী তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ সে-প্রস্তাবে তেমন খুশি হন নাই। তাঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু করতে ইচ্ছুক। সুতরাং ঐ প্রস্তাব শোনামাত্র, তাঁরা বর্তমান লেখককে তাঁদের মুখপাত্র করে গুরুদেবের কাছে পাঠালেন।

গুরুদেবকে বললাম—"ছাত্রছাত্রীগণ কেবলমাত্র 'জলচলে' সন্তুষ্ট নন।।"[১১]

তিনি তখন আমাদের কী ইচ্ছা—তা জানতে চাইলেন। বললাম—"সাধারণ পাকশালায়—যেখানে পাচক ব্রাহ্মণগণ পাক করেন, সেখানে আগামীকাল রাত্রে মেথরেরা পাক করবে। তাদের সেই পাক করা অন্ন, তারাই পরিবেশন করবে এবং সমস্ত আশ্রমবাসী তা গ্রহণ করবে।"

গুরুদেব প্রফুল্লচিত্তে সম্মতি দিলেন।

৫ই আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে, যেদিন বিশ্বভারতীর সিংহসদনে হরিজনহস্তে জলগ্রহণ করা হয়, সেই দিন রাত্রে, পাকশালায় মেথরের হাতে অন্নগ্রহণ করা হলো। শান্তিনিকেতনেও এ খুব সহজে হয় নাই। যাঁরা সর্বজাতির অন্নগ্রহণে অভ্যস্ত তাঁরাও মেথরের অন্ন-গ্রহণে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন।

যাই হোক, সেদিন রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্মিমণ্ডলী সপরিবারে ঐ সর্বজনীন ভোজে যোগ দিলেন। মেথরগণ তাঁদের স্বহস্তে পক্ব অন্ন (খিচুড়ি) সকলকে পরিবেশন করল।

---

[১১] কেবলমাত্র 'জলচলে' সন্তুষ্ট না হলেও, যাতে ঐ 'জলচল' সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার জন্য সংস্কারসমিতির সভ্যগণ জনে জনে আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিদের —বিশেষত বিধবাদের নিকট গিয়ে, করজোড়ে আবেদন করতে থাকেন। গুরুজনদের চরণ ধরে অনুনয় করেন। সন্তানস্থানীয়দের এই করুণ আবেদন ও অনুনয় বিনয়, তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু পরদিন এক নতুন বিপদ উপস্থিত হলো। পাকশালার দাসদাসীরা কাজ করবে না। ব্রাহ্মণ পাচকগণ কাজে যোগ দিল—কিন্তু হরিজন ঝি-চাকরের দল এলো না।

নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে তাদের বাস। সেখানে গিয়ে আমরা বহু সাধ্যসাধনা করলাম। কিন্তু তারা অটল। মেথরেরা যে বাসন ছুঁয়েছে—সে বাসন কেবল সেদিন নয়, কোনদিনই তারা (হাড়ি, ডোম, বাউরি, মুচিরা) মাজবে না। শুধু তাই নয়, ঐ পাকশালাতেই তারা আর ঢুকবে না।

কর্তৃপক্ষ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তরুণদের নেতারা বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না তারা বলল—"আমরাই বাসন মাজব। শুধু একদিন নয়—দিনের পর দিন।"

তাদের সেই অটল প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা দেখা দিল।

হাসিমুখে দিনের পর দিন তারা ঐ বিরাট পাকশালায়, বৃহদাকার হাঁড়ি, ডেকচি, কড়াই প্রভৃতি দুবেলা মেজে যেতে লাগল।

কিন্তু বেশিদিন তা করতে হলো না। ঝি-চাকরেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ঐ পাকশালা তাদের জীবিকার উৎস। সমস্ত পরিবার পোষণ হয় ওখানকার অন্নে। কদিন তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে ? তাছাড়া, তাদের আশঙ্কা হলো—অন্য জায়গা থেকে লোক আসবে।

একে একে, সকলেই এসে তাদের কাজে যোগ দিল।

৭ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে, গুরুদেব বিশ্ব-ভারতীর কর্মীদের এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উত্তরায়ণের 'উদয়নে' আহ্বান করেন। গ্রামে গ্রামে, অস্পৃশ্যতাবর্জন ও হরিজন উন্নয়নের জন্য—আমরা কী করতে পারি—এই ছিল সেদিনের আলোচ্য বিষয়।

বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হলো—একটি সমিতি গঠন করা হোক—যার সভ্যেরা গ্রামে গ্রামে কি ভাবে ঐ কাজ করা যায়—তার

পদ্ধতি নির্ণয় করবেন। এবং নির্ণীত পদ্ধতি অনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করবেন। ঐ সভাতেই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন—প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন —বিদ্যাভবনের গবেষক ছাত্র শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্তমান লেখক)।

সমিতির নাম কী হবে—তাই নিয়ে বহুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগল, অবশেষে তরুণদের নায়ক বললেন—"সংস্কার সমিতি নামে আমাদের একটি সমিতি—পূর্ব হতেই ঐ ধরনের কাজ করে আসছে—ঐ নাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন, তা হলে আমরা ঐ সমিতি উঠিয়ে দিয়ে একত্রে কাজ করি।"

সভায় বজ্রপাত হলেও সভ্যগণ হয়ত ততটা চমকে উঠতেন না। আমাদের এই আচম্বিত প্রস্তাবে সেই সভায় উপস্থিত অনেকেরই মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল—গুরুদেবের ভাষাতেই তার বর্ণনা দিই ঃ

> "মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
> পতঙ্গের মতো—সবে বিস্ময়বিকল,
> কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
> লজ্জাহীন 'পাষণ্ডের' হেরি অহংকার।"

প্রবল বিরোধীদলের প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও গুরুদেব প্রগতিপন্থী তরুণদের প্রস্তাবই গ্রহণ করলেন। ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর 'সংস্কারসমিতি' পুনর্জন্ম গ্রহণ করল। তরুণদের আগ্রহে গুরুদেব এই 'সংস্কারসমিতির' পৃষ্ঠপোষক (patron) হলেন।

মহাত্মাজীর উপবাসের কিছুদিন পূর্ব হতে শান্তিনিকেতনে 'কালের যাত্রা' নামক রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি নাটকের মহড়া চলছিল। নাটকটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—

জগন্নাথের রথযাত্রা। রথ টানা হচ্ছে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রথ চলছে না। ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে টানছেন। ক্ষত্রিয় বীরেরা যোগ

দিয়েছেন। বৈশ্য বণিকগণ তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন—তথাপি রথ অচল।

অবশেষে যখন সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবজ্ঞাত নিপীড়িতের দল এসে রথের রসি ধরল—তখন রথ চলল।[১২]

---

১২ 'কালের যাত্রা' নাটকে 'কবির' ভূমিকা স্বয়ং কবিই গ্রহণ করেছিলেন। কয়েকদিন মহড়া চলার পর খেয়ালী কবি হঠাৎ আমাকে 'কবি'র পার্ট করতে বললেন। আমি হতভম্ব। জনতার মধ্যে এক সাধারণ ভূমিকা মাত্র আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই আমাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পার্ট দিতে চাচ্ছেন—এও কি সম্ভব?

আমি প্রবল আপত্তি জানালাম। রবীন্দ্রনাথ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন:

"তোর ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ওদের (পতিতদের) উপর পড়ুক।"

এর পর আর কথা বলা গেল না।

লাইব্রেরীর বারান্দায় 'কালের যাত্রা' উপর্যুপরি দুদিন (৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর) অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্তক্ষণ 'মঞ্চের' এক পাশে বসে অভিনয় দেখেছিলেন।

মনে আছে দ্বিতীয় দিন ক্ষণেকের জন্য পার্ট ভুলে গেছলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, হয়ত আর বিশেষ কারো তা লক্ষ্যগোচর হয়নি।

'কালের যাত্রা'-র সমস্ত অভিনয়, মোটের উপর ভালোই হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। নাটকটির 'দর্শনী' লব্ধ অর্থ (১৯০) সংস্কার-সমিতির তহবিলে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য—৪ঠা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) এবং ৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন সেই বাঙলা ভাষণ দুটি প্রথমটির ইংরেজি অনুবাদ, অনশন উপলক্ষে মহাত্মাজীর সঙ্গে 'তারের' আদান-প্রদান, Message on Mahatmaji's birth day প্রভৃতি প্রবন্ধ —*Mahatmaji and the Depressed Humanity* এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের স্বত্ব সংস্কারসমিতিকে দেওয়া হয় (Proceeds from the sale of this book will go to the SAMSKARA-SAMITI, VISVA-BHARATI, for helping in its work of removing untouchability.)

মহাত্মাজীর উপবাসের সময় তরুণ অধ্যাপকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন—"এই সময় নাটক অভিনয় করা বা তার রিহার্সেল দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?"

৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, দুপুর বেলা, মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে পাকশালার দিকে রওনা হয়েছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জরুরী আহ্বান এলো।

উত্তরায়ণে প্রবেশ করে দেখি—রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ—'কোনার্কের' বাইরের বারান্দায় তাঁর টেবিলের উপর একখানি সাদা তুলট কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে:

"এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা মানিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

গভীর মনোযোগের সহিত লেখাটি পড়ছি—এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। তাঁর তখনকার সেই মূর্তি কোনদিন ভুলব না।

পূর্বেই বলেছি, মহাত্মার উপবাসের সময় তিনি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম—তা সারাজীবনে আর কখনো দেখিনি।

তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রূকুটি-পূর্ণ। শরীর কম্পমান। সেই 'ভীষণ মধুর' অপরূপ রূপের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ে আছি—সহসা বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো:

"মহাত্মাজীর উপবাসে আমি অভিনয় করছি, তাঁর বেদনা আমাকে স্পর্শ করেনি—করেছে তোমাদের কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের।

"এ নাটকটা কী—তারা কি তা বোঝে না!

"এই নাটকের রিহার্সেলে যারা দোষ দেখে—রতনকুটিরে সন্ধ্যে-বেলায় তাদের প্রতিদিনের 'ব্রিজ খেলা' কি বন্ধ হয়েছে?"

অপরাধীর ন্যায়, ভয়ে, উদ্বেগে, কম্পিত হৃদয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তিনি সেই লিখিত তুলট কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,

"যাও। নিয়ে যাও।[১৩] তোমাদের ঐ অধ্যাপকদের কাছে! এই 'প্রতিজ্ঞাপত্রে' সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?"

অত্যন্ত ভীত স্বরে প্রশ্ন করলাম: "আমি সই করব!"

তিনি বললেন—"তোকে করতে হবে না। তোর উপর আমার সে বিশ্বাস আছে। যাদের কথা বলছি—তাদের সই নিয়ে আয়।"

হায় ভগবান। সেকালের প্রাচীন, সরল, অকপট মানুষ। মনে তাঁর এ সন্দেহ কখনো জাগেনি যে—এখানে আমরা অম্লান বদনে, অকম্পিত হস্তে, বহু প্রতিজ্ঞাপত্র সই করি—অথচ জীবনে তা পালন করি না।

সেদিন অপরাহ্নেই রবীন্দ্রনাথ পুণা রওনা হলেন। আমি সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে সই সংগ্রহের জন্য, ঘুরে বেড়াতে লাগলাম!

দিনেন্দ্রনাথ (ঠাকুর)-ই তখন আমাদের 'কালের যাত্রার' রিহার্সেল চালাচ্ছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে রিহার্সেলের সময়, সমস্ত শুনে তিনি বললেন—"দেখ বাপু, পুণা থেকে ফিরে এলে—তুমি যেন আবার ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রটি ওঁকে ফিরিয়ে দিতে যেও না।"

তাঁরই পরামর্শে ওই বহুজনের সই-করা প্রতিজ্ঞা-পত্রটি আমি আর রবীন্দ্রনাথকে দিই নাই। তিনিও আর সেটার খোঁজ করেননি।

৩.

সংস্কারসমিতির সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতাবর্জন ও হরিজন উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করল।

বিদ্যালয়ের ছুটির পর, বিকেলে তারা খেলাধূলা ছেড়ে, অতি উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করে যেতো। তখন তাদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা এসেছিল।

---

১৩ যাকে সর্বদা 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন—তাকেই ক্রুদ্ধ অবস্থায় 'তুমি' সম্বোধন করেছেন। ক্রোধ শান্ত হওয়ায় পুনরায় স্বাভাবিক সম্বোধনে আশ্বস্ত করেছেন।

শুধু শান্তিনিকেতনে কেন, গান্ধীজির জীবনরক্ষার জন্য সারা ভারতবর্ষে তখন অস্পৃশ্যতা-বর্জনের কাজ প্রবলভাবে চলেছিল। এই সুযোগে, আর্যসমাজ, পুনরুদ্যমে প্রদেশে প্রদেশে, নতুন নতুন কর্মীকে এই অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যে নিযুক্ত করতে লাগলেন।

বাঙলাদেশেও যাতে এব কাজ অধিকতর ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর নিকট কর্মী চেয়ে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ আমাকেই ঐ কাজে যোগ দিতে বলেন।

তখন প্রায় পনেরো বছর আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করছি। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হতে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে, শিক্ষাভবন হতে বিদ্যাভবনে আমার শিক্ষা চলেছে। আমি যে আবার কখনো শান্তিনিকেতন ছেড়ে বাইরে যাব—তা কল্পনা করিনি। বিশেষত আমার প্রিয় গবেষণার কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে, সমাজসেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করব—এ কথা যেন স্বীকার করে নিতে পারছিলাম না।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গুরুদেব বলে উঠলেন :

"দু-একটা লুপ্ত-গ্রন্থ উদ্ধার করে সংসারে কার কতটুকু উপকার হবে। তার চেয়ে দুর্ভাগাদের সেবা কর—জীবন তোর সার্থক হয়ে যাবে।"

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংস্কারসমিতির সম্পাদক শান্তিনিকেতনের বাইরে বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন।

প্রাক্তন সম্পাদকের স্থান-ত্যাগে শ্রদ্ধাস্পদ কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক এবং শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয়কে সহ-সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ কর্মী কালীমোহনবাবু এবং অভয়আশ্রমের সুশিক্ষিত কর্মী সুধীরবাবুর পরিচালনায় সংস্কারসমিতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খলরূপে কাজ চালিয়ে যায়।

এই সংস্কারসমিতি পরে শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের

অন্তর্ভুক্ত এবং শান্তিনিকেতনে (১৯৩৩-৩৪ সালে) 'সংস্কার ভবনে' রূপান্তরিত হয়।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, প্রাক্তন ও নতুন, ঐ সংস্কার-সমিতির চেয়ে 'সংস্কার-ভবন' অধিকতর সংগঠনমূলক কাজ করে।

শান্তিনিকেতনে দরিদ্র ও দুঃস্থ (বিশেষত অনুন্নত হরিজন) ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আহার্য, বাসস্থান ও বেতন বাবদ সেকালে স্কুলের ছাত্রেরও মাসিক ব্যয় ছিল পঁচিশ টাকা। কোনো দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় সম্ভব ছিল না।

দুঃস্থ হরিজনদের জন্য 'সংস্কার-ভবনে' মাত্র ছয় টাকায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়ী হতে চাল আনতে পারলে নগদ টাকা অতি সামান্যই প্রয়োজন হতো।

এই ব্যবস্থা মূলত হরিজনদের জন্য হলেও অন্যদেরও ঐ আহার্য গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না।

'সংস্কার-ভবনের' প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পরিচালক—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। তিনি ঐ ভবনের উন্নয়নকল্পে নানারূপে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতেন। বোলপুর বাজার হতে তরিতরকারী প্রভৃতি ক্রয় করে এনে শান্তিনিকেতনে সামান্য লাভে তা বিক্রয় করে, তিনি মাসে যা উপার্জন করতেন—তা দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যয় করতেন।

সুধীরবাবুর পরে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীজগদ্বন্ধু ঘোষ (অধুনা লাভপুর বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) ঐ সংস্কার-ভবনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর সময়েও ঐ সংস্কার-ভবন অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। নানা কারণে তখন আহার্যের ব্যয় মাসিক আট টাকা নির্ধারিত হয়। ব্যয় বৃদ্ধি হলেও আহার্যও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে (জুলাই মাসে) আমি যখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে নবনির্মিত চীনভবনে-গবেষক-অধ্যাপক রূপে যোগদান করি, তখন আমি কয়েক মাস সংস্কার-ভবন ও সাধারণ পাকশালা, উভয় স্থান হতে আহার্য

গ্রহণ করতাম। খাদ্যমূল্যের দিক হতে, উভয় স্থানের খাদ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। অবশ্য সাধারণ পাকশালার খাদ্যে তেল, ঘি ও মসলার পরিমাণ অধিকতর এবং রান্নাও উৎকৃষ্টতর ছিল।

তবে মনে রাখতে হবে—আহার্যের মূল্যও দ্বিগুণ ছিল।

দুঃখের বিষয় 'সংস্কার-ভবন' দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। নানা কারণে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। জীর্ণ প্রাচীন গৃহটি (যা 'সংস্কার-ভবনে' পরিণত হয়েছিল) ভেঙে পড়াই বোধহয় 'সংস্কার-ভবনের' অস্তিত্ব লোপের অন্যতম কারণ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে 'সংস্কার-ভবন' (প্রাক্তন 'বাগানবাড়ী') ভেঙে পড়ে।

'সংস্কার ভবন'[১৪] লুপ্ত হওয়ায় শান্তিনিকেতনে দুঃস্থ হরিজন বালকদের শিক্ষার সুযোগও প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু বিশ্বভারতীর অন্যত্র—শ্রীনিকেতনে তাদের শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে এবং দিন দিন তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'শিক্ষাসত্রে' বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্পসদনে বৃত্তিকরী

---

১৪ 'সংস্কারসমিতি' ও 'সংস্কার-ভবন' এই প্রতিষ্ঠান দুটিকে অনেকেই গুলিয়ে ফেলেছেন। 'সংস্কার-ভবনের' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয়কে অনেকে 'সংস্কারসমিতির' প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'তেও (তৃতীয় খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা) এইরূপ গোলমাল দেখা যায়।

প্রথম পর্যায়ের 'সংস্কার-সমিতি' গঠিত হয় ১৯২৬ সালে। সেই সমিতির আদি সভ্যগণের কেউ-ই নিজেকে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচার করতে চাননি। এবং আজও চান না।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সংস্কারসমিতি' (যার মধ্যে প্রাক্তন 'সংস্কারসমিতি', প্রাক্তন সভ্যগণের সকলের সমবেত ইচ্ছায়—অন্তর্ভুক্ত হয়) উত্তরায়ণের 'উদয়ন' গৃহে, ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমিতিটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে, নির্দেশে এবং তাঁরই পৌরোহিত্যে সমস্ত আশ্রমবাসীগণের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সমক্ষে গঠিত হয়। সুতরাং তাঁকেই সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলা উচিত।

'রবীন্দ্রজীবনীতে' রবীন্দ্রজীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বহু দুঃস্থ হরিজন সন্তান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামে গ্রামেও তাঁদের উন্নয়ন কার্যে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-কর্মিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। হরিজনদের গ্রাম্য পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা ক্রমশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের আজকের এই পরিবেশ অতিক্রম করে দৃষ্টি আমার ছুটে চলেছে সুদূর অতীতের সেই দিনে—যেদিন উদার-হৃদয় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে তাঁরই অনুপ্রেরণায়, কয়েকটি তরুণ কিশোর খেলাচ্ছলে এই আশ্রমের ধূলিতে একটি বীজ বপন করেছিল। সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়ে, সকলকে শীতল ছায়া এবং সুমিষ্ট ফল প্রদান করছে।

সেদিনের সেই কিশোরেরা আজ কেউ প্রৌঢ়, কেউ বৃদ্ধ, কেউ বা মুমূর্ষু কেউ বা মৃত। আজকের এই মহীরুহের ছায়ায় বসে, যখন এ যুগের সর্বজাতির সর্বধর্মের ছেলেমেয়েরা, সর্বজনীন বনভোজন করছে—তখন কি তারা কল্পনা করতে পারে, একদিন এখানের এই মাটিতে এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ-পংক্তিতে ব্রাহ্মণ শিশুগণ আহারে বসতো, তাঁদের প্রথমে পরিবেশন করে তবে ব্রাহ্মণ পাচকগণ, ব্রাহ্মণেতর জাতির পংক্তিতে অন্ন বিতরণ করত।

উদার-চরিত রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন মতবাদী, সকল সম্প্রদায়ের বিদ্বান ও বিদ্যার্থীকে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছেন। কারো মত পরিবর্তনের জন্য, বলপ্রয়োগ দূরে থাক—কঠোর বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ করেননি।

কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, তাঁর আচরণ, তাঁর শিক্ষা তাঁর সাহিত্য সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় কিশোর প্রাণে যে-মহান আদর্শের উন্মাদনা এনেছিল—তাতেই 'অচলায়তনের' ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

—জয়শ্রী, আষাঢ়, ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রিত : নবজাতক শারদীয়া, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৩ ; প্রবাসী, মাঘ, ১৩৬১ (প্রথম অংশ)

দুর্ভাগাদরদী কবি

●

"দু-একটা লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করে কী হবে ? তার চেয়ে মানুষের সেবা কর্। দুর্ভাগাদের ভালবাস্। জীবন সার্থক হবে।"

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাস। মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের অব্যবহিত পরের ঘটনা।

পূর্ববঙ্গে অনুন্নত জনগণের উন্নয়নের জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর কাছে কর্মী চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে সে-কথা জানালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"তুই যা।"

আমি তখন বিদ্যাভবনের গবেষক-বিদ্যার্থী। সংস্কৃতের লুপ্তগ্রন্থ তিব্বতী ভাষা থেকে উদ্ধার করছি—সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি।

মন স্থির করতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগল। তারপর গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়লাম।

কলকাতায় আর্য সমাজের কার্যালয়ে গেলাম—রবীন্দ্রনাথের পত্র নিয়ে। কার্যাধ্যক্ষ বললেন—"হয় সমস্ত দেশ ঘুরে আপনি আপনার কর্মস্থল বেছে নিন, নয় কোন এক জায়গায় বসে পড়ে কাজ আরম্ভ করে দিন। যা আপনার ইচ্ছা।"

পুনরায় গুরুর উপদেশের প্রয়োজন হলো। রবীন্দ্রনাথ তখন খড়দহে। গঙ্গার তীরে তাঁর দোতলা বাড়ি। গঙ্গার উপর তাঁর 'বোট' পদ্মা।

তিনি আমায় এক রাত আটকে রাখলেন। বললেন, "আজ ভাবতে দে। কাল সকালে কথা হবে।"

দোতলার উপরে চিলেকোঠায় রাত কাটালাম। কী সুন্দর দৃশ্য! প্রায় সারারাত জেগে কাটল।

সকালে তাঁর কাছে যেতেই বললেন—"দেশকে না দেখে, না চিনে তার সেবা করবি কি! প্রথমে দেশটাকে ঘুরে দেখ্। দেখবি, কত নতুন কথা জানতে পারবি—যা বই পড়ে পাস্‌নি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখিস্।"

গুরুর আশিস্‌কে পাথেয় করে আমি আমার দেশ পরিক্রমা শুরু করলাম। প্রথমে মধ্য ও পূর্ববঙ্গের কতক অংশ দর্শন করে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলাম। সেখানে বীরভূম জেলায় কিছুদিন ঘুরতে হলো। তার পর উত্তরবঙ্গ অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে একদিন দার্জিলিঙ্ পৌঁছলাম। শুনলাম রবীন্দ্রনাথ সেখানে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

তিনি খুব খুশী হলেন। আমার অভিজ্ঞতার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। ডায়েরি রাখছি কিনা জানতে চাইলেন।

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমার কাজে বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ী জাতির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আমি দার্জিলিঙ্ এসেছি। এর পর কালিম্পঙ্ যাব। কোথাও বেশিদিন থাকার সময় নাই। এক বছরের মধ্যে বাঙলা ও আসাম ঘুরতে হবে।

জীবনে কখনও হয়ত কিছু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলাম। সেই পুণ্যের ফলস্বরূপ কয়েকদিনের জন্য স্বর্গবাস হলো। দার্জিলিঙে এসে এই কথাই বারবার মনে হতে লাগল।

কিন্তু ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। এখানে এসেও আমার কর্মের বিরাম নাই। অবশ্য একই সঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই চলেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ এবং তথ্য সংগ্রহ দুই-ই এক সঙ্গে করে চলেছি।

সেদিন সারাদিনের পরিশ্রমের পর, পরম আরামে কম্বলে কবলিত হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করছি; নয়নে নিদ্রার অমৃত প্রলেপ—সহসা

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তন্দ্রা ছুটে গেল। কে আমার নাম ধরে ডাকছে। বড়ই বিস্মিত হলাম। এখানে আমি প্রায় অপরিচিত। রাত দশটায় আমার কাছে এখানে আসে কে?

বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোকটিকে চিনলাম না। সে বলল—"আমি বাবামশায়ের (রবীন্দ্রনাথের) বাড়ী থেকে আসছি। তাঁর অসুখ। তাই মা আপনার খোঁজ করতে পাঠালেন।"

আমি অবাক হয়ে বললাম—"তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে?"

সে উত্তেজিত হয়ে বলল—"সহজে কি পেয়েছি মশায়। দার্জিলিঙের কোনো হোটেল বাকি রাখি নাই—হয়রান্ হয়ে গেছি।"

আমার ঠিকানা গুরুদেবকে জানাইনি। জানাবার প্রয়োজন মনে হয়নি। তাছাড়া ঠিকানারও কিছু ঠিক ছিল না। বেচারীর তকলিফ বড় কম হয়নি। এই শীতের রাতে সারা দার্জিলিঙ চষে বেড়িয়েছে। অথচ হোটেলটি গুরুদেবের বাড়ির কাছে।

খান দুই কম্বল ঘাড়ে করে তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথের বাড়ি রওনা হলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই সেখানে পোঁছলাম।

বসবার ঘরে বৌঠান (প্রতিমা দেবী), রানীদি (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) এবং আঁকশিদি (অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়)[১] আমার আগমনের প্রতীক্ষায় উৎকন্ঠিত হয়ে বসেছিলেন।

আমাকে দেখেই বৌঠান বলে উঠলেন—"আঃ বাঁচালে! বাবা মশায়ের অসুখ। ওঁরও (রথীদার) শরীর ভালো নয়, আমরা বড় অসহায় বোধ করছিলাম।"

রাত্রি জাগরণের সংকল্প নিয়েই এসেছিলাম। তাঁরা কিন্তু আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন। সকলের সমবেত নির্বন্ধাতিশয্যে আমাকে শুতেই হলো। তাঁরা আমায় আশ্বাস দিলেন—"প্রথমে আমরা জাগি, তার পর তুমি জাগবে।"

কিন্তু আমি যখন জাগলাম, তখন আর রাত্রি নাই। রীতিমত

---

১ প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী।

সকাল। অত্যন্ত লজ্জা পেলাম। তাঁরা শুধু বললেন—"লজ্জার কারণ নেই, তোমাকে জাগাবার প্রয়োজন হয়নি।"

গুরুদেব তখনও নিদ্রিত। তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আমি বেরিয়ে পড়লাম, কথা দিতে হলো—রাত্রে ঐ বাড়িতেই থাকব।

সেদিন রাত্রেও যথারীতি সেখানে উপস্থিত হলাম। রাত জাগবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম—কিন্তু বৌঠানেরা সকলে মিলে পূর্বরাত্রের মতোই আমাকে শুয়ে পড়তে বললেন এবং ঠিক পূর্বরাত্রের মতোই সকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হলো।

বিষণ্ণ মনে আমি তাঁদের অনুযোগ করলাম—"কেন আমাকে ওঠাননি?"

তাঁদের সেই একই উত্তর—"প্রয়োজন হয়নি।"

ইতিমধ্যে পাশের ঘর হতে গুরুদেব আমায় ডাক দিলেন। কাছে যেতেই বললেন—"হ্যাঁ রে! তুই নাকি রাত জেগে আমার সেবা করতে এসেছিস্। তুই তো ভারি বোকা! জীবনে প্রথম দার্জিলিঙ্ এসেছিস, আর কখনো এ সুযোগ হবে কি না তার ঠিক নেই। ক-দিন এখানে আনন্দে ঘুরে বেড়াবি, তা না এক বুড়োর সেবায় রাত জাগতে এলি?"

আমি মনে মনে হাসলাম। কত যে রাত জেগেছি, আর কত যে সেবা করেছি তার খবর নিশ্চয়ই তাঁর জানা নেই।

যাই হোক, গুরুদেবের সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা-জ্বর দু'দিনেই সেরে গেল। আমাকেও আর রাত জাগতে হলো না। আমি আমার হোটেলে ফিরে গেলাম।

এর দিন দুই পরের কথা। দার্জিলিঙের কাজ আমার শেষ হয়েছে। নেমে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—এমন সময় আবার গুরুদেবের কাছ হতে আহ্বান এলো।

গিয়ে শুনলাম—তাঁরা একটা জলসার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের এস্রাজীর অভাব। আমাকে থাকতে হবে।

রথীদা বললেন—"এর জন্য যদি তোমার ছুটির প্রয়োজন থাকে, তা

হলে বাবা তোমার কর্তাদের লিখে ছুটি মঞ্জুর করবেন।”

আমি বললাম—“ওঁর চিঠি দেবার প্রয়োজন নাই। আমি লিখে দিচ্ছি।”

জলসার আখড়াই পূর্বেই শুরু হয়েছিল, গুরুদেবের অসুখের জন্য কদিন বন্ধ ছিল। আবার পুরোদমে তা চলতে লাগল।

গুরুদেব এবং শ্রীমতী হাতী সিং (এখন ঠাকুর)[২] এই দুজনই জলসার প্রধান অবলম্বন। শ্রীমতীদি ছাড়া শান্তিনিকেতনের আর কোনো সঙ্গীতজ্ঞা ছাত্রী বা ছাত্র তখন দার্জিলিঙে ছিলেন না। বেড়াতে এসেছেন—এমন দু-একজন সুকণ্ঠীকে জড়ো করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের তালিম দেওয়া হতে লাগল। সঙ্গীত-শিক্ষার ভার পড়ল অরুন্ধতী দেবীর (আঁকশিদির) উপর। তিনিই এ-বিষয়ে তখন যোগ্যতমা।

জলসার দিন সমাগত। অথচ তবলচী নাই। শেষে চরম সংবাদ এল—তবলচী পাওয়া যাবে না।

এ তো আচ্ছা ফেসাদ। রথীদা জানতেন আমি কিছুদিন প্রবল উৎসাহে তবলা ও পাখোয়াজ অভ্যাস করেছিলাম। আমার উপর তবলা বাজাবার হুকুম হলো। এস্রাজীর অভাব ততটা গুরুতর নয়—রথীদাও তা পূরণ করতে পারেন।

ওস্তাদজীর সঙ্গে সঙ্গত করেছি। কিন্তু কোনোদিন এমন জনসভায় বাজাইনি। এখন এই সঙ্গীন অবস্থায় সেই বিদ্যা নিয়েই প্রস্তুত হতে হলো।

দার্জিলিঙে বড় ‘হল’ ছিল না। যে ‘হল’ ছিল তাতে বড় জোর দু-চারশ’ লোক ধরে। সহজেই সে ‘হল’ ভরে গেল। টিকিট ফুরিয়ে গেছে, ‘হল’-এ স্থান নাই—তবু টাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, এমন বহু ইওরোপীয় দর্শক-দর্শিকা আকুল মিনতি করে ঢুকে পড়লেন।

গুরুদেবের আবৃত্তি এবং শ্রীমতী হাতী সিং-এর নাচ, এই দুই প্রধান

---

২. শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী; পরবর্তীকালে শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী।

আকর্ষণ। হলোও তা চমৎকার। অন্যরাও° অবশ্য তাঁদের পার্ট ভালোই করেছিলেন।

আমি ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ঠেকা দিচ্ছিলাম। প্রথমত, জনসভায়—বিশেষ গুরুদেবের সামনে কখনো বাজাই নাই। দ্বিতীয়ত, গুরুদেব জোর বাজনা পছন্দ করেন না এবং সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ শ্রুতি এবং তীব্র কটাক্ষ—যা প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ব্যক্তির মনেও ভীতি উৎপাদন করে—তার কথা আমার ভালো করেই জানা ছিল।

গুরুদেবই কিন্তু ইশারায় বার বার আমায় জোরে বাজাতে বললেন। আমি তখন নির্ভয়ে যত জোরে পারি বাজিয়ে গেলাম। শ্রীমতীদির সেই নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে জোর বাজনারই প্রয়োজন ছিল।

মোটের উপর জলসা খুবই ভালো হয়েছিল। গুরুদেব নিজেও খুশী হয়েছিলেন। চতুর্দিক হতে অনুরোধ আসতে লাগল—আর একদিন হোক। রথীদারও পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গুরুদেব কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন—"এই ছোট 'হল'-এ পরিশ্রম পোষায় না।"

দার্জিলিঙের এই মধুর স্মৃতির পাথেয় সংগ্রহ করে আবার আমার যাত্রা শুরু হলো।

° বহিরাগতদের মধ্যে যাঁরা সেদিন সেই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের আর একজনের কথা স্মরণ হচ্ছে—তিনি ঢাকার স্বামীবাগের শ্রীমতী প্রতিভা সোম। এখন তিনি স্বনামখ্যাতা শ্রীপ্রতিভা বসু। সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গীতসাধনাও আশা করি তাঁর অব্যাহত আছে।

বৈদিক পণ্ডিতের চক্ষে কবি

১৯৩৬ সাল। আমি তখন বঙ্গীয় আর্যসমাজের বেদ-প্রচার বিভাগের কর্মী। শ্রীহট্টে আর্যসমাজ স্থাপন করে নমঃশূদ্রাদি অনুন্নত-শ্রেণীর উন্নয়নকার্যে আত্মনিয়োগ করেছি।

কলকাতা হতে কর্তৃপক্ষের পত্র পেলাম—একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতকে তাঁরা শ্রীহট্ট পাঠাচ্ছেন।

তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। কখনও তাঁকে দেখি নাই। কেমন আকৃতি, কিরূপ প্রকৃতি কিছুই জানি না। অবশেষে একদিন তিনি এসে পড়লেন।

তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছি। জলযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে—এমন সময় তিনি বললেন—"রাখ, ওসব পরে হবে। আমার পৈতে ছিঁড়ে গেছে—আগে একটা পৈতে দাও দেখি।"

বাড়িতে পৈতে ছিল না। বাজার থেকে আনাতে যাচ্ছি—তিনি বললেন—"বাজারে কেন? ঘরে টোয়াইন সুতো নেই?"

আমি চমকিত হয়ে বললাম—"টোয়াইন সুতো তো আছে, তাই দিয়ে—!"

তিনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"হাঁ হাঁ! তাই দিয়েই পৈতে করব! দেখ বাপু! আমি জাতিতে মুসলমান—ধর্মে বৈদিক! শুচিশুদ্ধ হিন্দু বিধবার হাতের তৈরি পৈতে না হলেও চলবে!"

আমি অধিকতর সচকিত! তিনি আমার মনোভাব বুঝলেন। বললেন—"ভাবছ, তাহলে পৈতেরই বা প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। তবে পৈতে গেলেই জাত বা ধর্ম গেল—এরূপ বিশ্বাস আমার নাই।

এই ত ট্রেনে, ষ্টীমারে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ছিলই না। ওটা কি জান? ওটা হলো আমাদের ধার্মিক পতাকা। ওই জাতীয়-পতাকার মতো!"

প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হলাম। পরে ধীরে ধীরে তাঁর অপূর্ব চরিত্রের অধিকতর পরিচয় পেলাম।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল তাঁর কণ্ঠস্থ। বোগদাদে তিনি আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। হিব্রু ভাষায় বাইবেল পড়েছেন। অবশেষে কাশীতে বেদ অধ্যয়ন করেছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাছে তিনি বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করেন। সেদিন সারা ভারতে—এমন কি ভারতের বাইরেও তোলপাড় পড়ে যায়।

পণ্ডিতজী বললেন—"ত্রিবেণী-সংগমে স্নান করে আমার বহু সংস্কার দূর হয়েছে। বেদ, কোরাণ বা বাইবেল, কোনো শাস্ত্র অপৌরুষেয় বা অভ্রান্ত, এ কথা আমি মানি না। তবে সকল শাস্ত্রই জ্ঞানের আকর এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল!"

দিন পনের-ষোল তাঁর সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে কাটাই। সে দিনগুলি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের স্বর্ণগৃহ আবিষ্কারের মতই আমার অভূতপূর্ব আনন্দলাভ হয়েছিল। দিনরাত আমার সে এক নেশার ঘোরে কেটে যেত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি। জিজ্ঞাসার আর অন্ত নাই। সমস্ত জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়েছে। প্রাণে আনন্দের পর আনন্দের তরঙ্গ বয়ে গেছে।

তিনি বৃদ্ধ। আমি যুবক। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যবান। হয়ত তিনি আমার চেয়ে শক্ত। কাজেই রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত আমরা শাস্ত্রালাপ চালাতাম। কেউ ক্লান্ত হতাম না।

তিনি বলতেন—"দেখ বাপু, কূপমণ্ডুক হয়ো না। মনে ক'রো না—তোমার হিন্দু-ধর্মেই সব কিছু আছে। হিন্দুর, মুসলমান, খৃষ্টানের কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে। আবার মুসলমান, খৃষ্টানও হিন্দুর কাছে যথেষ্ট শিখতে পারে।"

একদিন রাত্রে ভগবদ্-বিষয়ক শাস্ত্রালোচনা চলছিল। তিনি বললেন, "বেদে একটি মন্ত্র পেয়েছি যার তুলনা নাই। এমনটি আর কোথাও পাই নাই।"

আমি পরম ঔৎসুক্যে প্রশ্ন করলাম—"কোন্ মন্ত্রটির কথা বলছেন?"

তিনি তাঁর অতুলনীয় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥[১]

বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৩১।১৮

গভীর রাত্রি। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। সেই মহানীরবতা, নিশীথ-মৌনতা ভেদ করে গুরুগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয়ী বেদমন্ত্রের আবৃত্তি আমাকে স্থান কাল ভুলিয়ে দিল। মনে হলো—প্রাচীন ভারতের কোন এক তপোবনে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁর মহান্ আবিষ্কারের কথা জগদ্বাসীকে শোনাচ্ছেন।

মনে আছে তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব ওঙ্কার ধ্বনি। মনে আছে তাঁর 'আজান' দেওয়া।

ওঙ্কার শুনে মনে হল—দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষ্যে যে-অব্যক্ত সঙ্গীত নীরব ছিল—মৌন ছিল, তাই যেন ভাষা পেল; সমস্ত জগৎ যেন এক সঙ্গে এক সুরে গেয়ে উঠল তাঁর নামগান। ওই ক্ষুদ্র ওঁ শব্দের উচ্চারণ যে অমন করে সমস্ত অস্তিত্বকে কম্পিত করতে পারে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

প্রভাতের 'আজান' জলস্থল আলোড়িত করে, স্বপনের কুহকজাল ছিন্ন করে সুষুপ্ত বিশ্বজগৎকে যেন উদ্বোধিত করল—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'

---

১ "আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।" নৈবেদ্য।

এই বাক্যই যেন বাক্যের অতীত বিশ্বসঙ্গীতের সুরে ধ্বনিত হলো।

একদিন বললেন, "হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব আমায় আকৃষ্ট করত। কিন্তু হিন্দুর সমাজব্যবস্থা, হিন্দুর পুতুল-পূজা আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। জন্মাবধি তোমরা এতে অভ্যস্ত—তাই বুঝতে পার না, কিন্তু তোমাদের সমাজের বাইরে যারা, তাদের চক্ষে এ যে কী ভয়ানক, কী জঘন্য—তা তোমরা কল্পনা করতে পারো না।

"যখন জানলাম—হিন্দুদের মধ্যে এমন সমাজও আছে, যেখানে জাতভেদ নাই, পুতুল-পূজাও পরিত্যক্ত, তখন আমার হিন্দু হবার আগ্রহ হলো। ঠিক এমনি সময়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। একজন মানুষের মতো মানুষ দেখলাম। ধার্মিক, মানব-প্রেমিক, তেজস্বী, নির্ভীক পুরুষ! মন বললে, হাঁ! এঁরই কাছে দীক্ষা নেওয়া যেতে পারে!

"তিনি কিন্তু আমাকে সহজে দীক্ষা দেননি। প্রথমেই বললেন, 'ভাই, ভালো করে ভেবে দেখ। ধর্ম পরিবর্তন ছেলেখেলা নয়।'

"ভালো করেই ভেবে দেখেছিলাম। যখন তাঁর বিশ্বাস হলো যে, আমি সত্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন।

"আর্যসমাজ জাতিভেদ রহিত করেছে এবং বৈদিক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছে। জাতিভেদের উচ্ছেদ এবং একেশ্বরবাদের প্রচার, এ আমারও জীবনের ব্রত।

"সংস্কার দূর করা সহজ নয়। আর্যসমাজেও এক ধরনের প্রতীক-উপাসনা দেখেছি। আবার মুসলমান সমাজেও যে তা দেখি নাই—তা নয়।

"দিল্লিতে এক শেঠ আর্যসমাজীর অতিথি হয়েছিলাম। একদিন তাঁর উপাসনাগৃহে গিয়ে দেখি—একটি গেরুয়া রঙের 'ল্যাঙ্গট' টাঙানো রয়েছে। নীচে তার ধূপ-ধুনা! ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় শেঠ পরম ভক্তিভরে বললেন, 'এটি স্বামীজীর (দয়ানন্দের) ল্যাঙ্গট।' তাজ্জব ব্যাপার!

"দিল্লিতে জুম্মা মসজিদে গেছ? আমি দিল্লি গেলেই সেখানে যাই। মুসলমানদের সমবেত উপাসনার তুলনা নাই! তার আকর্ষণ এখনও আমার বিন্দুমাত্র কমে নাই। কিন্তু এই জুম্মা মসজিদে হজরত মহম্মদের 'পদচিহ্ন' রক্ষিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যে-কেউ জুম্মা মসজিদ দর্শন করতে যান—তাঁকেই সেই পদচিহ্ন দেখানো হয়। একটি ক্ষুদ্রগৃহে পট্টবস্ত্রে আবৃত উচ্চাসনে বিরাজমান সেই পদচিহ্নফলককে ভক্তি ভরে বাইরে এনে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। এবং দর্শকগণ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রায় সকলেই তাকে প্রণাম করেন।

"আমার সঙ্গে যে-আর্যসমাজী ভৃত্য ছিল সে প্রণাম না করে বলে উঠল—'মৈ বুৎপরস্ত নহী হুঁ।' পদচিহ্নধারক চমকে উঠলেন।

"জানি না হিন্দুর সংস্পর্শে এসে মুসলমানও পৌত্তলিক হয়ে উঠেছে কি না।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। তা ছাড়া পৌত্তলিক হিন্দুরাই তো মুসলমান হয়েছেন। বাইরের থেকে মুসলমান কতই বা এসেছেন!

"বাংলা দেশে অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যেও অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের একেশ্বরবাদী আমি প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীহট্টে নবীগঞ্জ অঞ্চলে এক মুসলমান কৃষকের মুখে এই ঘটনাটি শুনেছি :

"আমার সহোদর ভাইকে সাপে কামড়ায়। ওঝারা এসে ঝাড়ফুঁক করতে থাকে। ভাই আমার ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে আসছে। এমন সময় আমার কানে এল কেউ বলছেন—'মনসার শরণ নাও। দেবী বিষহরিকে ডাক—তোমার ভাই বেঁচে উঠবে।' আমি তখন ভাই-এর অচেতনদেহ কোলে নিয়ে বসে। মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিন্তু আল্লাকে ছেড়ে মনসার শরণ নেব—এও কি হতে পারে।

"ওঝারা আশা ছেড়ে দিয়েছে। ভাই-এর দেহ ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে—কানের কাছে সকলেই বলছে—'মা বিষহরিকে ডাক।' হিন্দুরা বলছে, অনেক মুসলমানও বলছে।

"কিন্তু আমি বলে উঠলাম—'এক ভাই যাচ্ছে শত ভাই যাক, ছেলে যাক, মেয়ে যাক—আল্লা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নোয়াব না।'

"পণ্ডিতজী। ভাই আমার মারা গেল—কিন্তু বিষহরির কাছে আমি মাথা নোয়াইনি।"

বেদজ্ঞ চমৎকৃত। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরল না। পরে ধীরে ধীরে বললেন—"এই হজরত মহম্মদের ধর্ম। বীরের ধর্ম।"

একদিন বললেন, "তোমাকে আর্যসমাজীর 'ল্যাঙ্গট-পূজা'র কথা বলেছি কিন্তু তাদের উপর সুবিচার করতে হলে আর একটি ঘটনার কথাও বলতে হয়।

"হায়দরাবাদে আর্যসমাজ-মন্দিরে সনাতনী ও আর্যসমাজীর মধ্যে শাস্ত্রযুদ্ধ চলছে। বিষয়—প্রতিমা-পূজা।

"তুমুল তর্কের মধ্যে এক সনাতনী বলে উঠলেন, 'তোমরা মূর্তি-পূজা করো না—তবে দয়ানন্দ সরস্বতীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছ কেন?'

"বলামাত্র আর্যসমাজী তার্কিক তৎক্ষণাৎ ফ্রেমে বাঁধানো স্বামীজীর ছবি একটানে নামিয়ে এনে তার উপর পদাঘাত করলেন। ছবি চূরমার হয়ে গেল।

"ব্যাপারটা কিন্তু উপস্থিত জনতাকে মর্মাহত করল। বহু সনাতনী পণ্ডিত ও শ্রোতা এবং অনেক আর্যসমাজীও এতে ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেকেই বললেন, 'পূজা না হয় নাই করলে—তাই বলে পূজ্যব্যক্তির প্রতিকৃতিতে পদাঘাত! সমস্ত ব্যাপারেই একটা সংযম ও সীমা থাকা প্রয়োজন।'

"যাই হোক, আর্যসমাজ অসাধ্যসাধন করেছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। মুচি, মেথর, মুর্দাফরাস, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ভেদ দূর করে সমস্ত হিন্দু জাতিকে পৈতে পরিয়ে, গাছ, পাথর, ভূত, প্রেত, সাপের পূজা ছাড়িয়ে এক পংক্তিতে আহার এবং এক মন্দিরে উপাসনায় সমবেত করা সহজ কথা কি?

"সমাজে সাম্য আনবার জন্যে চিন্তাশীল আর্যসমাজীগণ বহু চিন্তা

করেছেন। এই চিন্তার ফলে তাঁরা এক অপূর্ব প্রথা প্রবর্তন করছেন। সেটি হচ্ছে কুলপদবী ত্যাগ! উচ্চ জাতীয়েরাই প্রথমে এই আদর্শ দেখাচ্ছেন। সকল কার্যে পদবীবিহীন নামমাত্রই তাঁরা ব্যবহার করেন। যেমন—হংসরাজ, ঋষিরাম, কাহনচাঁদ, রামদেব, কুশলচাঁদ ইত্যাদি। বৈষম্যের ইঙ্গিতমাত্রও তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।"

একদিন রাত্রে আমার হাতে একটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থ দেখে তিনি তা থেকে কিছু পড়তে বললেন। আমি রবীন্দ্রনাথের রচিত কোনো গান আবৃত্তি করলাম। তিনি বাঙলা জানতেন না। কিন্তু সংস্কৃতবহুল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অর্থগ্রহণে বিশেষ বাধা হলো না।

তিনি আমাকে আরও আবৃত্তি করতে বললেন। আমি একের পর এক আবৃত্তি করে চললাম। রাত প্রায় কাবার। শেষে আমিই নিজে নিবৃত্ত হয়ে, তাঁকেও বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলাম।

তার পরদিন থেকে আর অন্য আলোচনা নাই! কেবল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা। আহার নিদ্রা ভুলে আমাদের উভয়ের মধ্যে চলেছে অবিরাম রবীন্দ্র-রচনা পাঠ ও শ্রবণ! কিছুতেই আর তাঁর পরিতৃপ্তি হয় না!

অবশেষে বিদায়ের দিনে তিনি বললেন, "আমি ওঁর নাম মাত্র শুনেছিলাম। আমার ক্ষেত্র এবং বিষয় ভিন্ন। বাঙলাও আমি জানি না। কাজেই ওঁর সাহিত্য পাঠের সুযোগ কখনও হয় নাই। আজ দেখছি মস্ত ভুল করেছি। তিন বেদ (বেদ, বাইবেল, কোরাণ) আমি অধ্যয়ন করেছি। আজ চতুর্থ বেদের সন্ধান পেলাম। শেষ জীবনে এই চতুর্থ বেদ অধ্যয়ন করব।"

ত্রৈবিদ্য পণ্ডিতজীর সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁর শেষজীবনে চতুর্থ বেদের অধ্যয়ন তিনি আরম্ভ করেছিলেন কি না অথবা আরম্ভের পূর্বেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে—কিছুই আমার জানা নাই।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬৯

কবি ও বৈদিক বিবাহপদ্ধতি

বর্তমানে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত তা ঠিক এক ধরনের নয়। সনাতনী, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী[1] এবং প্রগতিশীল হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ-পদ্ধতির প্রভেদ আছে।

সনাতনীদের বিবাহ-সংস্কার পদ্ধতি অতি দীর্ঘ। তার একটি বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ থাকে না। শুধু বিবাহ অনুষ্ঠান কেন, কোনো অনুষ্ঠানেই মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলা হয় না।[2]

---

১ ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজে কারো কারো হিন্দু নামে আপত্তি আছে—তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্ম বা আর্য বলেন।

২ এই উপলক্ষে একটি সাধারণ মানুষের উক্তি উদ্ধৃত করি:

"কোনো শ্রাদ্ধসভায় আমি মন্ত্র পাঠ করি। মন্ত্রের সঙ্গে তার প্রাঞ্জল বাংলা ব্যাখ্যাও পাঠ করি।

শ্রাদ্ধে দধি ও মিষ্টি সরবরাহকারী এক বৃদ্ধ মোদক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে আমায় একান্তে ডেকে বললেন:

"ছেলেবেলা থেকে পুরোহিতদের মুখে এইসব 'অংবং' শুনে আসছি। এর যে এত চমৎকার অর্থ তা কোনোদিন জানি নাই। কেউ আমাদের জানায়নি।

"পুরোহিতের মন্ত্রের অর্থের দিকে দৃষ্টি ছিল না, দৃষ্টি ছিল আমাদের অর্থের দিকে। অর্থাৎ আমাদের দেয়—দক্ষিণা, কাপড়চোপড় এবং বাসনকোসনের দিকে।

আজ বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি—এতদিনে জানতে পারলাম আমাদের মন্ত্রগুলির কী সুন্দর অর্থ। আপনাকে আমার প্রণাম জানাই। এখানে আজ না এলে ওই 'অংবং' চিরকাল আমার কাছে 'অংবং'-ই রয়ে যেতো।"

ব্রাহ্মসমাজের বিবাহানুষ্ঠানে কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা অনুবাদ থাকে। সে-পদ্ধতিতে হোম বা যজ্ঞ থাকে না।

আর্য-সমাজে বহু বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সঙ্গে তার ভাষা (হিন্দি বা বিভিন্ন প্রাদেশিক) অনুবাদ থাকে এবং হোম বা যজ্ঞ থাকে। বিবাহ পদ্ধতি সনাতনীদের মতো অতিদীর্ঘ নয়।

ব্রাহ্মসমাজে এবং প্রগতিশীল হিন্দুসমাজে, রেজিস্ট্রি-বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন থাকলেও, অনেকে বৈদিকমন্ত্রসহ একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানেরও পক্ষপাতী।

রবীন্দ্রনাথও সুষ্ঠু অথচ সংক্ষিপ্ত একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁর উদ্যোগে এবং উপস্থিতিতে, আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে, উত্তরায়ণে, রবীন্দ্রনাথের পালিতা পৌত্রী নন্দিনীর বিবাহসংস্কার হয়, (১৯৩৯) ১৩৪৬ সালের ১৪ই পৌষ।

এই বিবাহ অনুষ্ঠানে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, প্রগতিশীল হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এখন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

ঐ পদ্ধতির বাংলা অনুবাদ এবং মন্ত্রগুলির আকরস্থান এখানে দেওয়া হলো।

"তিনি (প্রজাপতি-সৃষ্টিকর্তা) এই আত্মাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নীর আবির্ভাব হইল।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১।৪।৩

"এই আত্মার অর্ধেক হইলেন তিনি—যাঁহাকে জায়া বলা হয়।"

শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।২।৩।১০

"যতদিন না জায়ালাভ হয়, ততদিন পুরুষ (পূর্ণতালাভ করেন না) অর্ধেক বলিয়া গণ্য হন।"

ব্যাস-সংহিতা, ২।১৪

"চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল দর্শন করে, সেইরূপ

ধীরেরা সেই বিশ্বব্যাপী দেবতার পরমপদ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।”

ঋক্ ১·২২।২০, অথর্ব, ৭।২৬।৭, সাম, ২।১০২২

“যিনি সুখকর, তাঁহাকে নমস্কার করি, যিনি সকল কল্যাণের আকর তাঁহাকে নমস্কার করি, যিনি কল্যাণ, যিনি কল্যাণতর, তাঁহাকে নমস্কার করি। শান্তি, শান্তি, শান্তি,।”

বাজসনেয়ি, ১৬।৪১, তৈত্তিরীয় ৪।৫।৮।১ ইত্যাদি।

স্বস্তিবাচন

“এই শুভবিবাহকার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। আজ শুভদিন। আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।”

“শুভদিন! শুভদিন! শুভদিন!”

“এই শুভবিবাহকর্ম নিষ্পন্ন করিতে হইবে। ইহা সফল হউক। আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।”

“সফল হউক! সফল হউক! সফল হউক!”

“এই শুভবিবাহকর্ম নিষ্পন্ন করিতে হইবে। ইহাতে কল্যাণ হউক, আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।”

“কল্যাণ হউক! কল্যাণ হউক! কল্যাণ হউক!”

“তিনি সত্যস্বরূপ! এই কার্যারম্ভ যেন শুভকর হয়।”

সম্প্রদাতা—“এই অর্ঘ্য গ্রহণ করো।”

বর—“অর্ঘ্য গ্রহণ করি।”

সম্প্রদাতা—“এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করো।”

বর—“পরিচ্ছদ গ্রহণ করি।”

সম্প্রদাতা—“এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করো।”

বর—“অঙ্গুরীয় গ্রহণ করি।”

সম্প্রদাতা—“যথাবিধি বিবাহকর্ম করো।”

বর—“আমার জ্ঞানানুযায়ী করিতেছি।”

সম্প্রদাতা—“ওঁ তৎ সৎ—তিনি সত্যস্বরূপ।”

"অদ্য পৌষমাসে ধনুরাশিস্থ ভাস্করে, কৃষ্ণপক্ষে, পঞ্চমীতিথিতে, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার এই পুত্রীকৃতা নন্দিনীকে শুভবিবাহে দান করিবার জন্য —কে বররূপে বরণ করি।"

বর—"আমি বৃত হইলাম।"

স্ত্রী-আচার

গান: "সুধাসাগরতীরে হে এসেছে নরনারী
সুধারসপিয়াসে"—ইত্যাদি

কন্যা—"তুমি বরণীয়। তোমাকে আজ বরণ করি। তোমার মনকে বরণ করি। তোমার প্রীতি এবং তোমার হৃদয়কে বরণ করি। আমার আত্মার দ্বারা তোমার আত্মাকে বরণ করি।"

"যাহা আমাদের অন্তরে আছে, তাহাই বাহিরে প্রকাশিত হউক। যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই অন্তরের বস্তু হউক। ইনি আমাকে প্রীতির সহিত স্মরণ করুন। প্রিয় বলিয়াই আমাকে স্মরণ করুন।"

অথর্ব ২।৩০।৪

বর—"তোমাকেও আমি সভাস্থলে বরণ করিতেছি।"

কন্যা—"আমি সর্বসহমানা, তুমিও সর্বসহ হও। জল যেমন আপন পথে সহজেই চলে, তেমনি তোমার মনও আমার প্রতি সদাই ধাবিত হউক।"

অথর্ব ৩।১৮।৫-৬, ঋক্ ১০।১৪৫।৫

"আমাদের উভয়ের ভাগ্য, উভয়ের চিত্ত, উভয়ের ব্রত একসঙ্গে যুক্ত হইয়া অগ্রসর হউক। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া প্রীতির সহিত প্রেমের সহিত মিলিত হইতে পারি।"

অথর্ব ২।৩০।২

বর—"প্রীতির সহিত প্রেমের সহিত যেন আমরা পরস্পর মিলিত হই।"

"দ্যুলোক ধ্রুব, এই বিশ্বজগৎ ধ্রুব, এই পর্বতসমূহ ধ্রুব, এই কন্যাও পতিকূলে ধ্রুব হউক।"

ঋক্ ১০।১৭৩।৪, অথর্ব, ৬।৮৮।১

কন্যা—"তুমি ধ্রুব, আমি যেন পতিকূলে ধ্রুব হইয়া থাকি।"

গোভিল গৃহ্যসূত্র, ২।৩।১

"এই যে দেবতা, বিশ্বকর্মা মহাত্মা। ইনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। হৃদয়ের সঙ্গে, সংশয়মুক্ত মনের সঙ্গে, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন।

সম্প্রদাতা— 'অদ্য পৌষমাসে, ধনুরাশিস্থ ভাস্করে, কৃষ্ণপক্ষে, পঞ্চমী তিথিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, আমি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কন্যা নন্দিনীকে—অর্চিত বর তোমাকে দান করিতেছি।"

বর—"স্বস্তি।"

সম্প্রদাতা—"ধর্মে, অর্থে কামে, তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।"

বর—"অতিক্রম করিব না।"

[বরের বামে কন্যার উপবেশন]

পরস্পরের গ্রন্থিবন্ধন

বর—"সত্যগ্রন্থির দ্বারা, তোমার মন ও হৃদয়কে বন্ধন করিতেছি।"

সাম-মন্ত্র ব্রাহ্মণ ১।৩।৮০

[বর স্বীয় অঞ্জলির দ্বারা বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবেন]

"সৌভাগ্যের জন্য, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমি তোমার পতি। তুমি আমার সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।"

ঋক্ ১০।৮৪।৩৬ অথর্ব, ১৪।১।৫০
আশ্বলায়ন, ১।৭।৩ ইত্যাদি

"আমার ব্রতে তোমার হৃদয় যুক্ত হউক, আমার চিত্তে তোমার

চিত্ত যুক্ত হউক। একমনা হইয়া আমার বাক্য অবধান করো। প্রজার অধিপতি আমার সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করুন।"

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২১।৭ ইত্যাদি

"এই যে তোমার হৃদয়, তাহা আমার হউক, এই যে আমার হৃদয়, তাহা তোমার হউক।"

বরকন্যা

"আমাদের উভয়ের হৃদয় মধুময় ও অপাঙ্গ স্নেহাঞ্জনলিপ্ত হউক। আমাকে হৃদয়ের অন্তরে গ্রহণ করো। আমাদের মন ঐক্য লাভ করুক।"

অথর্ব ৭।৩৬।১

সপ্তপদী

"অন্নের জন্য তুমি প্রথম পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"বলের জন্য তুমি দ্বিতীয় পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"ধনপুষ্টির জন্য তুমি তৃতীয় পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"সুখলাভের জন্য তুমি চতুর্থ পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"সন্ততিলাভের জন্য তুমি পঞ্চম পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"(অনুকূল) ঋতুসমূহের জন্য তুমি ষষ্ঠ পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"(আমাদের পরস্পর) সখ্যের জন্য তুমি সপ্তম পদক্ষেপ করো এবং আমার অনুবর্তিনী হও।"

"তুমি সপ্তপদ গমন করিয়া আমার সখা হও। আমি যেন তোমার

সখ্য লাভ করিতে পারি। তোমার সখ্য হইতে আমি যেন বিযুক্ত না হই। তুমিও যেন আমার সখ্য হইতে বিযুক্ত না হও।"

শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র, ১।১৪।৬ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।৭।১৯ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১।৮।১ কৌশিকসূত্র ৭৬।২৪ সাম-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ ১।২।১৩ আপস্তম্ব মন্ত্র পাঠ ১।৩।১৪ ইত্যাদি

আচার্য (রবীন্দ্রনাথ)

(আশীর্বচন)

"সকল বিঘ্ন অতীত করিয়া, সত্যের ক্ষেত্রে, সুকৃতের ক্ষেত্রে, তোমাকে তোমার পতির সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।"

ঋক্ ১০।৮৫।২৪ অথর্ব ১৪।১।১৯

"শ্বশুরের পক্ষে তুমি আনন্দদায়িনী হও। পতির, পতিগৃহের সর্বপরিজনের আনন্দদায়িনী হও। যে-আনন্দ সকলকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে,—এমন আনন্দ তুমি সর্বজনকে দান কর।"

অথর্ব, ১৪।২।২৭

"তোমরা উভয়ে এইখানেই থাকো। তোমাদের যেন বিয়োগ না হয়। তোমরা সমগ্র আয়ু লাভ করো এবং পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত আনন্দিত হইয়া নিজের গৃহে ক্রীড়া করো।"

ঋক্, ১০।৮৫।৪২ অথর্ব, ১৪।১।২২

"নদীগণের মধ্যে যেমন সিন্ধু, আপন মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য বশত, অধীশ্বর হইয়াছেন, তুমিও তেমনি পতিগৃহে গমন করিয়া আপন মহত্ত্ব ও দাক্ষিণ্য-গুণে সম্রাজ্ঞীপদ গ্রহণ করো।"

অথর্ব, ১৪।১।৪৩

"এই গৃহে, প্রজাতে, সমৃদ্ধিতে, দিনে দিনে তুমি সমৃদ্ধ হইয়া ওঠো। গৃহপতির ধর্মের জন্য, এই গৃহে তুমি জাগ্রত থাকো। ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুপ্রবুদ্ধ হইয়া, প্রথমজ্যোতির্মুকুটভূষণা উজ্জ্বলা ঊষার সঙ্গে, তুমি নিত্য প্রতিজাগ্রত হও।"

ঋক্, ১০।৮৫।২৭ অথর্ব, ১৪।১।২১

"পূর্বে, পশ্চাতে, অন্তে, মধ্যে সর্বত্র ব্রহ্ম তোমাদের সহিত যুক্ত থাকুন। সকল বিঘ্ন বাধার অতীত দেবমন্দিরের মতো, এই গৃহে আজ প্রবেশ করিয়া, কল্যাণে, আনন্দে, পরিপূর্ণ হইয়া, তুমি পতিলোকে বিরাজ কর।" অথর্ব, ১৪।১।৬৪

"যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি বহুপ্রকার শক্তিযোগে, প্রজাদিগের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনসমূহ বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, আদ্য, অন্ত ও মধ্য যাঁহাতে পরিব্যাপ্ত, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করুন।"

গান

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে
আজি হে নবীন সংসারী!
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।

সমাপ্তিমন্ত্র

আচার্য (রবীন্দ্রনাথ)

"পূর্ণ হইতে তিনি পূর্ণকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তোলেন। পূর্ণের দ্বারাই তাহা অভিষিক্ত। আমরা যেন অদ্য জানিতে পারি—কোন্ পূর্ণতা হইতে ইহা পরিষিক্ত হইতেছে।" অথর্ব ১০।৮।২৯

"এই বধূ কল্যাণবতী। আপনারা সকলে সমবেত হইয়া ইহাকে দর্শন করুন। এবং ইহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া গৃহে গমন করুন।"

ঋক্ ১০।৮৫।৩৩ অথর্ব ১৪।২।২৮ ইত্যাদি

সভ্যগণ

স্বস্তি। স্বস্তি। স্বস্তি (কল্যাণ হউক)!

গান

দুজনের সত্যসাক্ষী যিনি
অন্তর্যামী।
নমি তাঁরে আমি নমি।*

উত্তরায়ণ ১৪ই পৌষ, ১৩৪৬। নবজাতক, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৫

* এই বিবাহটির বৈশিষ্ট্য হলো—আচারনিষ্ঠ স্বপাকভোজী পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অংশগ্রহণ করা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আচার্য এবং পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী পুরোহিত এমন বিবাহ শান্তিনিকেতনে আর কখনো ঘটেনি। সেই দিক থেকে এই বিবাহ অনন্য এবং অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঐ বিবাহমন্ত্রগুলির উপর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর দৌহিত্রী নন্দিতার বিবাহেও তিনি ঐ মন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রতি, তা যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন—রবীন্দ্রনাথের কীরূপ শ্রদ্ধা ছিল—তার উদাহরণ নিম্নোক্ত ঘটনা হতে পাওয়া যাবে।

১৩৩৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিনে, সন্ধ্যায় কলা-ভবনের চৌহদ্দির মধ্যে, বিদ্যালয়েরই এক গৃহে এক বিবাহ অনুষ্ঠান হয়।

রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে,[৩] সনাতনী পদ্ধতিতে, হোম ও শালগ্রামশিলাসহ, সেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আদেশে সেদিন আমাকেই পৌরোহিত্য করতে হয়। জীবনে সেই আমার প্রথম পৌরোহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যার বিবাহ। তাই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপস্থিত ছিলেন বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, একান্ত শ্রদ্ধাভরে উপবিষ্ট ছিলেন।

তার পরদিন সকালে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি দেখলাম—বেশ ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ! তাঁর সেদিনের কথাগুলি আজও কানে বাজছে:

"...এরা বর্বর! বিবাহবাসরে এরা হাসছিল। বিবাহ যে জীবনের কতো বড় ঘটনা—তা এরা বোঝে না!...আমার নন্দিতার বিবাহ দিলে, আমি এ বর্বরের জায়গায় দেব না!"

"সাধুর রাগ—জলের দাগ।" নন্দিতার বিবাহ তিনি শান্তিনিকেতনেই দিয়েছিলেন।

বিবাহসংস্কারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কতদূর শ্রদ্ধা ছিল—তাই বোঝাবার জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করলাম।

৩. "অবতারণা"য় এর বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

লো কো ত্ত র

১৯২৮-৩১ সাল। একদিন সন্ধ্যায় উদয়নের প্রাঙ্গণে কবি বিদ্যা-ভবনের প্রবীণ অধ্যাপকদের কাছে তাঁর জীবনের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলে চলেছেন ঃ

"......আমার জীবনে কয়েকবার আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছে—যার কথা কোথাও কোথাও লিখেছি।

"......একবার স্নানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, আমার দেহ আর আমি ভিন্ন—স্পষ্ট দেখলুম, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে...

"...এরূপ অনুভূতি আসে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।"

নবীন হলেও আমিও সে আসরে উপস্থিত ছিলাম। আমার কিছু প্রশ্ন করবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রবীণ গুরুজনদের সামনে মুখ খুলতে সংকোচ হয়, তাই পরদিন তাঁকে একা পেয়ে প্রশ্ন করি ঃ

"আচ্ছা, আপনি যে কাল বললেন—'এ-রূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতি মুহূর্তের জন্যে আসে কিন্তু স্থায়ী হয় না,—এতে আমার মনে বেশ সংশয় জন্মেছে।"

তিনি বললেন ঃ

"বুঝেছি তুই কি বলতে চাস্। কারো জীবনেই এ স্থায়ী হয় না —এ আমার বলবার উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা সাধক তাঁদের জীবনে হয়তো স্থায়ী হয়, হয়তো কেন স্থায়ী হয় এমন সাধক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু আমার বলবার ছিল আমার জীবনে স্থায়ী হয়নি।

"বিধাতার তা অভিপ্রায় ছিল না। আমাকে তিনি কবি করে পাঠিয়েছেন, যোগী করতে চাননি। কবির কাছে সৃষ্টির রহস্যের দ্বার মুহূর্তের জন্য তিনি খুলে ধরেছেন।

"সমস্ত তত্ত্বের আভাসমাত্র তিনি আমার গোচরে এনেছেন। কবির জীবনে তার বেশি প্রয়োজন নেই।"

যাই হোক, কবির সাধনা এবং ঐ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধি, যা তাঁর জীবনে ক্ষণেকের জন্য হলেও মাঝে মাঝে এসেছে—তাই তাঁকে আশ্চর্য শক্তি দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে কবির অন্তরঙ্গ সহকর্মী শ্রদ্ধাস্পদ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম:

"[কবির] সাধকরূপটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে।

…শোন দুটি প্রমাণ দিচ্ছি:

প্রথম প্রমাণ—একটি চিঠি, স্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'রাত্রে বৈঠকখানায় শুয়েছিলাম, একটা কাঁকড়াবিছে কামড়াল। অসহ্য যন্ত্রণা। তখন মনে মনে ভাবলুম, যাকে কামড়েছে সে অন্য এক রবি ঠাকুর, আমি নই। যন্ত্রণা চলে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।[১]

---

১ "একদিন রাত্রে বৈঠকখানায় ঘুমচ্ছিলাম সেই অবস্থায় আমার পায়ে বিছে কামড়ায়—যখন খুব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল আমি আমার সেই কষ্টকে, আমার দেহকে আমার আপনার থেকে বাইরের জিনিষ বলে অনুভব করতে চেষ্টা করলুম—ডাক্তার যেমন অন্য রোগীর যোগযন্ত্রণা দেখে, আমি তেমনি করে আমার পায়ের কষ্ট দেখতে লাগলুম—আশ্চর্য ফল হলো—শরীরে কষ্ট হতে লাগল অথচ সেটা আমার মনকে এত কম ক্লিষ্ট করলে যে আমি সেই যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমতে পারলুম। তার থেকে আমি যেন মুক্তির একট নতুন পথ পেলুম। এখন আমি সুখদুঃখকে আমার বাইরের জিনিষ এই ক্ষণিক পৃথিবীর জিনিষ বলে অনেক সময় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারি—তার মতো শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় আর নেই।"

[কলকাতা। ২৮ অগষ্ট, ১৮৯৯] চিঠিপত্র, প্রথমখণ্ড, (সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত) পৃষ্ঠা, ৩৯-৪০।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ

গীতালি কাব্যে চারটি কবিতা দেখতে পাবে।

প্রথম—পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে।

দ্বিতীয়—জীবন আমার যে অমৃত।

তৃতীয়—সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি।

চতুর্থ—[ওগো] পথের সাথি, নমি বারম্বার।

কবিতা চারটির রচনাস্থল লেখা আছে দেখবে ঃ

প্রথমটায়—বেলা স্টেশন।

দ্বিতীয়টায়—পাল্কিপথে বেলা।

তৃতীয়টায়—পাল্কিপথে বেলা।

চতুর্থটায়—রেলপথে বেলা হইতে গয়ায়।

কী অবস্থায় কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল শোন ঃ

রবীন্দ্রনাথ গয়ায় বেড়াতে গেছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তখন গয়াতে থাকেন। প্রভাতবাবু কবিকে বললেন —গয়া থেকে কয়েক মাইল দূরে 'বেলা' স্টেশন। ট্রেনে ঘন্টা দুই লাগে। সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা পুরানো বুদ্ধমন্দির আছে। আপনি যদি দেখতে ইচ্ছা করেন, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেটা আমার এক মক্কেলের জমিদারীর মধ্যে। স্টেশন থেকে পাল্কিতে যাবেন, কোনো অসুবিধে হবে না। সন্ধ্যার মধ্যেই গয়ায় ফিরে আসবেন।

কবি তখুনি রাজি।

যাবার দিনে ভোরবেলায় প্রভাতবাবু কবিকে ট্রেনে তুলে দিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে নিজে যেতে পারলেন না। সঙ্গে লোক দিলেন। সাড়ে আটটায় বেলা স্টেশনে পৌঁছে কবি দেখলেন—লোকজন নেই, পাল্কি নেই। সঙ্গের লোকটি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু করবার কিছু নেই। স্টেশন মাস্টার একখানা চেয়ার বের করে দিলেন। কবি সেই চেয়ারে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ

করলেন। প্রথম কবিতাটি লেখা হলো। সাড়ে দশটা নাগাদ এক-খানা পাল্কি এলো। পাল্কি চড়ে যেতে যেতে দ্বিতীয় কবিতাটি লেখা হলো। যেতে আড়াই ঘণ্টা লাগলো। গিয়ে দেখলেন সেখানে জনপ্রাণী নেই। বিহারের প্রচণ্ড রোদ। পাহাড়ের উপর গুহা। পাহাড়ে ওঠা হলো না। দূর থেকে মন্দির দেখে পাল্কি চড়লেন। কারণ সাড়ে চারটেয় ফেরবার ট্রেন।

—খাওয়া দাওয়া ?

—সকাল থেকে একবিন্দু জলও পেটে পড়েনি। ফেরবার সময় পথে দেখলেন, তিন চারখানি গোরুর গাড়ি তাঁবু ও মালপত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। যাক, ফেরবার পথে পাল্কিতে বসে তৃতীয় কবিতাটি লেখা হলো। সাড়ে চারটেয় ট্রেন এলো। ট্রেনে চেপে চতুর্থ কবিতাটি লিখলেন।

—ওই অবস্থায় কবিতা এলো ? আর ওই সব কবিতা ?

—হ্যাঁ হে। সেই জন্যই তো তাঁকে সাধক বলছিলাম।”

বিসর্জন নাটকের অভিনয় হবে, এম্পায়ার থিয়েটারে। ওর এখন-কার নাম হলো রক্সি। রবীন্দ্রনাথ জয়সিংহ। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধকে যুবক জয়সিংহ রূপে দেখে মুগ্ধ হলাম। অভিনয় দেখে সোজা বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোয় গেছি। একতলায় রথীবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখামাত্র বললেন—‘কাল খুব বেঁচে গেছি।’

—‘কেন, ব্যাপারখানা কি ?

—‘সে কি ! কিছু বুঝতে পারেননি ?’

—‘না তো !’

—‘উপরে বাবার কাছে গিয়ে শুনুন।’

উপরে দোতলায় গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—‘কাল কী হয়েছিল ?’

—'আপনি কোন্ 'রো' তে বসেছিলেন ?'

—'সাত আট 'রো' পিছনে।'

—'তাহলে সেখান থেকেও বুঝতে পারেননি ? ব্যাপারটা কী কি হলো, শুনুন।

জয়সিংহ ও অপর্ণার একটি দৃশ্য। আমি জয়সিংহ, রাণু অপর্ণা। দুজনে কথা বলছি, চেয়ে দেখি ভিতরে আগুন জ্বলছে। রাণু তো পালাবে। পালালেই একটা বিশৃঙ্খলা। দর্শকেরা ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে। আগুনের জন্যে না হোক, ঠেলাঠেলিতে লোকে মারা পড়বে। তাছাড়া দেখছি আগুন নেবাবার জন্যে ভিতরকার লোকেরা খুবই চেষ্টা করছে, দমকলের আওয়াজও কানে এলো।

রাণুর হাতটা খুব জোরে ধরে, আগুনের দিকে তাকে পিছু করে দাঁড় করিয়ে আমি জয়সিংহের পার্ট বলে যেতে থাকলুম। আমার বলা শেষ হলো, এবার রাণু বলবে। কিন্তু দেখি তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। কি করি—আমিই বলে যেতে থাকলুম। প্রম্পটার চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ছ'সাত মিনিট বলবার পর আগুন নিবল। আমরা ভিতরে চলে গেলুম। এসব আপনারা কিছুই বুঝতে পারেননি ?'

—'মোটেই না।'

—'নাটকে নেই এমন সব কথা বলতে থাকলুম, আপনারা ধরতে পারলেন না ?'

—'আদৌ নয়। কিন্তু ছয় সাত মিনিটে তো অনেক কথাই বলতে হয়। ভিতরে আগুন জ্বলছে, যাকে বলছেন সে পালাতে ব্যস্ত ; এই অবস্থায় জয়সিংহের উপযোগী কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুগিয়ে যেতে থাকলেন ?'

—'আরে মশায়, এতো আমারই লেখা বই, এ, আর শক্ত কি ?'

—"সংকলন", উল্টোরথ, আষাঢ়, ১৮৮৬ শকাব্দ
জুন-জুলাই ১৯৬৪

আশ্রম জীবন

আদর্শ গুরু ● সৌভাগ্যবান শিষ্য ● ঋতু-উৎসব ● সঙ্গীতের আসর
বিচিত্র আশ্রমিক ● অনন্য বিদ্যার্থী ● সার্থক স্নাতক

❁
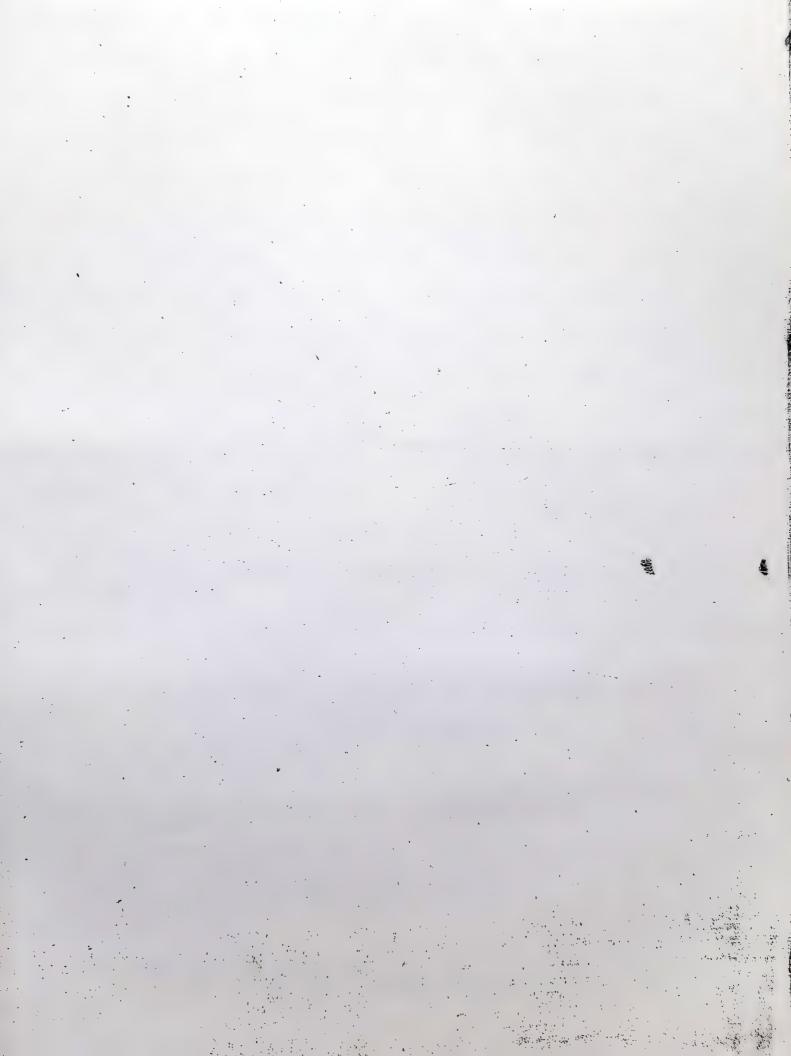
১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটার পর একটা আঘাত তাঁর উপর আসতে লাগল।

ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুই সবচেয়ে বড় আঘাত।

শমীন্দ্র তো দেহত্যাগ করলেন—কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব রয়ে গেল—আশ্রমের সব শিশুর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যেই শমীন্দ্রকে দেখতে পেলেন। তাই তিনি শমীন্দ্রের মতোই তাদের পালন করতে লাগলেন। একাধারে তিনি তাদের পিতা এবং মাতা।

ধন্য সে যুগের সেই শিশুরা! কত বড় হৃদয়ের কত বড় স্নেহ ভালোবাসা তারা পেয়ে গেছে।

তার অনেক পরে আমি এসেছি। কিন্তু আমি বা আমার সঙ্গের শিশুরা কি কম স্নেহ, কম ভালোবাসা পেয়েছি? সে সব কথা এই গ্রন্থের নানাস্থানেই লেখা হয়েছে।

১৯১৭ সালে আমি যখন এলাম, তখন আশ্রমে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা।[১] ভারতীয় মতে নিরামিষ। সুতরাং ডিমও নাই। তবে ডাল তরকারীতে পেঁয়াজ রসুন আছে—এবং প্রচুর পরিমাণেই আছে।

---

১ ১৯১৭ সালে আমার আসার পূর্বেও, শান্তিনিকেতনে কিছুদিন আমিষ-আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেইজন্যেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-উল্লিখিত আশ্রমসীমার বাইরে সেই পাকশালা নির্মিত হয়। মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে আমিষ-আহার নিষিদ্ধ।

ভাত, ভাজা, একটা পাঁচমিশেলি তরকারী, ডাল, আলুপটলের বা আলু-কপির ঝোল—অথবা ছানার বা ধোঁকার ডালনা, চাটনি ও দই। এই হলো দুপুরের খাবার। রাতের খাবারও সেইরূপ—তবে দই-এর বদলে দুধ। সকালের জলখাবার—চারখানা করে লুচি, সঙ্গে তরকারী, কোনদিন চারখানা চৌকা গজা বা জিবে গজা, কোনদিন বালুসাই, কোনদিন বা মোহনভোগ। বুধবারে ছুটির দিনে বোঁদে, মুড়ি, খিঁচড়ি অথবা পেঁড়াকি। এই তিনটিই ছিল ছাত্রদের কাছে লোভনীয় খাবার। বিকেলে চিঁড়ে দুধকলা, নিমকি বা সিঙ্গাড়া, কখনো বা চিঁড়েভাজার সঙ্গে চীনা বাদাম, ছোলা বা অন্যকোনো ডালভাজা, যাকে বলা হতো সাঁতলাভাজা, এবং যাকে আমি বাঁকুড়ার গ্রাম্য বালক না বুঝে বলতাম 'সাঁওতাল ভাজা।'

সকাল এবং বিকেলে এইরূপ প্রতিদিন নতুন নতুন মুখরোচক জল খাবার। এখনকার শিশুদের বলা ভাল সে-যুগে ভেজালের কথা তেমন শোনা যেতো না। খাঁটি ঘি-এর তৈরি সব খাবার, 'দালদা'র কল্পনাও তখন হয়নি।

নিরামিষ হলেও খাঁটি জিনিষ, মাঝে মাঝে ভাতের সঙ্গে গাওয়া-ঘি, প্রচুর পরিমাণে ঘন ডাল, এবং যথেচ্ছ শাকসব্জী খেয়ে, নিয়মে থেকে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে, সর্বোপরি পরমস্নেহশীল রবীন্দ্রনাথের সতত সাহচর্যে ও রক্ষণাবেক্ষণে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মতো।

ফুটবল খেলে এবং দৌড় ঝাঁপ (high jump, long jump) দিয়ে বীরভূম জেলার সব কটি 'কাপ্' এবং 'শিলড্' তারা প্রতিবছর জয় করে আনতো।

ফুটবল খেলায় শান্তিনিকেতনের (প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত) উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এতই পটু ছিল যে কলকাতার বহু কলেজের 'টিম' খেলতে এসে তাদের কাছে হেরে যেতো। তারা নিজেরা হারতো খুবই কম।

মোহনবাগান পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে

আসতো। এক একবার তাদের দলে থাকতেন গোষ্ঠ পাল, বলাই চাটুজ্যে প্রভৃতি। সেই সময় আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদেরও কলকাতা থেকে আনাতে হতো। তাঁরা কেউ কেউ তখন নামকরা খেলোয়াড় যেমন—সূর্যি চক্রবর্তী! এছাড়া আমাদের এক শিক্ষক যিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র এবং মোহনবাগানের এক সময়ের নামকরা খেলোয়াড় গৌর (গোপাল ঘোষ)-দাও তখন বুট পরে খেলতে নামতেন। বাইশ জনের মধ্যে ঐ একমাত্র ছিলেন বুটপরা খেলোয়াড়!

শেষবার, খেলবার শেষদিকে, গোষ্ঠ পাল আহত হয়ে পড়ায় খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। মোহনবাগান তখন মাত্র এক গোলে এগিয়ে ছিল।

এমন যাদের স্বাস্থ্য তাদের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের স্নেহকাতর হৃদয় উদ্বিগ্ন হতো। তাঁর কেবলই মনে হতো—শরীর পোষণোপযোগী খাদ্য ছেলেরা ঠিক পাচ্ছে না।

সেজন্যে তাঁর কতরূপ প্রচেষ্টা! ভাতের চেয়ে আটা ময়দা বলকারী। এতএব পাঁউরুটির ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সেই পাঁউরুটি তৈরি করাতে হবে শান্তিনিকেতনেই।

বাঁকুড়া জেলার মল্লজাতি তখন পাঁউরুটি তৈরিতে নাম করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক বাঁকুড়ানিবাসী রাজেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কে বললেন, "রাজেন, তোমার জেলা থেকে একজন কারিগর আনাও।"

বাঁকুড়ার বেলেতোড়ের কাছের এক গ্রাম থেকে এল কারিগর।

পাকশালার পিছনেই তৈরি হলো পাঁউরুটি তৈরির এক বিচিত্র চুল্লী (oven)। ছাত্রদের পক্ষে সে-এক অতি আকর্ষণীয় বস্তু। রবীন্দ্রনাথের এ-ও এক উদ্দেশ্য ছিল—কেমন করে রুটি তৈরি হয়—ছেলেরা তা দেখুক।[২]

---

২ যা আমাদের খাওয়া-পরার জন্যে দরকার হয়—সেই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য বস্তু কেমন করে প্রস্তুত হয়, তাই দেখাবার জন্যে এবং খাঁটি জিনিষ পাবার জন্যে, রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে ঘানি বসিয়ে সরষের তেল, তাঁত

এরপর আমাদের জলখাবারের জন্যে নানারূপ পাঁউরুটি তৈরি হতে লাগল। তার মধ্যে মিষ্টি পাঁউরুটিটার কথা আমার বেশ মনে আছে।

সপ্তাহে তখন দু-তিন দিন, পাঁউরুটি-দুধ বা পাঁউরুটি-ডাল, জল-খাবার হতে লাগল।

নারকেল ও মধু নাকি খুব বলকারক। এতএব ছেলেদের বেশি করে নারকেল ও মধু খাওয়ানো হোক। যেমন ভাবা—তেমনি জমিদারি পতিসর থেকে গাড়ী বা নৌকা বোঝাই নারকেল ও টিন টিন মধু আনাতে লাগলেন।

ডালে নারকেল, তরকারীতে নারকেল, জলখাবারে নারকেল, নারকেল ভাজা, নারকেল কোরা—ছেলেরা নারকেল খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে উঠল।

মধুর ব্যাপারেও তাই, রুটির সঙ্গে মধু, লুচির সঙ্গে মধু, দুধে মধু, দই-এ মধু, হাতে মধু, পাতে মধু। মধু! মধু! মধু খেতে খেতেও ছেলেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল!

এতেও কবির উদ্বেগ যায় না।

অবশেষে এক একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞকে নিমন্ত্রণ করে আশ্রমে আনতে লাগলেন। তখনকার নামজাদা খাদ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন—রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

বসিয়ে কাপড়, গামছা, বিছানার চাদর এবং কুমোর এনে কুঁজো, খোলা তৈরি করাতে লাগলেন!

কুমোরের চাকে কী ভাবে সামান্য একতাল মাটি থেকে, কতরকমের বিচিত্র সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাই দেখবার জন্যে, ছেলেরা সেই কারিগরের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াত। সেই কারিগরের চাকটিও বসানো হয়েছিল শিশুবিভাগের (বর্তমান সন্তোষালয়ের) সামনের বটতলায়!

আমার বেশ মনে আছে—সেই কারিগরের তৈরি খোলা দিয়ে পাকশালার পিছনে সেখানকার কর্মীদের বাসগৃহের আচ্ছাদন তৈরি হয়েছিল।

একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

আম্রকুঞ্জে তিনি খাদ্যসম্বন্ধে আলোচনা করবেন। 'কারমাইকেল' বেদীতে রবীন্দ্রনাথের পাশে তিনি বসেছেন। আমরা সব বালখিল্যের দল সামনের শতরঞ্চিতে বসে আছি—এক পাশে আছেন শিক্ষকেরা।

খাদ্য ভালো লাগলেও খাদ্যের উপাদান-বিষয়ক-বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শিশুদের মোটেই ভালো লাগছিল না। আমরা সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় কানে গেল ডাক্তারবাবু বলছেন:

'হপ্তায় দুদিন করে খিচুড়ি খেতে দেবেন।' বাস্! অমনি আমাদের তন্দ্রা ছুটে গেল। আমরা ঘাড় উঁচু করে শুনতে লাগলাম।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য শুনলাম: "খিচুড়ির উপকারিতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই! যার নাম শোনামাত্রই ছেলেরা চাঙা হয়ে ওঠে, সে-জিনিস খেলে তারা যে বেশ বলবান হবে—তাতে আর সন্দেহ কি?"

এরপর কখনো নিরামিষ, কখনো আমিষ—এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে—এক সময়ে সম্পূর্ণভাবে আমিষের চিরস্থায়ী প্রচলন হলো।

সে-সময়ও একজন কলকাতার প্রসিদ্ধ খাদ্যবিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি স্বনামধন্য ডাক্তার অমূল্য উকিল।

সিংহসদনে তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। তাঁর বক্তব্যের সার কথা:

"যদি...এই পরিমাণ দুধ, দই,...এই পরিমাণ ছানা...এই পরিমাণ ঘি, ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে পারেন, তা হলে নিরামিষই চলুক। না হলে, মাছ, মাংস, ডিম **খাওয়াতেই** হবে।"

সে-পরিমাণ দুধ বা দুধজাতীয় খাদ্য সরবরাহ করা, একেবারেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং সেই থেকে (১৯২৪-২৭?) পুরোপুরি আমিষের প্রবর্তন হলো।

অন্য প্রদেশের নিরামিষাশী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পৃথক নিরামিষ পাকশালার ব্যবস্থা হলো। তখন গুজরাটী ছেলেমেয়ের সংখ্যাধিক্য

থাকায়, সেই পাকশালার নাম হয় 'গুজরাটী কিচেন'।

আমরা কেউ কেউ মাঝে মাঝে মুখ বদলানোর জন্যে 'গুজরাটী কিচেনে' খেতে যেতাম। তাতে বাধা ছিল না। কিন্তু গুজরাটী বা অন্য নিরামিষাশীর মুখ বদলাবার সেরূপ কোনো সুযোগ ছিল না।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিয়ে কবির পরীক্ষানিরীক্ষার আর অন্ত নাই।

কেবল ভাত খেলে যে-পুষ্টি হয়—তার চেয়ে ভাত ও রুটি খেলে নিশ্চয়ই অধিকতর পুষ্টি হয়। অতএব বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের জন্যেও একবেলা রুটির ব্যবস্থা করা হোক।

রাত্রে ভাতের বদলে রুটি দেওয়া হলো। তাতে কিন্তু পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের ঘোর আপত্তি! তখন আবার তাদেরি সংখ্যাধিক্য! অতএব একটা রফা করা হলো—যার খুশি ভাত এবং যার খুশি রুটি খেতে পারে। কেউ ইচ্ছা করলে ভাত ও রুটি দুই-ই খেতে পারে।

সে সময় পাকশালায় টেবিল ও বেঞ্চির চলন হয়েছে। রাত্রে খাবার টেবিলে খান চার রুটি দেওয়া হতো। পূর্ববঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা এসেই সে রুটি অন্য থালায় চালান করে দিয়ে, তবে বেঞ্চিতে বসত।

বরিশালের একটি ছেলে বেঞ্চিতে বসবার আগেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে, রুটিটা অন্যত্র চালান করতো। রুটির দর্শনও তার কাছে অসহ্য!

একদিন আমি তাকে শুধাই—"আচ্ছা! রুটি খেতে আপত্তিটা কি?"

"রুটি খেয়ে পেট ভরে না!"

আমি তো অবাক! সেটা এখনকার মতো 'রেশন'-এর যুগ নয়! রুটি যে-যত চায়, দেওয়া হয়। একটি কলাভবনের ছেলে তো আশিটা রুটি খায়। তাই তাকে বললাম—

"রুটি তো যত খুশি নিয়ে খেতে পারো!"

শিশুর মতো হেসে সে বললে :

"তা তো পারি! কিন্তু খেয়েই যাই—খেয়েই যাই! পেট যে কখন ভরবে, বুঝতেই পারি না। তাই রুটি খেতে চাই না!"

সৌভাগ্যবান শিষ্য

(১৯১৭-১৮)

●

"একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়।" নৈবেদ্য

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র এই পংক্তি দুটি, আমরা তাঁরই প্রতি নিবেদন করতে পারি।

তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আমরা, তাঁর পুত্র পৌত্রের ন্যায় বালকেরা, তাঁর 'নীড়' রূপটিই দর্শন করেছিলাম।

১৩২৪ (১৯১৭) সালের শ্রাবণ মাসে, আমি তাঁর আশ্রমে আশ্রয় পাই। বয়স তখন আমার এগারো।

তখন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'দেহলী'র উপরতলায়।

আশ্রমে বালকদের বাসের জন্যে গুটিকয়েক ছাত্রাবাস ছিল। সত্যকুটির, মোহিতকুটির, সতীশকুটির, বলভীকুটির, বীথিকা ও বাগানবাড়ি।

বাড়িগুলির মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল এবং মেঝে চূণসুরকি দিয়ে বাঁধানো। সবগুলিই একটানা এক-একখানা লম্বা ঘর। তারই এক-একটিতে কুড়ি পঁচিশজন ছাত্র এবং দু-একজন শিক্ষক বাস করতেন।

প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে একটি করে কাঠের খাট এবং 'ডেস্ক'। এই সামান্য আসবাব।

বীথিকা-গৃহের আবার খাট ও 'ডেস্ক' দুই-ই চূণসুরকি দিয়ে তৈরি। সে এক বিচিত্র ব্যবস্থা।

দেহলীর কাছে যে শালবীথি শুরু হয়েছে সেখানেই ছিল এই বীথিকা-গৃহ। তার অভিনব ব্যবস্থার জন্যে সেটি ছিল বালকদের পক্ষে লোভনীয়। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের বেশ কাছেই থাকতো তারা।

তাই বলে যারা দূরে থাকতো, তারা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য কম পেতো না।

সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, অতি অন্তরঙ্গভাবে, ছাত্রদের সময় অতিবাহিত হতো।

তখন উঠতে হতো ভোর চারটা, সাড়ে চারটায়। ক্লাস আরম্ভ হতো সাড়ে ছ'টায় এবং শেষ হতো সাড়ে দশটায়। আবার বিকেল দু'টো আড়াইটায় ক্লাস শুরু হতো এবং সাড়ে চারটা পাঁচটায় শেষ হতো।

সবই প্রায় এখনকার পাঠভবনের মতো; তবে উঠতে হতো তখন আরও ভোরে।

রবীন্দ্রনাথ আবার আমাদের চেয়েও ভোরে উঠতেন। আমরা যখন বিছানাপত্র গুটিয়ে, শৌচে যেতাম, তখন তাঁর স্নান পর্যন্ত সারা হয়ে যেতো। দেখতাম এক হেলান-চেয়ারে তিনি তখন চুপচাপ বসে।

সারা সকাল তিনি ছোটদের ক্লাস নিতেন। আমরা তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছি। ছোটদের ইংরেজি ক্লাসই তিনি বেশি নিতেন।

দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষাকে, শিশুদের কাছে সহজ সুবোধ্য করার জন্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

দুপুর বেলায়, তিনি পরের দিনের পাঠ তৈরি করতেন। সেগুলি দুটি খাতায় লিখে নিতেন। একটিতে ইংরেজি, আর একটিতে তার বিশুদ্ধ বাঙলা তর্জমা।

সদা-ক্লাস-পালানো ছেলেরা তাঁর ক্লাসে আগে ভাগে আসতো। এমনি আকর্ষণীয় ছিল তাঁর সরস, সরল শিক্ষাদান!

বিকেলবেলায়, কখনো কখনো তিনি আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে 'খোয়াই'-এ এবং পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়

'পারুল বনে,' একসঙ্গে গান করতে করতে বেড়ানো বেশ উপভোগ্য হতো।

সন্ধ্যায়, 'বিনোদন পর্বে,' মজার মজার নাটকের অভিনয় করিয়ে তিনি আমাদের চিত্তবিনোদন করতেন।

কখনো বা রাত ন'টায় পালা করে এক এক ঘরে ছেলেদের গল্প শোনাতেন, ছেলেদেরই কারো বিছানো বিছানায় তিনি বসতেন। সকলে তাঁকে ঘিরে বসতো। তারপর তিনি গল্প বলতেন। গল্প শুনতে শুনতে খুব ছোটরা, আশে পাশে, কেউ বা তাঁর কোলে, ঘুমিয়ে পড়তো।

এরপর তিনি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আশ্রম প্রদক্ষিণ করতেন। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের পাশ দিয়ে ঘুরতেন। খোলা দরজা জানালা দিয়ে দেখতেন—সকলে ঠিকমত বিছানা পেতে শুয়েছে কিনা এবং সব দরজা জানালা খোলা আছে কিনা।

দৈর্ঘ্যে দীর্ঘ ছাত্রাবাসগুলির দরজা জানলা ছিল অসংখ্য। দেওয়াল নামমাত্র। শীতকালেও কোনো দরজা জানালা বন্ধ করা হতো না।

কোনো নবাগত ছাত্র না-জেনে, তার জানালা বন্ধ করে রাখলে, রবীন্দ্রনাথ তা খুলে দিয়ে যেতেন।

ঐরূপ দরজা-জানালা-খোলা ছাত্রাবাসেই ছাত্রদের বাক্স-পোটলাগুলি থাকতো—কখনো চুরি যায়নি।

এতক্ষণ আমি কেবল ছাত্রদের কথাই বললাম। ছাত্রীদের কথা একবারও উল্লেখ করিনি। তার কারণ তখনো ছাত্রীদের থাকার জন্যে কোনো আবাস তৈরি হয়নি।

শিক্ষকদের মাত্র কয়েকজনের বাসা ছিল। সেই বাসাতে তাঁদেরই কন্যা, ভাইঝি, ভগিনী, ভাগিনেয়ীরা থাকতো এবং তারাই তখন আশ্রমের ছাত্রী ছিল। সংখ্যা তাদের নগণ্য।[১]

---

১ স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী,

রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজি, বাঙলা এমন কি সংস্কৃত ক্লাসও নিয়েছেন। সংস্কৃত ক্লাস নিতে আমি দেখিনি। সেটা ইংরেজি ১৯০৬-১৯০৯ সালের কথা।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাইরে যেতেন, তখন আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতেন 'অ্যাণ্ডরুজ সাহেব' এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। অ্যাণ্ডরুজ সাহেব প্রায়ই বাইরে যেতেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে কোনো শিক্ষকও উপস্থিত থাকতেন। তাঁরা তখন তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতেন।

আমরা বালক বালিকারা রবীন্দ্রনাথকে পিতা বা পিতামহের মতো মনে করতাম। তিনি যে পৃথিবী-বিখ্যাত এক মহাকবি বা মহাপুরুষ, সেরূপ কিছু ভাবতে পারতাম না।

অর্থাৎ তিনি আমাদের কাছে 'নীড়'-ই ছিলেন। তাঁর 'আকাশ' রূপ আমাদের শিশুদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। ওই 'নীড়'-এর মধ্যেই 'আকাশ'-কে যতটুকু দেখা যেতো, তাই দেখতাম।

রবীন্দ্রনাথ আজ ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও 'গুরুদেব' বলে পরিচিত।

আমরা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালক বালিকারা, কখনো তাঁকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করিনি। নিজেদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার সময়ই কেবল গুরুদেব বলতাম। রবীবাবু বা রবীন্দ্রনাথ বলতাম না।

এতক্ষণ যা বললাম—অনেকেরই কাছে তা মনে হবে রূপকথা। এ রূপকথার মতোই মনোহর—কিন্তু মিথ্যা নয়। আমি যা দেখেছি তাই বললাম।

অনেকেই প্রশ্ন করেন—"ছাত্রছাত্রীর জন্যে তিনি যদি এমনভাবে

প্রভৃতি শিক্ষকগণের পুত্র, কন্যা, ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, ভগিনী, ভাগ্নে, ভাগ্নীগণ ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রছাত্রী ছিলেন। তাঁদের সংখ্যাসমেত তখন আশ্রমের ছাত্রছাত্রী ছিল দু'শর মতো।

সময় দিয়েছেন—তবে লিখেছেন কখন ?”

কিন্তু ওরই মাঝে তিনি সময় পেয়েছেন—এবং যতটুকু সময় পেয়েছেন—তারই মধ্যে অজস্র লিখে গেছেন।

রাত এগারোটা পর্যন্ত তিনি জেগে থাকতেন এবং চারটার আগেই উঠে পড়তেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড় জোর পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যেতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না।

মৃত্যুর দু'তিন বছর আগে পর্যন্ত তাঁকে ঘুমোতে দেখিনি।

আমার বেশ মনে আছে—১৯৩৮-৩৯ সালে, দুপুর একটা থেকে চারটা পর্যন্ত, কয়েকদিন বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঘরে ঢুকেছি। তাঁকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখিনি।

একটা কাঠের হেলান-চেয়ারে বসে বই পড়তে দেখেছি। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছি—কথা বলিনি, তিনিও বলেননি।

শেষে একদিন আমিই প্রথম কথা বলি :

“দুপুরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, আপনার ঘরে ঢুকেছি—একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—”

তিনি চোখের কোণে চেয়ে বললেন—

“উদ্দেশ্যটা কি ?”

“দিনে, কোনো সময় ঘুমোন কিনা—দেখা !”

“কী দেখলি ?”

“একেবারেই ঘুমোন না !”

তিনি মৃদুহাস্যে কতকটা পরিহাসের সুরে বললেন :

“পৈতের সময় প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল—'মা দিবা স্বাপ্সীঃ—দিনে ঘুমিয়ো না।' আমরা সেকেলে মানুষ। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করতে হয়—এই ছিল আমাদের বিশ্বাস। তাই যতটা পারি প্রতিজ্ঞা পালন করছি।”

পরিহাস বিজল্পিত হলেও কথাটা সত্য।

জিতনিদ্র রবীন্দ্রনাথের সময়ের অভাব ঘটেনি। তাই তিনি এত

সৃষ্টি করে গেছেন।

অনেকে মনে করেন—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালক-বালিকারাও তাঁর মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করে সারা পৃথিবীকে বঞ্চিত করেছে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনো একথা ভাবেননি। ছাত্রছাত্রীরা ছিল তাঁর সন্তান। সন্তানের পরিচর্যায় সময়ের অপব্যয় হয়—এমন কথা কোনো পিতা কি মনে করতে পারেন?

আর সময়ের ঐরূপ 'অপব্যয়' না হলে, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শিশুসাহিত্য হতে পৃথিবী বঞ্চিত হতো!

ব্রহ্মচর্যাশ্রমই ধীরে ধীরে 'বিশ্বের নীড়' 'বিশ্বভারতী'তে পরিণত হয়। এও তাঁর মূল্যবান সময়ের ওই 'অপব্যয়-এর জন্যই সম্ভব হয়।[২]

—নবজাতক, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৯-৮০।

---

২. কবি বলেছেন—"বিশ্বভারতীও তাঁর এক কাব্য।"

"When he (the poet) brought together a few boys, one Sunday in winter, among the warm shadows of the sal trees strong, straight and tall, with branches of a dignified moderation, he started to **write a Poem in a medium not of words**"—A Poet's School Viswa-Bharati Bulletin No. 9, page 1.

ঋতু-উৎসব

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সরস্বতী পূজা-উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হতো। ঐ দিনটি তখন 'শ্রীপঞ্চমী' নামে পরিচিত ছিল। শ্রীপঞ্চমীতে আশ্রমে অনুষ্ঠিত হতো—'বসন্তের আবাহন'।

আম্রকুঞ্জের 'কারমাইকেল'-বেদীতে[১] অথবা অন্যত্র সুরবাহার এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র একত্রিত করে আমের মুকুল, ফুলের মালা দিয়ে তাদের অলংকৃত করা হতো। ধূপ-ধুনো এবং ফুলের গন্ধে সেখানে সৃষ্টি হতো এক পূজার পরিবেশ।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতি সঙ্গীতনায়কগণ তাঁদের শিষ্যশিষ্যাসহ সমবেত হতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে-উৎসবে পৌরোহিত্য করতেন। শিষ্যপরিবৃত দিনেন্দ্রনাথ ও ভীমরাও-এর অমায়িক কণ্ঠস্বরে সমস্ত আশ্রম 'গম গম' করত।

এদিকে আশ্রমের ছাত্রগণও তাদের ছাত্রাবাসে অনুরূপ পদ্ধতিতে শ্রী বা সরস্বতীর আবাহন করত। তাদের ঘর ফুলের মালায়, আমের মুকুলে সাজানো হতো। নিজেদের বইগুলি গুছিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে তারা ভক্তিভরে অবস্থান করত।

পৌত্তলিকতা-বিরোধী কোনো এক গোঁড়া শিক্ষক একবার ছেলেদের এই ধরনের পূজোচিত আয়োজন বরদাস্ত করতে না পেরে ফুলের মালা,

১. দিন-বিশেষের বিশিষ্ট একটি দৃশ্য শিশুমনে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। আম্রকুঞ্জের 'কারমাইকেল'-বেদির দৃশ্যটিই আমার মনে ছাপ রেখে গেছে।

ধূপ-ধুনো সব টান মেরে ফেলে দেন।

ছেলেদের দু'জন মুখপাত্র তাদের গুরুদেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। তাদের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। শেষে বললেন :

"যা তোরা আবার তেমনি করে সব সাজা গিয়ে। আর ওকে (শিক্ষকটিকে) আমার কাছে পাঠিয়ে দে।"

ছেলেরা মহা-উৎসাহে, আবার গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে ঘর সাজাল। আমের মুকুল এনে 'ডেস্কের' উপর রাখল—সেখানে ধূপ ও ধুনো দিল। উপরন্তু নিজ নিজ থালা বাটি বাজিয়ে পথচারীদের আহ্বান করল।

ঐ অপরূপ বাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে—সেই শিক্ষকমহাশয়ও সেখানে এলেন —এসেই তো তিনি অগ্নিশর্মা। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই ছেলেরা বলে উঠল—"গুরুদেব আমাদের অনুমতি দিয়েছেন আর তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

শিক্ষক মহাশয় তাঁর গুরু এবং শিষ্য উভয়ের কাছ থেকেই সেদিন যথেষ্ট শিক্ষালাভ করলেন।

রবীন্দ্রনার মূর্তিপূজোর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত রীতির উৎসব তিনি সমর্থন করতেন। তাতে প্রফুল্লচিত্তে নেতৃত্ব করতেন।

শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমার দিনে বসন্তোৎসব তিনিই প্রবর্তন করেন। আজও সেইভাবেই তা চলে আসছে। সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথের এ যে কত বড় দান তা যাঁরা শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব দেখেছেন তাঁরাই জানেন।

বসন্তোৎসবের হোলিখেলা যে কত সুন্দর হতে পারে—তা শত শত দর্শক প্রতি বৎসর প্রত্যক্ষ করেছেন।

বসন্তোৎসব, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব প্রভৃতি ঋতু-উৎসব এ যুগে নতুন করে প্রবর্তন করেন কবি-রবীন্দ্রনাথ।

বারো বছর বয়সে আমি শান্তিনিকেতনে আসি। আসি অতি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার হতে। এবং তদুপরি এক অজ পল্লীগ্রাম হতে, তার পূর্বে তখনকার (১৯১৭ সালের) বোলপুরের মতো ছোট শহরও আমি দেখিনি।

সেই আমি যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম 'শারদোৎসব' দেখি তখন যেন এক অভিনব জগৎ আবিষ্কার করি। সেই শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর পাঠ নিয়েছিলেন।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও আমার মনে দুর্গোৎসবের চেয়ে 'শারদোৎসব'-এর প্রভাব বেশি পড়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের (একাধিকবার) অভিনীত 'শারদোৎসব' আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল থাকবে।

শান্তিনিকেতনের তখনকার 'নাট্যঘর'-এর ম্লান আলোতে রবীন্দ্রনাথ শারদ-লক্ষ্মীর আবাহন করলেন। বললেন :

"এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। এবারে সকলে মিলে 'শারদোৎসব'-এর আবাহন গান ধরো।

> "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা···
>
> ······আসন বিছানো নিভৃতকুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে···

পৌঁচেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছি শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না ?"

তাঁর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হলো। তারপরেই শুনলাম আবেগভরা কণ্ঠের গান—

> "লেগেছে অমল ধবল পালে
>
> ·········ওগো কাণ্ডারী কে গো তুমি কার
>
> হাসি কান্নার ধন—"

কী বুঝেছিলাম—কতটুকু বুঝেছিলাম। কিন্তু বোঝা-না-বোঝার ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথের আবেগ ভরা কণ্ঠস্বর, আন্তরিক অনুভূতি, আমার

প্রাণের তারে যে ঝঙ্কার দিয়েছিল, তা ব্যক্ত করবার শক্তি আমার নাই।

"তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
............পাবে আমার
দুখের অলংকার"

তাঁর কণ্ঠের এ-গান কোনোদিন ভুলতে পারব কি ? কোন্ অপরূপ জগতে সেই কিশোর বালকের মনকে তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কী সুধা-সাগরে অবগাহন করিয়েছিলেন, তা বোঝাবো কেমন করে ? সেদিনের সে-আনন্দ আর কোনোদিন ফিরে পাব কি ?

রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন। শিশু মনের সেই অপূর্ব অনুভূতির পথ আজ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ জ্ঞানলাভ করেছি—সমাজে বিজ্ঞ, পণ্ডিত নামে অভিহিত হচ্ছি। নানা ভাষার নানা সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি—কিন্তু সেই অশিক্ষিত শিশু মনটি হারিয়ে ফেলেছি।

কবির ভাষায় সংসার-"কারাগারের যে-খোলা দ্বার দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রবেশ করতো, তা আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে।"

যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলায় ঘোর আপত্তি জানাতাম। তখন কোনোদিন তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করিনি। কিন্তু আজ জীবনের প্রান্তভাগে এসে, মনে-প্রাণে অনুভব করছি—তিনিই আমার যথার্থ গুরু ছিলেন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুর্ উন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
......তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এই গ্রাম্য বালকের চোখ ফুটিয়ে যিনি সেই পরম সুন্দরের অরুণ চরণকমল প্রদর্শন করিয়েছিলেন সেই গুরুকে আজ প্রণতি জানাই।

—নবজাতক, রবীন্দ্র সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ১৩৭৪

"রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও আখর যোজনা"

'নবজাতক'-এর 'রবীন্দ্র সংখ্যায় (২য় খণ্ডে) শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পড়লাম। তিনি ঐ স্মৃতিকথায় (১৯৩৭ সালে ?) বরানগরের 'গুপ্তনিবাস'-এ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান ও আখর যোজনার কথা উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপ একটি ঘটনা শান্তিনিকেতনেই ঘটেছিল। সেটা ঘটেছিল ১৯২৩-২৮ সালের কোনো এক সময়ে।

বিশ্বভারতীর তখনকার গ্রন্থাগারের উপরতলায় (তখন সেখানে কলাভবন), বারান্দায় একদিন সন্ধ্যাবেলা শ্রীদিলীপকুমার রায়ের গানের জলসা বসে। সেই আসরে বেশ জনসমাগম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নেপথ্যে—অন্তরালে। তিনি ছিলেন দিলীপকুমারের পিছনে—ঘরের মধ্যে।

একটির পর একটি দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে চলেছেন দিলীপকুমার। সকলে নীরবে শুনছেন। সর্বশেষ তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরলেন। ধরলেন সেই—'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানটি।

প্রথমে সমস্ত গানটি অবিকল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরেই গাইলেন। তার পর তান ও আখর যোজনা আরম্ভ করলেন। সহসা শ্রোতৃগণকে চমকিত করে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন :

"দিলীপ, আমাকে রেহাই দাও।"

দিলীপকুমার তৎক্ষণাৎ গান থামিয়ে দিলেন।

এই সঙ্গে আরো দু-একটি উল্লেখযোগ্য মজলিসের কথা মনে পড়ছে। 'উদয়ন'-এর দক্ষিণের বৈঠকখানায় প্রাতঃকালে গানের আসর বসেছে। এসেছেন শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। তাঁরই গান হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার উদ্যোক্তা।

এর পূর্বে অন্য কোনো সমসাময়িক বাঙ্গালী কবির গানের আসর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত হতে আমি দেখি নাই।

একটার পর একটা নিজের গান গেয়ে চলেছেন—অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা সকলেই তাঁর মধুর কণ্ঠের আবেগ-ভরা সুরের ধারায় অবগাহন করছি। একটি গান এখনো মনে আছে—"ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলছ অনুক্ষণ। তোমার কাঁটায় ভরা বন, তোমার প্রেমে ভরা মন।"

এ গানটি তিনি কী সুন্দর গেয়েছিলেন[১]।

গোপালক্ষেপার নাচ

আম্রকুঞ্জের 'কারমাইকেল'-বেদীর[২] সামনে বাউল-নৃত্যের আয়োজন হয়েছে[৩]।

রবীন্দ্রনাথ গোপালক্ষেপার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন—তাই সভা করে তার নাচ দেখবেন এবং গান শুনবেন।

গোপাল বাঁয়া-সহযোগে বহু গান গাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছন্দোময় সাবলীল অপূর্ব-নৃত্য দর্শন করলাম।

---

১. সাল তারিখ মনে নাই—তবে দিলীপকুমারের ঐ গানের আসরের আগে।

২. ১৯১৫ সালে লর্ড্ কারমাইকেল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্যে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি দীর্ঘাকার আসন আম্রকুঞ্জের মধ্যে নির্মিত হয়। তাই কারমাইকেল বেদী বলে পরিচিত।

৩. ১৯২৬-২৮ সালের কোনো এক সময়ে।

অনুষ্ঠানের শেষে রবীন্দ্রনাথ সেই নৃত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

গোপালক্ষেপা তারপর বহুবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ পরম আগ্রহ-ভরে তাঁর নৃত্য দর্শন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরও গোপাল এসেছেন। তখন তাঁর নৃত্যের সমজদার আচার্য নন্দলাল। তাঁর কাছে গোপালের সমাদরের আর অন্ত ছিল না।

গোপালের নিবাস ছিল বাঁকুড়া জেলার (সোনামুখীর নিকটে) নফরডাঙা গ্রামে।

ক্লারা বাটের গান

১৯২৮ সাল। পাশ্চাত্যজগতের প্রসিদ্ধ গায়িকা ক্লারা বাট (Dame Clara Butt 1873-1936) শান্তিনিকেতনে এসেছেন। সিংহসদন-এ, তাঁর গান হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুখ্য শ্রোতা।

একটার পর একটা গান করে চলেছেন তিনি। অসংখ্য শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সে কী কণ্ঠ! কী তার মাধুর্য। ইউরোপীয় সঙ্গীতের সমজদার আমরা নই—কিন্তু এমন উচ্চ-মধুর-ভরাট কণ্ঠ আমরা কখনো শুনি নাই। মনে হচ্ছিল যেন সেই বিরাট সৌধ কেঁপে উঠছে!

দীর্ঘ সময় তাঁর গান চলেছিল। আমরা সকলেই শেষ পর্যন্ত ছিলাম।

তার পরে আর কেউ গাইবেন—সেকথা আমরা ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমাদের সকলকে চমকিত করে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন।

"নুটু, তুই একটা গা।"

আমরা স্তম্ভিত। গুরুদেব এ কী বলছেন! এর পর কি আর কারো গান জমে! তাও দিনুবাবু নন বা স্বয়ং তিনি[৪] নন! গাইবেন কিনা তাঁদের ছাত্রী 'নুটু'!

৪. রবীন্দ্রনাথের গানও শেষে তিনি শুনেছিলেন। সে-গানের আর কোনো শ্রোতা ছিলেন না। Dame Clara Butt তাঁর আত্মজীবনী "My life of song"-এ লিখেছেন :

কিন্তু নুটু নিঃসঙ্কোচে উঁচু পর্দায় গেয়ে উঠলেন ঃ

"না যেয়ো না, যেয়ো না ক"

গলা একটুও কাঁপল না। নির্ভীক, স্বাভাবিক সুললিতকণ্ঠে নুটু (রমা মজুমদার-কর) তাঁর গান শেষ করলেন।

ক্লারা বাটেরও তিনি প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

নুটুর গানের উপর রবীন্দ্রনাথের কী শ্রদ্ধা! কত বিশ্বাস! এবং নুটুরও সুরের উপর কী অধিকার! সেদিন আমাদের তা হৃদয়ঙ্গম হলো!

সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণা

সর্বশেষ পীঠাপুরম্-এর প্রসিদ্ধ বীণকার শ্রীসঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর[৫] কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি।

তিনি ছিলেন ওস্তাদ বীণকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুগ্ধ ভক্ত।

বর্তমান 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ' ঘরের উত্তরে যে-দুটি মাটির ঘর আছে তাদের মধ্যে থাকতেন কয়েকজন নামকরা ওস্তাদ। পণ্ডিত

"I should so much like to hear you". He made excuses, deprecating any claim to having a voice, but said at last, "I have had such pleasure from listening to your wonderful voice that, since you wish it, I shall sing to you."

With me alone for an audienec and without accompaniment of any kind he then, sang two or three songs of his own composition. Rarely have I been so much moved by anybody's singing as by that of the stately and venerable Poet; he sang with exquisite feeling and his voice···had a natural silvery sweetness".

Cf. V. B News, May June, 1936 এবং রবীন্দ্রজীবনী (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

৫. রবীন্দ্রনাথ যখন (১৯১৮ সালে) পীঠাপুরম্ যান, তখন তিনি সেখানেই প্রথম শ্রীসঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়ের বীণা শোনেন।

পীঠাপুরমের মহারাজের সম্মানিত অতিথিরূপে কবি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ

ভীমরাও শাস্ত্রী, শ্রীনকুলেশ্বর গোস্বামী এবং এই সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়। ঐ মাটির বাড়ির সামনেই একদিন (১৯২২-২৩) বীণার আসর বসে।

সঙ্গমেশ্বর বীণা বাজিয়ে চলেছেন। রাত গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন।

কতরাত্রে যে সে-বীণা নীরব হয়—তা মনে নাই। সুরের যাদু-স্পর্শে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর অবস্থানকালে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে, বীণাশিক্ষার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। স্বয়ং ভীমরাও শাস্ত্রী বীণা শেখেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে, বামন শিরোৎকর, অনাদিকুমার দস্তিদার, মালতী সেন (চৌধুরী), অমলকণা দাশগুপ্ত (খাস্তগীর) প্রভৃতি অনেকেই বহু পরিশ্রমে বীণা শিক্ষা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মালতী চৌধুরী আজও তাঁর রেওয়াজ রেখেছেন।

শান্তিনিকেতনে কিন্তু বীণা শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর সম্ভব হয়নি।

—নবজাতক, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৪

সহ সুন্দর এক বাংলোতে অবস্থান করেন।

সেই বাংলোর খোলা বারান্দায়, এক শুক্লা-সন্ধ্যায় সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণার ঝংকার শুরু হয়।

অতিথি নিবাসের সামনে এক লেবুকুঞ্জ। লেবুফুলের সুগন্ধ মিশ্রিত জ্যোৎস্নার স্রোতে এবং তার সঙ্গে সুরের ধারায় অবগাহন করে কবিচিত্ত পুলকিত হয়ে ওঠে।

এক একটি রাগের শেষে বীণকার কবির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর ইঙ্গিতে পুনরায় অন্য রাগ আরম্ভ করেন। এইভাবে রাত একটায় সে আসর ভাঙে।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধেই পীঠাপুরমের মহারাজ সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়কে শান্তিনিকেতনে পাঠান।

বি চি ত্র আ শ্র মি ক

বিচিত্র এই জগৎ! তার মধ্যেও বিচিত্রতর আমাদের শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতনের গুরুদেবের চরিত্র যেমন বিচিত্র, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণও তেমনি বিচিত্র চরিত্রের।

এমনি একটি চরিত্রের কথা আজ বলব। তাঁর নাম না বললেও তাঁকে চিনতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনদের অসুবিধা হবে না।

হৃষ্টপুষ্ট দেহ, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ। সব সময় কী এক ভাবের ঘোরে চলেছেন। ভাবুক এবং কবি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সবই তিনি প্রাণভরে উপভোগ করেন। বিশেষত রস-গ্রহণে তাঁর রসনার পটুত্ব সর্বজনবিদিত।

তিনি ছিলেন বেশ ভোজন-রসিক। সে-সময়ে সে-বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নির্বিচারে সর্বপ্রকার খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন। মাংস সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল বড় প্রবল। কোন্ প্রাণীর মাংস কেমন, তা তিনি যেমন জানতেন, তেমন আর কেউ জানতেন না। ইতর প্রাণীর মধ্যে বাদুড়, ব্যাঙ, কাঠবেড়ালী এবং ইন্দুরের মাংসেরও আস্বাদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ইন্দুরের মাংসাস্বাদের একটা কৌতুকপ্রদ ইতিহাস আছে। একবার তাঁদের বাড়িতে ইন্দুরের বড় উৎপাত হলো। বাড়িশুদ্ধ সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ইন্দুর ধরার কল পাতা হলো। একদিন একটি চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট ইন্দুর ধরা পড়ল। তাকে দেখে আমাদের এই বন্ধুটির বড় ভালো লাগল। অতএব তিনি তাকে আত্মসাৎ করলেন।

সেই থেকে ইন্দুরের মাংস খাওয়া আরম্ভ হলো। বাড়িতে ইন্দুর নিঃশেষ করার জন্যে কল পাতা হয়েছিল—ইন্দুর নিঃশেষ হওয়ায় স্বস্তি পাবার কথা। কিন্তু আমাদের বন্ধুটির মন খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা খাদ্যের ভাণ্ডার এই ভাবে নিঃশেষ হওয়ায় তাঁর বড়ই আফশোষ হতে লাগল।

যাক্। এবার তাঁর আহারের কথা বলি।

দোল পূর্ণিমা। ফাগ ও রঙের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমাদের ভাবুক বন্ধুটি নির্জন খোয়াই-এ পালিয়ে গেলেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। দুজনে মিলে বেলা বারটা পর্যন্ত খোয়াই-এ ঘুরলাম। ঘুরতে ঘুরতে কেয়াবনে কয়েকটা কেয়া পেয়ে গেলাম।

অসময়ের কেয়া! কাকে দেওয়া যায়? গুরুদেবকে তো দেবই—তা ছাড়া মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু মহাশয়কেও দিতে হবে।

গুরুদেব তো অসময়ের কেয়া পেয়ে খুব খুশি। মাস্টারমশাইও খুশি। তিনি আবার আমাদের খাইয়ে দিলেন। বিকেলের খাবার, কিন্তু আয়োজন দেখে মনে হলো—বেশ বড় রকমের ভোজ।

প্রকাণ্ড থালা ভর্তি লুচি। জামবাটি ভর্তি ডিমের ডালনা। সেই ডালনায় ডিম অগণ্য—আলু নগণ্য। তার উপর নানা তরকারি, চাটনি, পায়েস এবং কলা, কমলা, আখরোট, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলও আছে।

বন্ধুবর তিন থালা লুচি নিঃশেষ করলেন। অন্যান্য খাদ্যও বহুবার চেয়ে নিলেন।

মাস্টারমশায়ের গৃহে এইরূপ এক ভোজের আয়োজনের কারণ পরে শুনলাম:

শান্তিনিকেতনের কয়েকটি 'খাইয়ে' ছেলে পূর্বাহ্নে পত্র দেন—"দোল-পূর্ণিমার দিন আপনার বাড়িতে আমাদের শুভাগমন হবে। প্রচুর পরিমাণে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যের ব্যবস্থা রাখবেন। আমাদের রসনা তৃপ্ত না হলে, অতৃপ্ত প্রেতের মতো বাড়িতে সব তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে আসব।"

পত্র দিয়ে অপূর্ব ডাকাতি !

তাঁরা শুধু আচার্য নন্দলালকেই পত্র দেননি। গুরুদেব-কন্যা মীরাদিকে, অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কেও ঐরূপ পত্র দিয়েছিলেন। তাঁদেরই জন্য আয়োজিত এবং তাঁদের আহারের অবশিষ্ট সেই আহার্যেই আমরা ভাগ বসালাম।

ইতিমধ্যে আবার এক ব্যাপার ঘটেছে। সেই 'খাইয়ে'-রা এক বাড়িতেই এমন খেয়েছেন যে, অন্য বাড়ি গিয়ে খাবার শক্তি নাই। অথচ অন্যেরাও অনুরূপ আয়োজন করেছেন—এখন ডাকাতেরা নিজেরাই জব্দ হচ্ছে !

তাঁরা নিরুপায় হয়ে "খাইয়ে" খুঁজে বেড়াচ্ছেন ! অবশেষে তাঁরা আমাদের এই বন্ধুটির শরণ নিলেন। বন্ধু তখুনি রাজী ! একজনের বাড়িতে সন্ধ্যা ৭টায় খাবেন—আর একজনের বাড়ি রাত ৯টায়।

সন্তোষজনক আহারের দ্বারা তিনি উভয় বাড়ির গৃহিণীদের সন্তুষ্ট করেছিলেন।

বন্ধুবরের আহারের পটুতার কথাই বলা হলো। কিন্তু অনাহারের পটুত্বও ছিল তাঁর অসাধারণ।

একবার তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান : জানি না—সেটা সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে কি না ! তাহলেও আশ্চর্য হব না। কেন না, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে সেটা ছিল ! এই সময় তিনি দিন কুড়ি প্রায় অনাহারে কাটান ! তখন তিনি বালক—কুড়িদিন অনাহারে কাটানো বড় সহজ ছিল না। শুনেছি পিত্তরক্ষার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে কিছু বুনো কুল খেয়েছিলেন। তাঁর মতো 'একমণী কৈলাশের' কাছে কয়েকটা বুনো কুল কি কোনো খাদ্য !

তিনি যখন ছাত্রাবাসে থাকতেন—তখন নিজেই নিজের আহার্য প্রস্তুত করতেন। রন্ধনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ খেয়েছি—খুব ভালো লেগেছে।

কখনো কখনো ভাবের ঘোরে, তিনি রান্নার সময় পেতেন না।

তখন দু'চার-দিন অনাহারেই কাটাতেন। বন্ধু-বান্ধবরা, শিক্ষকগণ খবর পেলে ডেকে খাওয়াতেন। এত ভোগের মধ্যেও তাঁর নিরাসক্তির পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েছি এবং বিস্মিত হয়েছি।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় প্রতিদিন প্রভাতে তাঁদের দেখা সাক্ষাত হতো। তাঁর মধ্যে এক উদীয়মান কবির পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। আমরা তো তাঁর কবিতা শুনে কবিতা লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

সেই তিনি আজ সন্ন্যাস নিয়েছেন।

বহু বছর হলো—তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছেন। শুনি সাধনায় তিনি তাঁর আচার্যদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করছেন।

আমাদের তিনি চিঠিপত্র দেন না। অবশ্য আমরাও দিই না, কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। তাঁদের চিঠিপত্র দিয়ে থাকেন।

সেদিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে এক অত্যাশ্চর্য সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

রাত্রে যখন তিনি গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিলেন—তখন এক ইন্দুর তাঁর পা কুরে কুরে খেয়েছে!

একেই কি বলে—'প্রকৃতির প্রতিশোধ?'

বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে—অনেক বড় বড় সাধককেও এইভাবে কর্মফল ভোগ করতে হয়েছে!

—শিশুসাথী : বৈশাখ, ১৩৭৮।

অনন্য বিদ্যার্থী

অরবিন্দ

অরবিন্দ কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নন। অরবিন্দ এক বালক। কিন্তু অসাধারণ বালক। তার কাহিনীই আজ শোনাব।

দুরন্ত অরবিন্দের কোথাও লেখাপড়া হচ্ছে না। তার বাবা এবং জেঠারা একে একে নানাস্থানে তাকে নিয়ে গেলেন। ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, কাটিহার যেখানে যেখানে তাঁদের কর্মস্থল। বহু ঘাটের জল খেয়েও যখন তার কিছুই হলো না, তখন তাকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হলো। সেখানে তার বড় জ্যাঠামশায় ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে এসে অরবিন্দের সে কী ফুর্তি। ইস্কুল ঘর নাই। বেঞ্চি নাই, চেয়ার নাই। শিক্ষকের বেত নাই। গাছতলায় বসে পড়া না খেলা ? এতো ভারি মজা !

গাছে গাছে ফুল, ফল। গোলাপ, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ, পেয়ারা, লিচু, আম, গোলাপজাম। যত খুশি গাছে চড়, ফুল তোল, ফল পাড়, খাও—কেউ বারণ করে না। এ কোথায় এল সে !

পুরনো ছেলেদের সে শুধালো—"এ ইস্কুলটা কে করেছে ?"

তারা বললে—"আরে আরে ! 'করেছে' কি ? 'করেছেন'—বল।"

অরবিন্দ বললে—"আচ্ছা তাই হল। কে—বল না।"

তারা উত্তর দিলে—"গুরুদেব করেছেন।"

অরবিন্দ তো অবাক। "গুরুদেব ! গুরুদেব কি ?"

ছেলেরা হাসতে লাগল—"আচ্ছা গেঁয়ো তো! গুরুদেব জানে না। গুরুদেব—গুরুদেব।" দু-একজন ব্যাখ্যা করে বললে—"শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! তাঁর কবিতা পড়নি?"

অরবিন্দ কবিতা-টবিতার ধার ধারে না। সে সন্ধান করে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাজির। খানিকক্ষণ তো তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। গুরুদেবও চেয়ে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে। ধবধবে রং, সুন্দর মুখ, বড় বড় চোখ, টিকলো নাক, সরল, সুঠাম বালক।

গুরুদেব কিছু বলার আগেই অরবিন্দ তাঁকে প্রশ্ন করলে—"ইস্কুলটি তুমি করেছ?"

গুরুদেব হেসে বললেন—"হ্যাঁ"।

অরবিন্দ বললে—"খুব ভালো কাজ করেছ। আমি অনেক ইস্কুল দেখেছি। এমন কোথাও দেখিনি। এত গাছপালা লাগিয়েছ। এত ফুল ফল! সব ছেলেদের দিয়ে দিয়েছ। ছেলেদের তুমি খুব ভালোবাস, না?"

গুরুদেব মুগ্ধ! এমন অদ্ভুত সরল বালক তো বড় চোখে পড়ে না! তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার পছন্দ হয়েছে?"

অরবিন্দ বললে—"খুব! খুব! তাইতো তোমাকে বলতে এলাম। আচ্ছা এখন যাই"—বলেই দৌড়।

একান্ত চঞ্চল! একজায়গায় বেশিক্ষণ থাকা তার অভ্যেস নেই। তাছাড়া হঠাৎ হয়ত কোনো পাখীর ছানা, কিংবা নারকেলি কুলের কথা মনে পড়ে গেছে।

মাসখানেক যেতে না যেতেই অরবিন্দ গাছ থেকে পড়ে হাত ভাঙল। হাতভাঙা অবশ্য প্রথম নয়। ইতিমধ্যে বার কয়েক ভেঙেছে। হাসপাতালে কয়েকদিন আটক থাকতে হলো। যাঁরা আটকে রাখতেন তাঁদের প্রাণান্ত। "সর্বনাশ! এমন ছেলে গুটিকয়েক এলেই হয়েছে আর কি।"

অরবিন্দের উৎপাত কি আর এক জায়গায়। পাকশালা, অতিথি-শালা, সব্জীবাগান, দ্বিজেন্দ্রনাথের ফুলফলে ভরা নীচু-বাঙলা সর্বত্রই তার অবাধগতি। তাকে বাধা দেবে কে ? গুরুদেব তাকে ভালোবাসেন। তার জ্যাঠামশায়ও একজন কর্তাব্যক্তি। তাছাড়া নিজেও তো সে একাই একশ !

রাত্রে একদিন জ্যাঠামশায়ের ঘুম ভেঙে গেল। 'ব্যাপার কি ? বিছানার তলায় কিছু আছে নাকি ? পিঠে এত লাগে কেন ?' বিছানা তুলে কিছু পেয়ারা, কুল, বেগুনপোড়া, পেঁয়াজ ভাজা পাওয়া গেল। বুঝতে বাকি রইল না, এ কার কীর্তি !

জ্যাঠামশায় অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। মারধোর মোটেই পছন্দ করেন না। মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে বলেন। বড় জোর দু একটা ধমক দেন। অরবিন্দ তাতে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তার পরেই আবার যে-কে সেই !

আর সবই হচ্ছে—কেবল পড়াশুনা হচ্ছে না। শিক্ষকদের সকলের কাছ থেকে নালিশ আসতে লাগল। জ্যাঠামশায় বড়ই চিন্তায় পড়লেন।

এর মধ্যে একদিন আর এক বিপদ বাধল। একটা উঁচু গাছের মগডালে চড়েছিল অরবিন্দ। সেই ডালে ঠেসানো ছিল একটা বাঁশের লগা। তার ছুঁচালো অগ্রভাগ কেমন করে অরবিন্দের জঙ্ঘার মর্ম ভেদ করেছে। টানাটানি করে ছাড়াতে গিয়ে বেশ খানিকটা মাংস ছিঁড়ে ঝুলে পড়ল। অবস্থা দেখে একটা ছেলে মূর্ছা গেল। বাকি ছেলেদের কেউ বা দৌড়ে পালাল, কেউ বা কাতর স্বরে কাঁদতে লাগল। অরবিন্দ নির্বিকার। শিক্ষকগণ পাছে শাসন করেন, সেই ভয়ে সে সেই অর্ধছিন্ন মাংসখণ্ড টেনে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েকজনে মিলে জোর করে ধরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। একমাস তাকে সেখানে থাকতে হয়। সেই দারুণ আঘাতের গভীর ক্ষতচিহ্ন সারাজীবন তার দেহে অক্ষত হয়ে বিরাজ করেছে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ, ঝাঁপ, দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য, উৎপাত, অত্যাচার সবই বাড়ছে। বাড়ছে না কেবল পুঁথির বিদ্যা। বাড়া দূরে থাক—সেটা কমে যাচ্ছে বলে অধিকাংশ শিক্ষক সন্দেহ প্রকাশ করছেন। অরবিন্দের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শাসন, উপদেশ, অনুযোগ, কোনো কিছুই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে না।

বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার দিকে মাঝে একটু ঝোঁক হয়েছিল। দু চারদিন ক্লাসে গিয়ে মহা উৎসাহে সঙ্গীতচর্চা করল। সঙ্গীতের শিক্ষক ভীমরাও শাস্ত্রী একদিন চমকে উঠলেন—'কে রে অমন বেসুরো গাচ্ছে?' বহু ছাত্রের মিলিত কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতে কে বেসুরো, প্রথমটা ধরা গেল না। সকলকে একে একে গাইতে বললেন। অরবিন্দের যখন পালা এলো, তখন সে মহা উৎসাহে ঘাড় নেড়ে উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে উঠল:

"আই বদরিয়া বরষণ হারি"

শাস্ত্রীর তো চক্ষু চড়কগাছ। "আরে থাম থাম।" কে কার কথা শোনে! অরবিন্দ গেয়েই চলেছে। তাকে নিবৃত্ত করতে ভীমরাও শাস্ত্রীর ঘাম ছুটলো। বেচারা অরবিন্দেরও সঙ্গীতের নেশা ছুটে গেল।

তখন আবার সেই গাছে গাছে, মাঠে মাঠে, খোয়াইএ খোয়াইএ, সাঁওতাল গ্রামে, পারুলডাঙ্গায়, তার অফুরন্ত উৎসাহ তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

এর মধ্যে আবার এক রোমাঞ্চকর সংবাদ জ্যাঠামশায়ের কানে এল। ছেলেরাই কেউ এসে বলল। অরবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তার এক মহাগুণ, মিথ্যা বলে না। সে তা স্বীকার করল।

কেয়াফুল পাড়তে গেছলো। যেমন রোজই যায়। কেয়ার সময়, এ তার নিত্যকার কাজ। অরবিন্দ গাছে, সঙ্গীরা নীচে। হঠাৎ সঙ্গীরা সভয়ে দেখল—এক বিরাট গোখরো ডালে ডালে অরবিন্দের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে! অরবিন্দও তাকে দেখেছে। কিন্তু তার বিন্দু-

মাত্র চাঞ্চল্য নাই। গোখরো তার গা বেয়ে উঠে গলা জড়িয়ে, মাথার উপর ফণা তুলে দুলতে লাগল। অরবিন্দ ধীর, স্থির, নীরব, নিস্পন্দ। সঙ্গীরা সব পালিয়েছে। সাপ তার ধীর, স্বচ্ছন্দগতিতে, অন্যত্র গমন করল। অরবিন্দ তার লক্ষ্য-করা ফুলটি পেড়ে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল।

তারপরেও তার কেয়াগাছে চড়া কিছুই কমেনি।

এই তো অরবিন্দের বাল্যজীবন। দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী অরবিন্দ! লেখাপড়া না হলেও এইরূপ ছেলে অন্যদেশে অনেক কিছুই করতে পারে। আমাদের দেশের অরবিন্দ কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।

অরবিন্দের পরবর্তী জীবনের কথা অনেকেরই শুনতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু কী শোনাব? শোনাবার মতো কিছু নাই।

তাম্রবর্ণ, দীর্ঘ, শীর্ণদেহ, রক্তচক্ষু, কেশধারী এক পুরুষ গ্রামে গ্রামে, বনে বনে, ঘুরে বেড়ায়। দেখে মনে হবে, কোনো তান্ত্রিক বা পিশাচ-সিদ্ধ সাধক। মাঝে মাঝে বিরাট বিষধর সর্পকে অবলীলাক্রমে ধরে এনে, গ্রামে গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতাকে দেখিয়ে বেড়ায়। তার জন্য সে কিছুই নেয় না। বাড়িতে তার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব নেই। কিন্তু বাড়িতে সে ক্বচিৎ আসে। নিজের গ্রামেও তাকে ক্বচিৎ দেখা যায়। শালের জঙ্গলে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন ব্যাঙের ছাতা গজায়, তখন অরবিন্দ সেগুলি সংগ্রহ করে। ব্যাঙের ছাতার মধ্যে বিষধর সাপেরও দেখা মেলে। সাপও যেমন সে বিনি পয়সায় খেলায়, ব্যাঙের ছাতাও সে তেমনি বিনি পয়সায় বিলিয়ে দেয়।

নিজের গ্রামে সে একবার একটা পাঠশালা খুলেছিল। কিন্তু তার শিক্ষাদান-পদ্ধতি অভিভাবকদের পছন্দ হয়নি। আর একবার শালের জঙ্গলের মধ্যে, বুনোদের গ্রামে, সে পাঠশালা খোলে। সে-পাঠশালা বেশ ভালোই চলেছিল। বুনোরা তাকে খুব ভক্তি করত। কিন্তু খেয়ালী অরবিন্দের চঞ্চলমন একস্থানে বেশিদিন স্থির থাকেনি।

কাজেই পাঠশালা ভেঙে দিয়ে সেই যাযাবর বৃত্তিই আবার সে গ্রহণ করেছে।

অরবিন্দ অজাতশত্রু। কারো সঙ্গেই তার বিবাদ নাই। কখনো কারো কোনো ক্ষতি সে করে না। অনেকেই তাকে দিয়ে বেগার খাটিয়ে নেয়। সরল অরবিন্দ খুশি মনেই খাটে। তবে সে খেয়ালী। খেয়াল না হলে কোনো কিছুই তাকে দিয়ে করানো যায় না। তথাপি, পরের উপকারই সে করে থাকে। আত্মভোলা কেবল নিজের উপকারই কোনোকালে করল না।

—শিশুসাথী, মাঘ, ১৩৬২।

সার্থক স্নাতক

বিজয়া দশমী। মধ্যাহ্নে আহারের পর কেদারায় হেলান দিয়ে একটু আরামের চেষ্টা করছি; হঠাৎ অদূরে রাস্তার ধারে প্রতিবেশী এক বন্ধুদম্পতির ব্যগ্র আহ্বান উপর্যুপরি শোনা গেল। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটল নাকি—মনের মধ্যে এরূপ একটা উদ্বেগ নিয়ে নগ্নগাত্রেই তাঁদের দিকে ধাবিত হলাম। অর্দ্ধপথে দেখি এক গ্রাম্য ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুবর আমার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। সামনে এসে বললেন, "ইনি আপনাকে খুঁজছিলেন। চিনতে পারেন কি?"

মোটা খদ্দরের মামুলি ধুতি-পাঞ্জাবীধারী এক গ্রামবাসী। ধূলি-ধূসরিত চরণ—জুতার বালাই নাই! পোশাকও ধোপদুরস্ত নয়। কে ঠিক চিনতে পারছি না! গ্রামবাসী কোন আত্মীয়স্বজন হবেন কি?

স্মৃতিসমুদ্র আলোড়ন করে ধীরে ধীরে যেন একটি পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে ছাত্রজীবনে যাঁদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করেছি—ইনি যেন তাঁদেরই কেউ! সহসা আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম—"নবকৃষ্ণ"! আমার ভুল হয় নাই। নবকৃষ্ণ আমায় জড়িয়ে ধরলেন। ওড়িশার প্রধানমন্ত্রী নবকৃষ্ণ।

তিনি আমাকে ধরে টেনে নিয়ে চললেন তাঁর শিক্ষার স্থান গুরু-দেবের শান্তিনিকেতনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। আমার গায়ে জামা ছিল না বলে ইতস্ততঃ করছিলাম। তাই বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "না হয় আমার জামাটাই গায়ে দাও। আমিই না হয় খালি গায়ে ঘুরব!"

অগত্যা সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কোঁচার খুঁটখানি গায়ে দিয়ে

পরমোৎসাহে তাঁর সঙ্গে হেঁটে চললাম। চীন-ভবনের বারান্দায় এসে মালতীর সঙ্গে দেখা হলো। নবকৃষ্ণের সহধর্মিণী মালতী। আমাদের সহ-পাঠিনী। কন্যা নাতি-নাতনী পরিবৃতা হয়ে এসেছেন শৈশবের লীলাভূমি শান্তিনিকেতনে।

মালতী চৌধুরাণী এককালে দেবীচৌধুরাণীর মতই দুর্দান্ত ছিলেন। শারীরিক শক্তিতে তাঁর সমকক্ষ ছিল—আমাদের মধ্যে এমন কোনো "ভবানী পাঠকের" কথা আমার মনে আসছে না। দু-তিনটি ডাকু ছেলেকে একসঙ্গে চড়, চাপড়, থাপ্পড় দিয়ে নাকাল করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গাছে চড়ে আম বা পেয়ারা পাড়তে পারত, এমন ছেলে খুব কমই ছিল। গাছের মগ-ডালে লোভনীয় ফলটি তিনি দয়া করে না দিলে, কারও পাবার উপায় ছিল না। অবশ্য দয়ার তাঁর অন্ত ছিল না। ওই দুর্দান্ত মেয়েটির হৃদয় ছিল অতি কোমল। আমাদের এমন স্নেহময়ী বন্ধুও আর কেউ ছিল না।

তাঁর ওই দুর্দমনীয়তা ও স্নেহশীলতা পরবর্তী জীবনে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে এবং দেশসেবায় পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মালতী চীন-ভবনের প্রবেশমুখে প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখছিলেন। সম্মুখে গুরুদেবের 'নটীর-পূজা' অপূর্ব-তুলিকায় চিত্রিত রয়েছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন। এক দিন 'নটীর-পূজা'য় রাণী লোকেশ্বরীর পার্ট নিয়েছিলেন মালতী। তাঁর সেদিনের সেই অপূর্ব অভিনয়ের কথা আজও আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত আছে। 'লোকেশ্বরী' চরিত্রের অভিনেত্রী মালতী আজ সত্যই লোকেশ্বরী।

নবকৃষ্ণের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ছাত্র-জীবনের বাসগৃহটির সম্মুখে এলাম। এখন তা পাঠভবন অধ্যক্ষের কার্যালয়। নবকৃষ্ণ পরম আগ্রহের সহিত তাঁর ঘরখানি দেখতে লাগলেন। এককালে এই দোতলা গৃহের নীচের তলায় নবকৃষ্ণ, রামচন্দ্রন্[১] এবং আমরা দু'জন

১. জি. রামচন্দ্রন্—স্বনামধন্য গান্ধীপন্থী শিক্ষাব্রতী।

অখ্যাত ব্যক্তি বাস করতাম। আমাদের পাশেই থাকতেন গোপাল রেড্ডি[২] ও সৈয়দ মুজতবা আলি।[৩]

নবকৃষ্ণ এক সময় হাস্যচ্ছলে বললেন—"বিশ্বভারতীতে খুব বেশী দিন থাকার সুযোগ হয়নি। কাজেই বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারিনি। তবে যাবার সময় মালতীকে নিয়ে গেছলাম।"

কথাটা তিনি হাস্যচ্ছলে বললেও আমাদের মনে তা বেশ ছাপ দিয়ে গেল। সংস্কৃতে একটি কথা আছে 'স্ত্রীরত্ন'; সত্যই নবকৃষ্ণ বিশ্বভারতী হতে এই অপূর্ব রত্নটি লাভ করেছিলেন। যে শুভক্ষণে এই মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল, বিশ্বভারতীর ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বীরভূমের রাঙামাটির ধুলোর পথে নগ্ন পদে পদব্রজে নবকৃষ্ণ, মালতী, তাঁদের কন্যাদ্বয় এবং নাতিটি চলেছেন। মাঝে মাঝে ধুলোর মধ্যে নাতিটি বসে পড়ছে এবং তৎক্ষণাৎ ধুলোখেলা আরম্ভ করে দিচ্ছে। সেই অপূর্ব দম্পতি তার সেই ধুলোখেলা হাসিমুখে দেখছেন। নিতান্ত সময়াভাব, তাই ক্ষণেকের মধ্যেই সেই ধূলিধূসরিত বাল গোপালকে কোলে নিয়ে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে দাসদাসী, বেয়ারা, চাপরাশী কেউ নাই। লাল-পাগড়ীধারী পুলিস নাই। কেবলমাত্র গোয়েন্দাবিভাগীয় একটি কর্মচারী সাধারণ ভদ্রবেশে বেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করে নিজের কর্তব্যপালন করে চলেছেন।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে দেখা। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা যেন আমাদের কারও মনে এল না। ছাত্র-জীবনের ন্যায় সহজে স্বচ্ছন্দে আমরা পরস্পরে আলাপ করে চললাম।

মালতী ও নবকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেক পুরাতন বন্ধুর খবর নিলেন, যাঁদের খোঁজ পেলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই দেখা করলেন। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ছিলেন। মাঝখানে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে আহার

২. বি. গোপাল রেড্ডি—মাদ্রাজের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্র-আচার্য (Pro-Chancellor)।

৩. নানা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক।

সেরে এই পাঁচ ঘণ্টার বাকি সমস্ত সময় আশ্রম ও আশ্রমিক দর্শনে অতিবাহিত করলেন।

গুরুদেব-দুহিতা মীরাদেবী, আচার্য নন্দলাল, আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর পদপ্রান্তে উপবেশন করে তাঁদের সরস মধুর অমূল্য বাক্যালাপ মুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করতে লাগলেন। সময় তাঁদের সীমাবদ্ধ, অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় যে তাঁদের ফিরতে হবে, সেকথা তাঁরা ভুলে যাচ্ছিলেন। আমাদেরই সে-কথা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছিল!

পানাগড়ের কাছে এক গ্রামে এসেছেন মন্ত্রিত্বের ধরাচূড়া দূরে ফেলে বিশ্রামের জন্য। সেখান থেকে মোটরে করে বারোটার সময় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, পাঁচটার সময় ফিরে গেলেন। যাবার সময় আমাদের প্রত্যেককে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন তাঁদের গৃহে যাবার জন্য।

কিছুকাল যাবৎ মানসিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না, কী এক ভয়াবহ নিরাশা ও বিষাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত ছিল। গান্ধীজীর অবর্তমানে তাঁর শিষ্যগণ নতুন গুরু বরণ করেছেন। জনগণের শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে গান্ধী-শিষ্যের রাজকীয় আড়ম্বর দেখে মনে হতো, সত্যই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে!

কিন্তু না। গান্ধীজীর মৃত্যু হয় নাই। মালতী-নবকৃষ্ণ প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে এখনও তিনি জীবিত রয়েছেন! মর্তের কোনো রাজপদ, কোনো ঐশ্বর্য যাঁদের বাঁধতে পারে না, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও মন যাঁদের পড়ে থাকে দরিদ্র, লাঞ্ছিত জনগণের পর্ণ-কুটিরে, তাঁদের মধ্যেই গান্ধীজীকে আজ প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সর্বত্যাগী শ্মশানবাসী মহাদেবসদৃশ মহাত্মার মৃত্যুবিজয়ী আত্মাকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানালাম।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬০
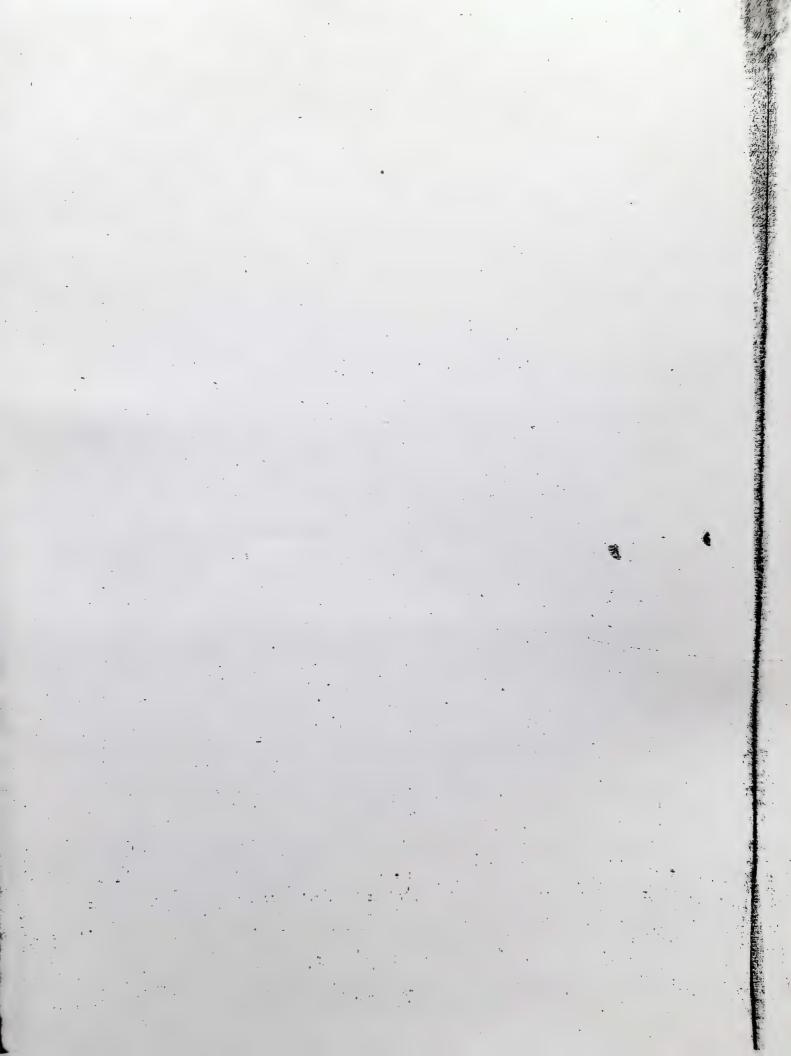
আদি ও অন্ত

পঁচিশে বৈশাখ • বাইশে শ্রাবণ

পঁচিশে বৈশাখ
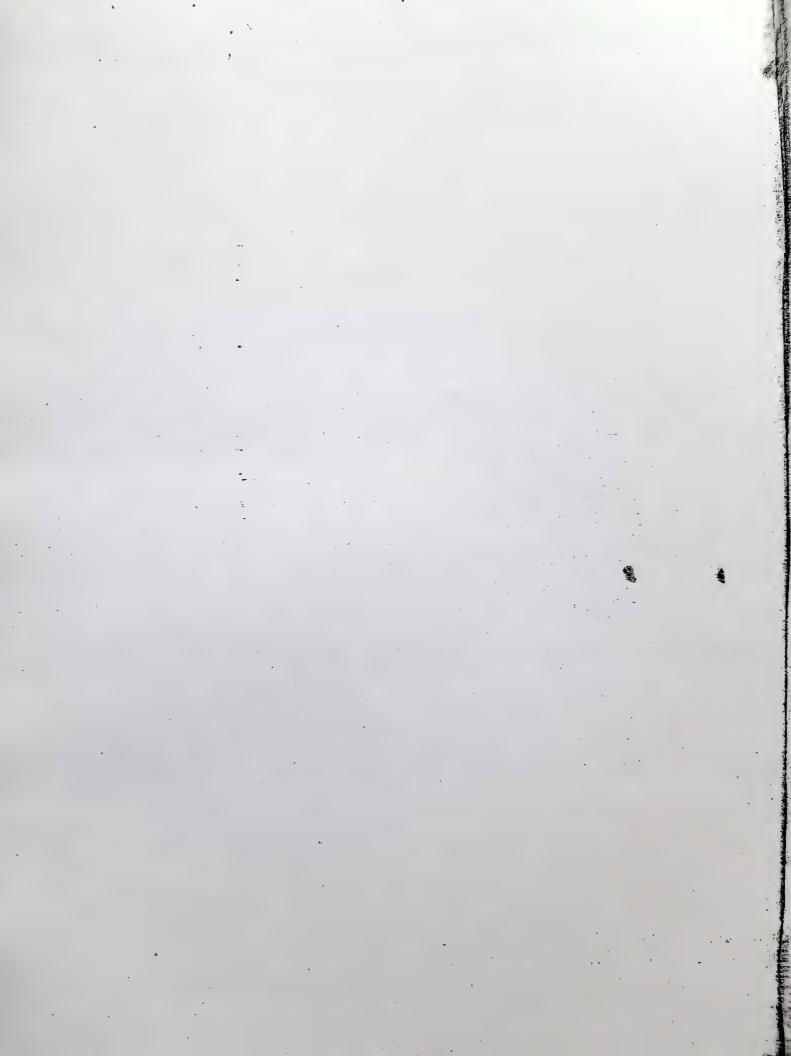
সাতানব্বই বৎসর পূর্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আজকের দিনে এক শিশু জন্মেছিলেন। অভিজাত বংশে তাঁর জন্ম। পিতাও তাঁর এক মহাপুরুষ। তবু কে সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিল সেই শিশু একদিন সমস্ত জগতে আলোড়ন আনবে? সেদিনকার সেই নবজাতকের কণ্ঠস্বর শুনে কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, এই কণ্ঠ একদিন বিশ্ববাসীর কর্ণে মধুবর্ষণ করবে। এই কণ্ঠের গানের ঝরণাধারায় অবগাহন করে সমস্ত জগৎ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবে।

সেদিন কোনো স্বপ্নশীলের উদ্ভট স্বপ্নও যা দেখতে পায়নি, কোনো কল্পনাবিহারীর স্বেচ্ছাচারী কল্পনাও যা কল্পনা করতে পারেনি, জগতে তাই সম্ভব হয়েছিল। কাব্যে, নাট্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছিল—আজও মুগ্ধ করছে।

কবির কাব্যেই কবির পরিচয়। তিনি মহাকবি। সহস্র সহস্র বৎসর পরে জগতে এরূপ এক মহাকবির জন্ম হয়। তাঁর মহাকাব্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু সেই মানুষটি? সেই রক্তমাংসের অপূর্ব পুরুষটি—যাঁর সম্বন্ধে তাঁরই কাব্যের ভাষায় বলতে পারি—"জ্যোতির্ময় আনন্দ মূরতি! দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর প'রে, করুণার সুধাহাস্যজ্যোতিঃ।"

তাঁর সংস্পর্শে যিনি এসেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর যিনি শুনেছেন, তাঁর স্পর্শ যিনি পেয়েছেন, তাঁর অভিনয়, তাঁর গান, তাঁর ব্যাখ্যান, তাঁর

প্রতিদিনকার সাধারণ কথাবার্তা যিনি শুনেছেন, তিনিই জানেন—কবি ছাড়াও মানুষ রবীন্দ্রনাথ কেমন ছিলেন।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়েছিলাম। পিতার সঙ্গে যেমন পুত্র, ভ্রাতার সঙ্গে যেমন ভ্রাতা, বন্ধুর সঙ্গে যেমন বন্ধু, পিতামহের সঙ্গে যেমন পৌত্র মিলিত হয়, সেইরূপ অন্তরঙ্গভাবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বছরের পর বছর প্রত্যক্ষ করেছি—করে এই কথাই মনে জেগেছে—"ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই।" এইরূপ এক মানুষের সংস্পর্শে এসেই একদিন কোনো যুগে, কোনো এক মানুষ, আনন্দে অভিভূত হয়ে এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন।

মাত্র পাঁচদিন পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা গেল। ঐ পবিত্র দিনে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তথাগত আবির্ভূত হয়েছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তথাগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ধর্মরাজ অশোকের কথা বার বার মনে আসছে। কেন? এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সেটা কী? পরধর্মের প্রতি, পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা।

দেহের উপর জুলুমকেই আমরা বলি জুলুম, কিন্তু মনের উপর জুলুমকে আমরা জুলুম মনে করি না। এটা আশ্চর্য! আমার মতবাদকে আমি অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেব! সমস্ত জগৎ আজ এই করতে চাইছে। হয় আমার মতে এসো—না হয় তোমার রক্ষা নাই।

আজ থেকে দু'হাজার তিনশ' বছর আগে সম্রাট অশোক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যে বেদপন্থী বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের সমান অধিকার ছিল। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের যাতে অভ্যুদয় হয়, উন্নতি হয়, তার জন্য কত প্রচেষ্টাই না মহারাজ অশোক করেছিলেন। যাতে প্রত্যেক ধর্ম-

সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক পরস্পরের ধর্মমত শ্রবণ করে লাভবান হন, তার জন্য কতরকম ব্যবস্থাই না তিনি করেছিলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই অপূর্ব গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাঁর শান্তিনিকেতন, তাঁর বিশ্বভারতীতে সর্বপ্রকার মতবাদেরই আশ্রয় মিলত। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে তাঁর প্রতিষ্ঠানে বাস

১. দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সর্বসম্প্রদায়ের গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসীদের সম্মান করেন। তাঁহাদের নানা প্রকার দ্রব্য দান করেন এবং নানা প্রকারে সম্মানিত করেন। কিন্তু এই দান বা সম্মানকে তেমন মূল্য দেন না—যেমন মূল্য দেন তিনি প্রতি সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি বা যোগ্যতাবৃদ্ধিকে। সারবৃদ্ধি বা যোগ্যতা-বৃদ্ধি বহু প্রকারের। কিন্তু তার মূল বাক্-সংযম (বচোগুপ্তি)। অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায় অস্থানে (অপ্রকরণে) নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করিবে না। নিন্দা বা প্রশংসার স্থল উপস্থিত হইলেও উহা যথাসম্ভব কম করিবে। বস্তুতঃ স্থলবিশেষে (প্রকরণে) বা যথাস্থানে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিবে। ইহা করিলে নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইবে, অপর সম্প্রদায়ও লাভবান হইবে। ইহার অন্যথা করিলে নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিবে—অন্য সম্প্রদায়েরও ক্ষতি করিবে।

লোকে যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন—তাহা নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিবশতঃ। তাঁহারা মনে করেন—"এইরূপে আমাদের সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করিব।" বস্তুতঃ তাহাতে তাঁহারা নিশ্চিতভাবে (অথবা গুরুতররূপে) নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেন।

সর্বধর্মসম্প্রদায় একত্র মিলিত হওয়া ভালো। এইভাবে তাঁহারা পরস্পরের ধর্ম শ্রবণ করুন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল (বা আগ্রহশীল) হউন। দেবপ্রিয়ের ইচ্ছাই হইতেছে ইহা যে, সর্বসম্প্রদায় বহুশ্রুত হউক, কল্যাণযুক্ত হউক।

যাঁহারা নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তিমান—তাঁহাদিগকে বলা হউক দেবপ্রিয় দান বা সম্মানকে তত বড় মনে করেন না—যত বড় মনে করেন তিনি প্রতি সম্প্রদায়ের সার বা যোগ্যতা বৃদ্ধিকে। সকল সম্প্রদায়ের সার বা যোগ্যতা বৃদ্ধি হউক। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের গুণগ্রাহী হউক। একে অন্যের সমজদার হউক। ইহারই জন্য ধর্মমহাপাত্র, স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহাপাত্র, বজ্রভূমিকাদি উচ্চপদস্থ অধিকারীবর্গকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। (শিলালিপি ১২।২৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।—Rock Edict XII Girnar Version, 256 B. C.)।

করতেন। অন্যের মতবাদের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, জবরদস্তির উপর তাঁর অসীম ঘৃণা ছিল। একটি শিশুর উপরও তিনি কাউকে জবরদস্তি করতে দিতেন না।

পাছে তাঁর প্রভাবে, তাঁর আওতায় কারো ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়—এই আশঙ্কা তাঁর মনে জাগতো। আমরা যখন শিশু ছিলাম, তাঁর 'হাস্য-কৌতুক' থেকে নাটক অভিনয় করতাম। তিনি আমাদের বললেন—"তোমরা আমার নাটক অভিনয় করছ কেন? নিজেরাই তো তোমরা এমন নাটক লিখতে পার।" আমরা শুনে স্তম্ভিত। কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। আমাদের দিয়ে নাটক লেখালেন, অভিনয় করালেন। সেই থেকে আমরা যত না তাঁর নাটক অভিনয় করতাম তার চেয়ে বেশি আমাদের তৈরি নাটক অভিনয় করতাম। তিনি তাতে কত খুশি।

শান্তিনিকেতনে তাঁর বিরুদ্ধ মতবাদী বহু ব্যক্তিকে তিনি সাদরে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য তাঁর অনেক সংস্কার-কার্য বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হতো। অনেকসময় তাঁদেরই জন্য তাঁর পরিকল্পনার সাফল্য বহু বিলম্বে হতো। কিন্তু তার জন্য তিনি ধৈর্যচ্যুত হতেন না। তাঁদের উপর জুলুম করতেন না। আলাপে, আলোচনায়, তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, মধুর ব্যবহারে, ধীরে ধীরে তাদের ভুল-ভ্রান্তি বুঝিয়ে দিতেন। নিজের ভুল হলে স্বীকার করতেন এবং সেই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের এইটিই বিশেষত্ব। পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি সম্মান। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই শ' বছর পূর্বে অশোক-চরিত্রে যা দেখা গেছে সেদিন রবীন্দ্রচরিত্রেও তা দেখলাম। এটি ভারতবর্ষেরই বিশেষত্ব। হাজার বৎসর ধরে নাস্তিক চার্বাক-দর্শন, বেদপন্থী, বৌদ্ধ, জৈন দর্শনসমূহের পার্শ্বেই আসন পেয়েছে। কেউ তাকে নষ্ট করেনি।

বিরাট তাঁর প্রতিভা। তিনি যে জগতে বিচরণ করতেন, তা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে তিনি কেমন সহজভাবে মিশতে পারতেন।

শিশুর সঙ্গে শিশু, কিশোরের সঙ্গে কিশোর, যুবার সঙ্গে তিনি যুবা হয়ে মিশতেন। তারা তখন ভুলে যেত তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি।

ভারতবর্ষের দেশে দেশে, ভারতবর্ষের বাইরে, এশিয়ায়, ইওরোপে, আফ্রিকায়, আমেরিকায় পৃথিবীর বহুস্থানে আজ তাঁর জন্মোৎসব হচ্ছে। তাঁরা সব কবি-রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করছেন। এখানে শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে—যেখানে বিশ্বের নানা জাতি, নানা ধর্মাবলম্বীর জন্য তিনি নীড় বেঁধে দিয়ে গেছেন—সেখানে আমরা মানুষ রবীন্দ্রনাথের, আমাদের আত্মীয় রবীন্দ্রনাথের, আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করছি। সেজন্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের বেশি করে মনে জাগছে।

এখানে আম্রকুঞ্জে, শাল বীথিকায়, আমলকী কাননে, এখানে নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলায় আমরা তাঁর পরশ পাচ্ছি। এখানের সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে, বসন্তে, 'দারুণ অগ্নিবাণ' হানা গ্রীষ্মে, প্রতি ঋতু-উৎসবে আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করছি।[২]

—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫।

২. শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত

বা ই শে শ্রা ব ণ

ওঁ প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে ।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে ।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥
প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে ।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্ ।
ওষধয়ঃ প্রজায়ন্তেথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ ॥
যদঙ্গ স তমুৎখিদেন্ নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন রাত্রী
নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন ॥

অথর্ববেদ, ১১।৪।১—২১ ।

"সমস্ত জগতে এক বিরাট প্রাণের লীলা চলিয়াছে। বিশ্বের সর্বত্র এই প্রাণের প্রভাব। সমস্ত সৃষ্টিই এই প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণ সর্বনিয়ন্তা, সকলকে চালনা করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য এই বিরাট প্রাণেরই অভিব্যক্তি। এই প্রাণ সমস্ত প্রজার—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক। অতীত, অনাগত, বর্তমান, সকল কালের সকল সৃষ্টি এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যাহাকে আমরা জীবন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকি, যাহাকে আমরা মৃত্যু মনে করিয়া ভয় পাই, সেই তথাকথিত জীবনমৃত্যু এই বিরাট প্রাণের অঙ্গ, অংশস্বরূপ !

"এই অখণ্ড, অনন্ত প্রাণই জীবনরূপে, মৃত্যুরূপে, শোকরূপে, রোগ-

রূপে, বিরহদহন দুঃখরূপে, আমাদের ন্যায় সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি প্রাণীর নিকট খণ্ডরূপে, বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

'যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ'

'প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা'

'জীবনমৃত্যু নাচিছে তাহার পায়ের তলে'

'অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ'

'শূন্যে শূন্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যত।
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।'

সেই একই প্রাণ, চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থের অন্তরে দিব্যলোকে বিরাজ করিতেছে। আবার বরষার বারিধারারূপে এই পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। বৃক্ষরূপে, লতারূপে, তৃণরূপে, পুষ্প-রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে।

"এই বিরাট প্রাণ, যদি এক মুহূর্তের জন্য, এক নিমেষের জন্যও সরিয়া যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ চন্দ্রসূর্য নিভিয়া যাইত, দিবারাত্রি বন্ধ হইয়া যাইত, বিশ্বসৃষ্টি লুপ্ত হইত।

"সৃষ্টির সর্বত্র এই প্রাণের উপাসনা চলিয়াছে। আমরা এই মহা-প্রাণকে প্রণাম করি।"

যে বিরাট প্রাণের অনুভূতি প্রাচীনযুগের বৈদিক ঋষি এই বৈদিক সূক্তের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, সেই বিরাট প্রাণের অনুভূতিই আধুনিক যুগের ঋষি- কবি তাঁর এই "প্রাণ" শীর্ষক কবিতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন :

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,

বিকশে পল্লবে পুষ্পে ; বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ॥"

নৈবেদ্য।

আমাদের কবি এই অনন্ত প্রাণকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন—এই প্রাণ মাতৃরূপে বিরাজ করছেন। জীবনমৃত্যু তাঁর দুই স্তন। প্রাণিগণ সেই মাতৃরূপা অনন্ত প্রাণের ক্রোড়ে বসে স্তন্যপান করছে। যখন তিনি স্তন হতে স্তনান্তরে তাদের সরিয়ে নিচ্ছেন, তখন তারা শিশুর মতো কেঁদে উঠছে :

"স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

'মৃত্যু', নৈবেদ্য।

সৃষ্টির এই অনন্ত প্রাণের ভাণ্ডার তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তিনি জানতেন, এই ক্ষুদ্র মানবজীবন নিঃশেষ হলেই প্রাণ নিঃশেষ হয় না। সুতরাং এই সীমাবদ্ধ মানবজীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকা নিতান্তই হাস্যকর।

"...মৃত্যুভয়
কী লাগিয়া হে অমৃত। দু'দিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব ?"

নৈবেদ্য।

কিসের ভয় ? কিসের ভাবনা ? এই বিশ্বে প্রাণের হাট বসেছে। সেই প্রাণের হাটে বারে বারে আমাদের ভরী ভিড়বে :

"আমাকে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে
বারে বারে এই জীবনের প্রাণের হাটে।"

গীতবিতান।

নানা রূপে, নানা ভাবে এই বিশ্বজগতে আমরা আনাগোনা করব। আমাদের এই আসা-যাওয়া চিরদিনের ঃ

"নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

'চির-আমি',গীতবিতান।

এই 'অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসিতে' পেরেছিলেন তিনি। তাই জীবনমরণ তাঁর নিকট দোলারোহণের ন্যায় আনন্দদায়ক মনে হতো। তিনি বলেছেন, যেন কোন এক গানের তালে তালে কেউ আমাদের কোলে নিয়ে নিজে দুলছেন এবং দোলা দিচ্ছেন। এই দোলায় দুলতে দুলতে যখন আমরা সামনের দিকে আসছি, তখন আনন্দে হেসে উঠছি। আবার দোলা যখন পিছনে ফিরে যাচ্ছে, তখন ভয়ে কেঁদে ফেলছি ঃ

"চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল!
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সমুখে যেমন পিছেও তেমন,
মিছে মোরা করি গোল।
চিরকাল এ কি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।"

'মরণদোলা', উৎসর্গ।

ভারতবর্ষ জীবনমৃত্যুকে এই রূপেই দর্শন করেছে। বৈদিক ঋষি গেয়েছেন ঃ

নমস্ত অস্থায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥

অথর্ব, ১১।৪।৭।

"হে অনন্ত প্রাণ! কখনো তুমি সম্মুখে আসিতেছ। কখনো তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া যাইতেছ, কখনো তুমি দণ্ডায়মান। কখনো তুমি উপবিষ্ট। যখন তুমি সম্মুখে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি পশ্চাতে, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি দণ্ডায়মান, তখনও তোমায় নমস্কার। যখন তুমি উপবিষ্ট, তখনও তোমায় নমস্কার।"

যা আমাদের নিকট বিভীষিকাময় মৃত্যু তা কবি ও সাধকের নিকট নব নব দেশে, নব নব রমণীয় রাজ্যে প্রবেশ করবার লোভনীয় পথ ঃ

"নব নব প্রবাসেতে, নব নব লোকে
বাঁধিবে এমন প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে ; * *
নব নব মৃত্যু-পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

'জন্ম ও মরণ,' উৎসর্গ।

"মরণেরি পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন মাঝে"

ভয় কি? আসুক মৃত্যু। সেই অজানা, অচেনাকে প্রিয়তমরূপে বরণ করে নেব।

"মিলনে হবে তোমার সাথে
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য-অনুগতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর
বিজনরাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।"

গীতাঞ্জলি।

পরিণতবয়সে দেহত্যাগের এক বৎসর পূর্বেও কবি এই কথাই বলে গিয়েছেন। এখানে তিনি মরণকে বধূ এবং জীবনকে বর বলে কল্পনা করেছেন ঃ

"ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"

'ধূসর গোধূলিলগ্নে,' জন্মদিনে।

মরণকে তিনি মধুররূপে দর্শন করেছেন; অথচ এই পৃথিবীকে, এই মানবজীবনকে তিনি প্রাণভরে ভালোবাসতেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁর নিকট মধুময় ছিল ঃ

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দে বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।' "

'মধুময় পৃথিবীর ধূলি,' আরোগ্য।

পৃথিবীকে এত ভালোবাসলেও তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ

"কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল-মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে!"

'জন্মমরণ', উৎসর্গ।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তিনি বলেছেন ঃ

"—আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয় ;
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে।
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সংগমে।"

'পথের শেষে' জন্মদিনে।

সর্বদেশের সর্বমানবের চেতনাকে যা উদ্বুদ্ধ করেছিল, মহাকবির সেই

চেতনার নির্ঝরিণী 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের' 'সাগর-সংগমে' মিলিয়ে গিয়েছে।

সেই 'দৃষ্টি হতে শান্তিঝরা' 'নয়নভুলানো' 'প্রসন্ন প্রশান্ত' প্রাণবান পার্থিব রূপ আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না!

এ কম দুঃখ নয়। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যা রেখে গিয়েছেন, তেমন অপূর্ব সম্পদ, উত্তরাধিকারীর জন্য কবে, কোথায়, কোন্ পিতা, কোন্ গুরু, কোন্ কবি রাখতে পেরেছেন?

যে সম্পদ হাতে নিয়ে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী, প্রত্যেক মানব, দৃপ্তকণ্ঠে বলতে পারে ঃ

"যেনাহমমৃতং স্যাম্—"

"যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারি"—এমন মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা তিনি আমাদের দিয়ে গিয়েছেন।

ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।*

---

* ২২শে শ্রাবণ প্রভাতে, শান্তিনিকেতন-মন্দিরে অন্যতম আচার্যের ভাষণ।

প রি শি ষ্ট

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পঞ্চতাপস :

দীনবন্ধু ● ক্ষিতিমোহন ● নন্দলাল ● তেজেশচন্দ্র ● সতীশচন্দ্র

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ

ভূমিকা
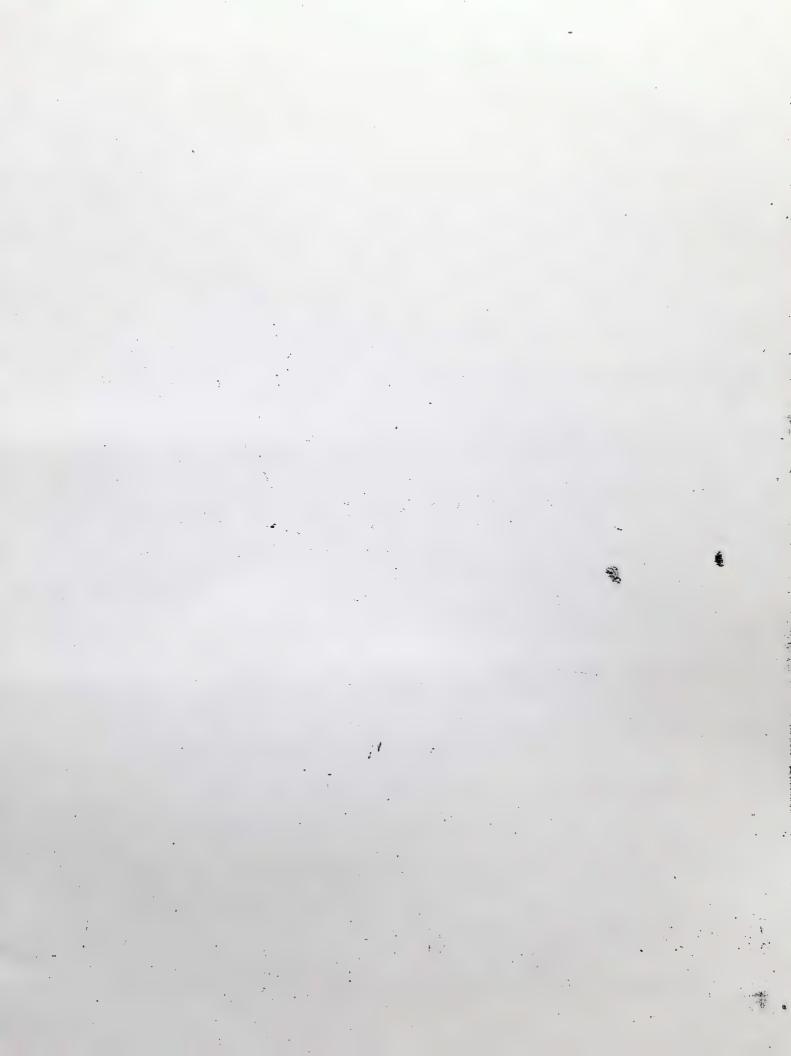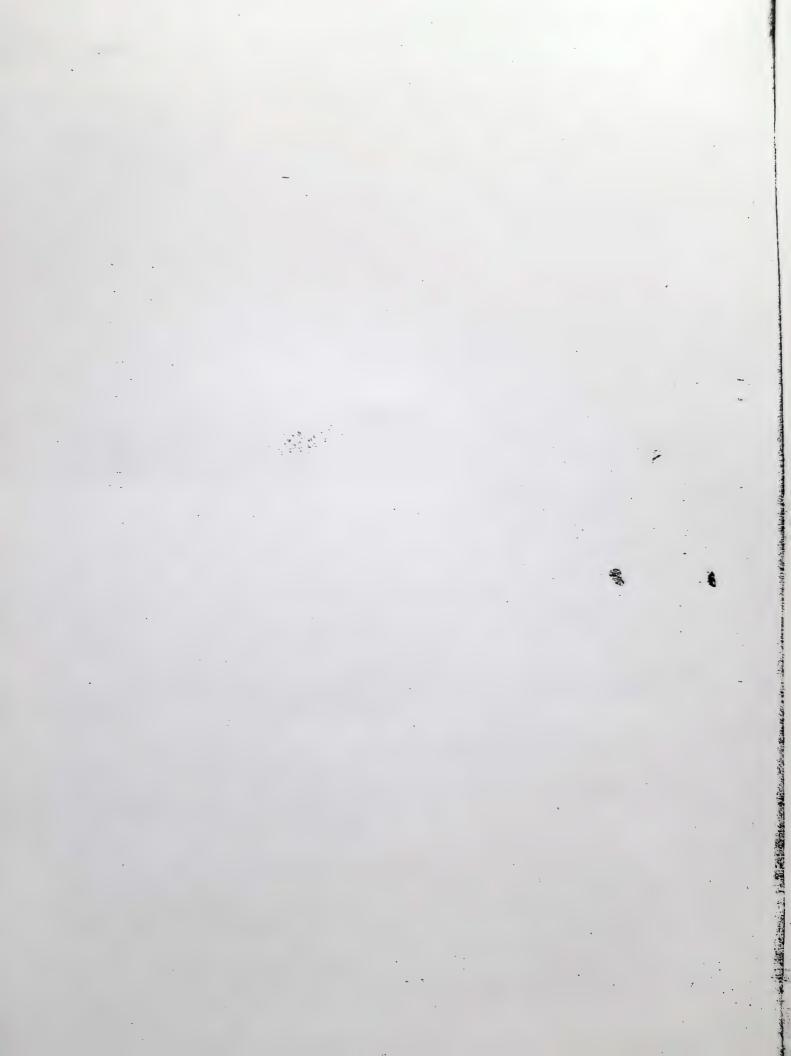
বড়দাদা

"একসময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারী ভারী তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম··· ।

"···দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অঙ্কচিহ্ন-ওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন—কিন্তু সে গানের জন্যে নয়, অঙ্ক দিয়ে এক এক রাগিনীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ-বানানো, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন; তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেননি—ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না। তাঁর সেই-সব ফেলা-ছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন লিখতেন, শুনিয়ে যেতেন; শোনবার লোক জমত তাঁর চারদিকে। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশভরা, সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি

হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঝরণাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা; শুকিয়ে গেল এর স্রোত; বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে।"

—রবীন্দ্র-রচনাবলী; ছেলেবেলা, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৮

একদিনের এক মধুর চিত্র চোখের উপর ভেসে আসছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর নাতি, নাতনি, নাতবউদের নিয়ে জমিয়ে বসেছেন। খোসগল্প হাস্য-পরিহাসে আসর মুখর। সবার উপরে দাদামশায়ের উচ্চহাস্য আশেপাশের লোকজনকে উচ্চকিত করে দিচ্ছে। তিনি একটি বড়ো তাকিয়া কোলে তুলে নিয়েছেন। আকাশ-ভরা হাসির সঙ্গে প্রচণ্ড তাল পড়ছে—সেই তাকিয়ার উপর। তাকিয়া ফাটবার উপক্রম। তাঁর উল্লাসের বেগে তাকিয়া বার বার গড়িয়ে পড়ছে। বার বার তাকে তিনি কোলে টেনে নিচ্ছেন। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তাকিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেন—কোথায় তাকিয়া? এ যে তাঁর নাতবউ!

"আরে আরে তুমি যে! তাকিয়া কোথায়?"

দাদামশায়ের বিস্মিত প্রশ্ন। কক্ষচ্যুত তাকিয়ার বদলে কখন যে তিনি নাতবউকে কোলে টেনে নিয়েছেন—সে খেয়াল কি তাঁর আছে! আদর পেতে গিয়ে চাপড় খেতে খেতে সে বেচারীর জান্ যাবার জোগাড়! দাদামশায়ের মন রক্ষার জন্যে সে এতক্ষণ তাকিয়ারই মতো নিস্পন্দ হয়ে কোলে শুয়ে আছে।

ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ

শারীরিক শক্তিতে মানুষ অনেক পশুর চেয়েই দুর্বল। গরিলা, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র এমন কি গবাদি পশুর কাছেও মানুষ শারীরিক শক্তিতে অসহায়। দু-একজন শ্যামাকান্তের ন্যায় বীরপুরুষের কথা ধর্তব্য নয়।

কিন্তু বুদ্ধি ও মেধার দ্বারা মানুষ প্রায় সর্বশক্তিমান্ হতে চলেছে। সে আজ এমন শক্তির অধিকারী যে মুহূর্তে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারে।

এ গেল মানুষের শক্তির এক দিক। মানুষের শক্তির অন্য আর এক দিক আছে, যাকে সাধারণ ভাষায় আমরা বলি মনুষ্যত্ব। দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি কতকগুলি কোমল বৃত্তির সমষ্টি ঐ মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য।

পশুদের মধ্যে ঐ বৃত্তিগুলি নাই—একথা বলি না। তাদের মধ্যেও তা দেখা যায়—অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমাবদ্ধরূপে। নিজ নিজ সন্তানের প্রতি পশু-জননীর দয়া-মায়া, স্নেহ-প্রীতি আমরা নিয়ত লক্ষ করি। কিন্তু মানুষ যেমন পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী—এমন কি বিশ্ববাসী সকলকে ভালবাসে—তেমনটি আর কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নির্বিচারে সমস্ত মানুষকে—শুধু মানুষকে বলি কেন—সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসতেন।

এ যুগে গান্ধীজীর মধ্যে আমরা সেইরূপ ভালবাসা দেখেছি।

রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সকল মানুষকে ভালবেসেছিলেন। সারা পৃথিবীতে তাঁরা বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছেন।

প্রাচীনকালে ঋষিদের তপোবনে বাঘ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণিগণ একসঙ্গে বাস করতো। তারা হিংসা ভুলে যেতো। ঋষিদের প্রেম এত বিশ্বব্যাপী নিবিড় ও গভীর ছিল যে তাতে বনের হিংস্র পশুও বশীভূত হতো। সেই অগাধ প্রেমের প্রভাব তাদের হিংসা ভুলিয়ে দিত।

এ অনেকেরই কাছে কেবল এক চমকপ্রদ কাহিনী মনে হতে পারে। মনে হতে পারে—কল্পনাপ্রবণ মানবমনের ঐ এক রঙীন স্বপ্ন।

বাস্তবিক কি তাই ?

আজ আমি আমাদের প্রত্যক্ষ-করা এ যুগের দু-একটি ঘটনার কথা বলছি।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্চর্য চরিত-কথা অনেকেই শুনে থাকবেন।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের মধ্যেই তাঁর নিজস্ব একটি ছোটখাটো আশ্রম ছিল। আমলকী, আম, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলের এবং গোলাপ, গন্ধরাজ, নাগকেশর, মুকুন্দ প্রভৃতি ফুলের গাছের প্রাচুর্যে সেই আশ্রমটি অতি মনোরম ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন —'দ্বিজাশ্রম'। কিন্তু সাধারণত সকল লোকে তাকে 'নীচু বাংলা' বলতো—বা এখনও বলে।

আমরা নিজের চোখে দেখেছি—দ্বিজেন্দ্রনাথের দেহের উপর, শালিক ও কাঠবেড়ালী প্রভৃতি প্রাণী নিঃসংকোচে বসছে। তাঁর শরীরটি যেন পশুপক্ষীর একটি বাসবৃক্ষ।

তিনি যখন কাজ করতেন, তখন তাঁর চারপাশে, অতি নিকটে, নানা-জাতীয় পাখী নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াত। কখনো কেউ টেবিলের উপর, কেউ নীচে, কেউ তাঁর মাথায়, কেউ কোলে বসছে। কেউ বা তাঁর

জোব্বার ভিতর ঢুকে পড়ছে। যেন তারা লুকোচুরি খেলছে। চপল শিশুর মতো, কেউ তাঁর টেবিলে রাখা চশমা, কেউ বা পেনসিল, কেউ বা দোয়াতের ঢাকনাকেই খেলনা করে নিয়ে খেলায় মেতে গেছে। তিনিও মাঝে মাঝে, লেখাপড়ার কাজ ছেড়ে, তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন।

তাঁর খাওয়ার সময় ততোধিক এক বিচিত্র মনোরম দৃশ্য। কত রকমের পশুপক্ষী যে তাঁর টেবিলে এবং টেবিলের চারপাশে জড় হতো—তা বলবার নয়। সকলের সঙ্গে মিলে তিনি যেন প্রতিদিন মজা করে 'বনভোজন' করতেন।

এরা সব বন্য প্রাণী, কেউ পোষা নয়! অবশ্য তাঁর কাছে এরা পোষমানা পশুপক্ষীরই মতো।

একবার একটা বড় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

একটি শৃঙ্গধারী সুন্দর হরিণ শান্তিনিকেতনে সদ্য আনা হয়েছে। সে তখনও বন্য এবং দুর্ধর্ষ। অনেককেই সে সাংঘাতিক রকম আঘাত করেছে। তাই তাকে কায়দা করে এক মজবুত দড়িতে বেঁধে দড়ির দুই প্রান্ত দুটো গাছে বেঁধে দেওয়া হলো।

ঠিক মনে নাই—সে-সময় শান্তিনিকেতনে কী একটা উৎসব ছিল। বাইরের থেকে অতিথি-সমাগম হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসে। পাছে কেউ হরিণটির কাছে গিয়ে আহত হন—তাই বাঁধা থাকলেও কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র সেখানে পাহারা দিচ্ছিল।

হঠাৎ দেখা গেল—দ্বিজেন্দ্রনাথ হন হন করে সেদিকে আসছেন। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বালকদের তো কথাই নাই। তিনি যখন সোজা হরিণটির দিকে অগ্রসর হলেন—পাহারাদার-বালকগুলির মুখে কোনো কথা সরলো না। কিন্তু তারা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! তাদের ভয় হলো—বৃদ্ধ বুঝি আজ মারাত্মক রূপে জখম হন।

কিন্তু সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ একেবারে

হরিণটির কাছে গিয়ে—তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। হরিণটিও পোষা কুকুরের মতো তাঁর গা হাত চাটতে লাগল !

হিংসাশূন্য প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অলৌকিক মহিমা সেদিন সকলে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল।

—শিশুসাথী, চৈত্র ১৩৬৯।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

"আতুর জনের শিয়রে বসিয়া
জাগিব রাতি
অনাথের নাথ সাথীহারাদের
হইব সাথী।
দীন দরিদ্র নিঃস্ব জনের
করিব সেবা,
সংসারে হায়, অসহায়দের
দেখিছে কেবা!..."
"সেবায় আমার ফোটে যবে কারো
মুখেতে হাসি,
হৃদয়ে আমার উছলে তখন
যে সুখরাশি,
তাই তো অমৃত। স্বাদ লভি তার
জীবন ধন্য,
তার কাছে ওই নীরস মোক্ষ
অতি নগণ্য!"

—বোধিসত্ত্ব

দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী বলতেন—'বোধিসত্ত্ব'। স্বপাকভোজী আচারনিষ্ঠ শাস্ত্রীমহাশয় এণ্ডরুজ সাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন। বলতেন—ওঁকে মনে করি আমি 'ব্রাহ্মণ! বোধিসত্ত্ব!'

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে আমি

বহুবার একথা শুনেছি। এবং বহুবার এণ্ডরুজের চরণে মাথা নোওয়াতে দেখেছি।

সেই সর্বজনপ্রণম্যের পদতলে বসে বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।

১৯১৭-১৯ সাল। বয়স তখন বারো কি তেরো! বছরখানেক তখন ইংরেজি ধরেছি। ইংরেজি পড়াতে লাগলেন এণ্ডরুজ এবং রবীন্দ্রনাথ।

এণ্ডরুজ বাঙলা প্রায় জানতেনই না। যদি বা দু-একটা কথা বুঝতে পারতেন, বলতে একেবারেই পারতেন না। সেই এণ্ডরুজের কাছে ইংরেজি শিখছে যারা, সেই আমরা ইংরেজি প্রায় জানিই না। বলতে একেবারেই পারি না।

অথচ ক্লাসে যাই রোজ, পড়তে লাগে ভালো, বুঝতেও খুব অসুবিধে হয় না। ছোট ছোট বাক্যে, অতি সরল ভাষায় তিনি আমাদের পাঠ শিক্ষা দেন। এত সহজ, সরল ইংরেজি খুব কম শিক্ষককেই বলতে শুনেছি।

তাঁর মুখের মধ্যে এমন একটি শিশুসুলভ মিষ্টতা, এমনি একটি সুমধুর হাসি ফুটতো যে আমরা ভুলেই যেতাম আমাদের বয়সের পার্থক্য! তিনি যেন আমাদের সমবয়সী সাথী!

'বেণুকুঞ্জ' ছিল তখনকার শান্তিনিকেতন আশ্রমের একটি শ্রেষ্ঠ কুঠী। সেই কুঠীতেই এণ্ডরুজকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেবক, রাধুনী, বা বাবুর্চি ছিল—'জহুরী'।

এণ্ডরুজকে সে ভালবাসতো এবং সযতনে সেবা করত।

এণ্ডরুজের একবার মারাত্মক কলেরা হয়। বাঁচবার আশা ছিল না। শুনেছি, তাঁর জন্য গোর পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বেঁচে যান। সেই সময় যাঁরা তাঁকে প্রাণপণে সেবা করেছিলেন —তাঁদের একজন হলেন এই 'জহুরী'। আর একজন সেকালের বয়স্ক ছাত্র—কালিদাস দত্ত।

এণ্ডরুজ্ সারাজীবন এঁদের কথা গভীর স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মুনীশ্বর' রবীন্দ্রনাথের 'উমাচরণ' 'সাধু' ও 'বনমালী'র মতো এণ্ডরুজের 'জহুরী' ছিল একান্ত অনুগত সেবক।

ধার্মিক প্রভুর সঙ্গে থেকে 'জহুরী'র ধর্মভাবও জাগ্রত হয়েছিল। সে তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে ভুবনডাঙার যে ঈদ্‌গা করিয়ে দেয়, তা আজ তার, বোলপুর ও ভুবনডাঙা গ্রামের সহধর্মীদের সর্বজন পরিচিত উপাসনাস্থল।

শৈশবে বোধ হয় মাত্র বছর দুই আমরা এণ্ডরুজের কাছে ইংরেজি পড়ার সুযোগ পাই। কেননা এণ্ডরুজ স্থায়ীভাবে শান্তি-নিকেতনে থাকতে পারতেন না। তাঁকে প্রায়ই দেশে বিদেশে ছুটে বেড়াতে হতো। বিশ্ব যাঁকে ডাক দেয়, বিশ্বভারতীও তাঁকে আটকে রাখতে পারে না।

ঐ বছর-দুই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি আমাদের সুহৃদ, বন্ধু ও আত্মার আত্মীয় হয়ে যান।

তিনি কি শুধু আমাদের পড়িয়েছেন! আমাদের মতো বালকদের দিয়ে তিনি ইংরেজি নাটকও অভিনয় করিয়েছেন। এর মধ্যে 'শারদোৎসব'-এর ইংরেজি 'Autumn Festival'-এর কথা বেশি মনে আছে।

তাঁরই তত্ত্বাবধানে শৈশবে এরূপ একটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় করে আমরা প্রশংসা লাভ করি।

আমরা ভালো করেই জানতাম—এণ্ডরুজ বাঙলা জানেন না। একদিন আমাদের সকলকে সচকিত করে এণ্ডরুজ আবৃত্তি করে বসলেন—

"দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
বক্ষের দরজায় নামল

বন্ধুর রথ সেই
থামল !......"

গীতাঞ্জলী, শ্রাবণ, ১৩২১।

তিনি বলেছিলেন—"গুরুদেবকে আমি একবার একটা গ্রীক ছন্দ শোনাই। সেই শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ এই কবিতাটি লিখে ফেললেন !"

দীর্ঘ বাহান্ন-তিপান্ন বছর আগের কথা বলছি—সম্ভবত ঠিকই বলছি—এ তাঁরই মুখে শোনা এবং আশা করি স্মৃতিভ্রম হয়নি।

ভাষার কথা ছেড়ে দিলে আমাদের 'এণ্ডরুজ সাহেব' চালচলন, বসনভূষণ সবেই ভারতীয়দের সঙ্গে বা আমাদের বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ধুতি, পায়জামা এবং পাঞ্জাবীই ছিল তাঁর বসন এবং খদ্দরই ছিল তাঁর ভূষণ। অন্য আশ্রমবাসীদের মতই তিনি নগ্নপদে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিনের একটি দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে।

সাধারণ পাকশালার পাশের রাস্তা দিয়ে এণ্ডরুজ চলেছেন। পিছনে পিছনে একদল শিশু ভিড় করে চলেছে। ব্যাপার কি ! চেয়ে দেখি এণ্ডরুজের মাত্র এক-পায়ে চটি। অন্য পায়ে চটি নাই।

পায়ে ক্ষত হওয়ায় ওষুধ দিয়ে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধতে হয়েছে। বিষাক্ত হবার ভয়েই চটি পরতে হয়েছে। কিন্তু অন্য পায়ে তো ক্ষত নাই, সে পায়ে কেন চটি পরবেন !

আত্মভোলা এণ্ডরুজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই ঘটনাটি হতে কতক বোঝা যাবে।

বাল্যের আর একটি দৃশ্যের কথা ভুলি নাই। জীবনে কোনোদিন ভুলব না।

যিশুর জন্মদিনে, সন্ধ্যায় এণ্ডরুজ মন্দিরে উপাসনা করবেন।

উপাসনার মধ্যে সমাহিত এণ্ডরুজ তাঁর শৈশবে ফিরে গেছেন। মা-র কাছে তিনি যিশুর জীবনকাহিনী শুনছেন। শিশুদের চিত্তমুগ্ধকারী রূপকথার মতো সেই কাহিনী।

ইংলণ্ডের এক শিশুর মা-র কাছে শোনা বিচিত্র চরিত্রকথা বাঙলা-দেশের শিশু আমরা শুনলাম।

দেশবিদেশের ভেদাভেদ ভুলে গেলাম। সেই কাহিনীর মধ্যে যিশুকে আমরা আপন করে পেলাম।

আমাদের মনে হলো, যিশু যেন 'এণ্ডরুজ সাহেব'-এর মতই কোনো মানুষ। অমনি তাঁর শিশুর মতো দুটি চোখ। অমনি তাঁর মধুর হাসি। অমনি তাঁর বর্ণ ও বেশ !

আমরা যেন প্রতিমার মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করলাম।

—C. F. Andrews Centenary Volumn

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্‌।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

শরীর ভস্মাবসিত। পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন। হে কর্মী, কর্মকে স্মরণ করো, কর্মকে স্মরণ করো।

যে প্রতিভাবান পুরুষ, দীর্ঘ অশীতিবর্ষাধিককাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করছিলেন, তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর সেই গৌরাঙ্গ পার্থিব দেহ অনলে ভস্মসাৎ হলো। প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহাস্পদ পুত্র-কন্যা পৌত্র, দৌহিত্র, অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, অগণিত ভক্তবৃন্দ সকলের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে, এই পৃথিবীর সর্বসম্পদ পরিত্যাগ করে, সর্ব-ত্যাগী, নিঃস্ব নিরাবরণ পুরুষ পরলোকে পাড়ি দিলেন। এই পৃথিবীর সর্বশেষ অবলম্বন তাঁর সেই পার্থিব দেহও এখানেরই আকাশে, বাতাসে, জলে, অনলে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী যাবৎ, এই আশ্রমে তিনি পরম তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এখানের বায়ুমণ্ডল তাঁর সাধনায় পরিপূর্ণ। এই আশ্রমের প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর পদচিহ্ন বার বার অঙ্কিত হয়েছে। এখানের আকাশে তাঁর উদাত্ত বাণী ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর অপূর্ব মধুর বাচনভঙ্গি আমাদের কর্ণে মধুবর্ষণ করেছে। তাঁর সম্মোহনী ভাষা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তাঁর কণ্ঠ আজ নীরব। বাচস্পতি আজ বাক্যহারা।

তিনি ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী। এই ভারতের দেশে দেশে, নগরে

নগরে, গ্রামে, অরণ্যে তিনি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণপিপাসা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মেটেনি। তাই সেই ভ্রমণ-পিপাসু মহাপথিক নূতন নূতন দেশভ্রমণের আকুল আকাঙ্ক্ষায় পরলোকে পাড়ি দিলেন।

আমরা তাঁকে বিদায় দিলাম। দেহ তাঁর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে, ললাট তাঁর চন্দনচর্চিত করে, মহর্ষির মহাসঙ্গীতের করুণ মধুর সুরে, আমরা আশ্রমবাসিগণ, সেই বয়োজ্যেষ্ঠ আশ্রমিককে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। শতশতাব্দী পূর্বে, যে-ভাষায়, যে-পদ্ধতিতে আমাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহগণ তাঁদের পরমাত্মীয়কে বিদায় দিতেন, আমরাও সেইভাবে তাঁকে বিদায় দিলাম।—

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃপরেয়ুঃ।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ॥

"যাত্রা করো! যাত্রা করো! হে পান্থ, তুমি লোক-লোকান্তরে যাত্রা করো। যে-পথে আমাদের পূর্বপিতামহগণ গিয়েছেন, সেই পথে তুমিও তোমার মহাযাত্রা শুরু করো।

"তুমি কি একাকী? তুমি কি নিঃসঙ্গ? না! অসংখ্য প্রিয়জন, অগণিত বন্ধুবর্গ, ভক্তবৃন্দ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও। ইহলোকে তোমার সমস্ত সম্পদ তুমি পরিত্যাগ করে গেছ। তাই বলে তুমি কি নিঃস্ব? না। তোমার অপরিমিত সুকৃত। তা-ই তোমার অমূল্য সম্পদ। তা-ই তোমার এই মহাযাত্রার পাথেয়। সেই পাথেয়কে সম্বল করে, তুমি স্বর্গলোকে অবগাহন করো। সেই স্বর্গীয় অবগাহনে তোমার যা কিছু অবদ্য—যা কিছু মালিন্য—তা অপনীত হবে। তুমি নূতন দেহ লাভ করবে। জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করে হে তপস্বী, তুমি নিজগৃহে গমন করো।"

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নূতন বসন পরিধান করে,

জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে, তুমিও সেইরূপ নূতন দেহ ধারণ করো। হে প্রবাসী, নিজগৃহে গমন করো।

আমরা তোমাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে, এপারে বিদায় দিলাম ; পরপারে পারিজাতপুষ্পে সজ্জিত করে তোমাকে সেই স্বর্গবাসীগণ আবাহন করে নেবেন।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ॥

"আজ তোমার আনন্দের দিন। বাতাস তোমার জন্যে মধুবহন করছে, আকাশ মধুবর্ষণ করছে, স্রোতস্বিণীগণ মধুক্ষরণ করছে। রাত্রি মধুময়, ঊষা মধুময়, পৃথিবীর ধূলিকণাও মধুময়।"

এ কি কেবল কথার কথা! আমরা কি এ প্রত্যক্ষ করছি না? আশ্রমের শালবীথি মঞ্জরিত। আম্রকুঞ্জ মুকুলিত। মধুকপুষ্প প্রস্ফুটিত। ধূলিকণা শালপুষ্পের পরাগে সমাচ্ছন্ন, আম্রমুকুলের মধুতে পরিষিক্ত। বায়ুমণ্ডল সুগন্ধিত।

আকাশ হতে সুধার ধারা বর্ষিত হচ্ছে! রজনী জ্যোৎস্নাস্নাতা। পাপিয়ার সুললিত সঙ্গীতে ঊষা পরিপূর্ণ। এই অপূর্ব সৌন্দর্যের, অপরিমেয় মাধুর্যের, অপরূপ লীলার মধ্যে, তোমার মহাযাত্রা শুরু হয়েছে।

বহু দূরে, এই পার্থিব জগৎ হতে বহু দূরে, তুমি চলে গেছ। তোমার সঙ্গে আমাদের পার্থিব যোগ ছিন্ন হয়েছে। আমরা তোমাকে আজ কি দেব? কি-ভাবে আমরা আজ তোমার সহায় হব? আমাদের দেয় কোনো পার্থিব সম্পদই আজ তোমার কাছে পৌঁছবে না।

আমাদের এই পার্থির জীবনের অপার্থিব শ্রদ্ধাই আজ তোমাকে দান করতে পারি। আমাদের শ্রদ্ধাই কেবলমাত্র তোমার কাছে যেতে পারে। তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। তাই আজ আশ্রমিকগণ, বহিরাগত ভক্তবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন সকলে এই মন্দিরে সম্মিলিত হয়ে একযোগে আমাদের শ্রদ্ধা তোমাকে সমর্পণ করছি।

তোমার পিপাসু আত্মা আমাদের এই শ্রদ্ধার বারি গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করুক। আমাদের এই শ্রদ্ধার অমৃত দিয়ে আমরা তোমার তর্পণ করছি।

শুধু কি তোমারই তর্পণ করছি! তোমার সঙ্গে, তৃষিত, তাপিত বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীর তর্পণ করছি।

শোক এক পরম পূজা

শোককে বলা হয়েছে পরম দেবতার পরম পূজা। পরম, পবিত্র যিনি, কেবলমাত্র পূতচরিত্র ব্যক্তিই তাঁর পূজা করতে পারেন। শোকের অশ্রুজলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ ধৌত হয়। তখনই মানুষ পূজার অধিকারী হয়।

বর্ষার বারিধারা কঠিন মাটিকে নরম করে। উর্বরা করে। শস্য-শ্যামলা, ফলপ্রসূ করে। সেইরূপ শোকের অবারিত অশ্রুধারা মানুষের হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করে। অন্তঃকরণকে কোমল, সরস, স্নেহশীল করে।

দুঃখের অনুভূতি, জগতের সমস্ত দুঃখীর প্রতি সমবেদনা আনে। তাই নিজ প্রিয়জনের তর্পণের সঙ্গে, জগতের যে-যেখানে আছে, সকলেরি সে তর্পণ (তৃপ্তিসাধন) করে ঃ—

> দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোসুরাঃ ।
> ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ॥
> বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ ।
> নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে ॥
> আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ।
> তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥
> অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্ ।
> ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্ ॥

"দেব, দানব, উচ্চ, নীচ, দীনহীন, শত্রু-মিত্র সকলেই তৃপ্ত হোন। নরনারী, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ, উদ্ভিদ সকলেরই তৃপ্তি হোক। জলের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে যে-সব ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র

জীব জীবন ধারণ করছে, পাপী, তাপী ক্রূর, কুটিল বিষধর সর্প, সমস্ত তৃষিত প্রাণীই, আমার এই শ্রদ্ধাপ্রদত্ত জলাঞ্জলির দ্বারা পরিতৃপ্ত হোন।

"আমার পিতা, পিতামহগণ, মাতা মাতামহগণ, সেই সঙ্গে তৃপ্তিলাভ করুন। যে- প্রাণীগণের বংশলোপ হয়েছে, কোটী কোটী পরলোকবাসী সেই প্রাণীগণ সপ্তদ্বীপবাসী জীবগণ, সকলেরই আজ আমি পরিতৃপ্তি কামনা করি।"

শত শত বর্ষ পূর্বে, ভারতের কোন অজ্ঞাত ঋষি, প্রিয়তমের মহাপ্রয়াণে এই অপূর্ব দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন! যে দৃষ্টির আলোকে, আত্মপর ভেদ, শত্রু মিত্রের পার্থক্য দূর হয়েছিল। সমস্ত বিশ্ব তার মিত্রে পরিণত হয়েছিল। এক আত্মা তাঁকে ত্যাগ করে, বিশ্বের সমস্ত আত্মাকে তাঁর আত্মীয় করে গিয়েছিলেন।

আমাদের সেই অজ্ঞাত প্রপিতামহ আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমাদের সেই দিব্যদৃষ্টি দান করুন। আমাদের আত্মপর ভেদ বিলুপ্ত হোক। অন্তরের অন্তঃস্তল হতে উদার স্নিগ্ধকণ্ঠে তাঁরই মতো আমরাও যেন প্রার্থনা করতে পারি:

"সকলেই তৃপ্ত হোন। দেব যক্ষ হতে আরম্ভ করে দীন-হীন সর্ব প্রাণী পরিতৃপ্তি লাভ করুন। ক্ষুধিত, তৃষিত, পাপরত, ধর্মরত সবারই আজ তৃপ্তি হোক। আমার এই তর্পণে যেন ত্রিভুবনের তর্পণ হয়।"

অন্তর আমার মহামৈত্রীর মাধুর্যে পূর্ণ হোক। তবেই আকাশ আমার জন্য মধুবর্ষণ করবে। বাতাস আমার জন্য মধু বহন করবে। রাত্রি আমার মধুময় হবে। দিবস মধুময় হবে। পৃথিবীর তুচ্ছ ধূলিকণাগুলিকেও আমি মধুর দৃষ্টিতে দর্শন করব।

২

মানুষ ঐ সৌরজগতের মতো বিরাট, তার অন্ত পাওয়া যায় না। একসঙ্গে অর্ধ শতাব্দী বাস করলেও একটি সাধারণ মানুষকেও "সম্পূর্ণ

বুঝেছি” এমন কথা বলতে পারি না। অসাধারণ মানুষের তো কথাই নাই। প্রায় অর্ধশতাব্দী (দীর্ঘ ৪৪ বৎসর) আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর আমি অন্তেবাসী ছিলাম। অতি ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁর সাহায্য পেয়েছি। এই দীর্ঘকাল অনবরত তাঁর সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু তাঁর শেষ পাই নাই। মৃত্যুর সপ্তাহ-পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে নিত্য নতুন রূপে দেখেছি। নিত্য তাঁর নতুন কথা শুনেছি।

প্রতিদিন তাঁর অন্তরের সুধা, আমার অন্তর পূর্ণ করেছে। যখনই অবসর পেয়েছে, তাঁর কাছে ছুটে গেছি। শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণ তাঁর সরস ছিল। তাঁর সেই রসমাধুর্য নিকটবর্তীদেরও সরস করেছে। সেই রসপরিবেশনের দাক্ষিণ্য হতে তাঁর ভৃত্যবর্গও বঞ্চিত হয় নাই। কী সহানুভূতি, কী অনুকম্পাই না তাঁর দাসদাসীদের প্রতি। তাঁর ভৃত্যবর্গ কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করতো না। দীর্ঘ বিশ পঁচিশ বছর যাবৎ এক-একজন ভৃত্যকে তাঁর গৃহে অবস্থান করতে দেখেছি—অন্যত্র যারা প্রতি বৎসর প্রভু-পরিবর্তন করে।

তাঁর ভৃত্যবর্গ পুত্রের ন্যায় তাঁর সেবা করেছে—তাঁকে ভালো বেসেছে। ভৃত্যের এমন স্নেহ, এমন সেবা অন্যত্র ক্বচিৎ দেখেছি। পিতৃবিয়োগের মতো তাঁর বিয়োগ তাদের বুকে বেজেছে।

বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, অতি নিম্ন শ্রেণী হতে তাঁর কাছে শিক্ষা শুরু করি। বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাভবনেও তাঁর কাছে অধ্যয়ন করি। বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা আমার কাছে যেমন সরস ও চিত্তাকর্ষক ছিল—যৌবনেও তাঁর অধ্যাপনা তেমনি সরস ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। পঞ্চাশ-উর্ধ্বে, পঞ্চান্নের নিকটবর্তী হয়ে আজও আমি তাঁর অন্তেবাসী ছিলাম। এই বয়সেও তাঁর শিক্ষা তেমনি সরস, তেমনি চিত্তাকর্ষক, তেমনি আনন্দদায়ক হতো।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনার লুক্কায়িত সম্পদ তিনি আবিষ্কার করে-ছিলেন। তিনি ছিলেন কাশীর পণ্ডিত। বেদ-বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য সমস্তই তিনি সে-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যদের নিকট

অধ্যয়ন করেছিলেন। উচ্চ জাতির উচ্চ সংস্কৃতির শিখরে অবস্থান করে, অস্পৃশ্য অবনতদের সাধনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁর মতো পাণ্ডিত্যের কৌলিন্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো তাই আমাদের বিস্মিত করে দেয়। অথচ—তাই সম্ভব হয়েছিল। অবশেষে তিনি তারই মধ্যে নিমগ্ন হলেন।

তিনি যে-সম্পদ উদ্ধার করেছেন তা আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এত বড় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি শিশুদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলেন—তাঁর চরিত্রের এ-ও এক বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের পরেই যে প্রতিভাবান আশ্রমিকের, পাঠন, বাচন, ভাষণ-পদ্ধতি শিশুদেরও সম্মোহিত করেছিল—তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন। ক্লাস ছুটি দিলেও ছেলেরা ছুটি নিতে চাইতো না—তাঁর কাছে। তাঁর গল্প শোনার সাক্ষী যে-শিশুরা ছিলেন—তাঁরা আজ প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। আজও তাঁরা সে-গল্পের কথা ভুলতে পারেননি।

আর তাঁর ভাষণ? বাক্যের মধ্যে যে কী সম্মোহনী শক্তি আছে, তা যে তাঁর ভাষণ শুনেছে—সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। ভাষার যাদুকর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান থাকতে, শ্রোতাদের সম্মোহিত করা কি সহজ কথা?

শান্তিনিকেতনের বাইরে, বৃহত্তর বাংলাদেশে, তথা সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর অদ্ভুত প্রভাব ছিল, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী ভক্তবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে, পরমোৎসুক্যে, শ্রদ্ধাবিগলিতচিত্তে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতেন তাঁদের কাছে তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের বাইরে তাঁর সঙ্গী হবার, তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একদিনের ঘটনা আজ পঁচিশ বছর ধরে আমার চক্ষের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

উত্তরবঙ্গের এক ব্রহ্ম-মন্দিরে সাংবৎসরিক উৎসব। হিন্দু ও মুসলমান

সম্প্রদায়ের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। ভক্তমালের উপাখ্যানের উপর তিনি ভাষণ দিচ্ছেন। নীরব, নিস্পন্দ হয়ে শ্রোতৃগণ শ্রবণ করছেন। অবশেষে একস্থানে হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রোতাই আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। তখন আমি যুবক—প্রায় নাস্তিক। আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, পার্শ্বে চেয়ে দেখি সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করছেন। এ দৃশ্য ভুলবার নয়।

অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চচিন্তার উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন—আচার্য ক্ষিতিমোহন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দারিদ্র্যের দিনে তাঁর চালচলন যেমন ছিল, পরিণত বয়সে সম্পদের দিনেও তার কোনোই পরিবর্তন হয় নাই। যখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য, তখনও তাঁর বেশভূষা চাল-চলন অতি সাধারণ কর্মীর ন্যায়। ঘরের তৈরি মামুলি ফতুয়া, কেটের চাদর গায়ে, অতি পুরাতন চপ্পল পায়ে যখন তিনি সর্বত্র চলাফেরা করতেন, তখন বিদেশী বিদ্যার্থীদের বলতে শুনেছি—"পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উপাচার্যের মধ্যে এমন সাদাসিধে উপাচার্য আর একটি মিলবে না।"

আজ বসন্ত পূর্ণিমা। দোলযাত্রা। পরম উৎসবের দিন। আজকের দিনে আমরা যে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হয়েছি—এরও তাৎপর্য লক্ষ্যণীয়ঃ

শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন তিনি। তাঁকে ছাড়া এখানের কোনো উৎসবের কথা ভাবতে পারি না। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন উৎসবের নায়ক, আচার্য ক্ষিতিমোহন ছিলেন তেমনি উৎসবের সূত্রধার। যে-বৈদিক মন্ত্রগুলি শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসবের বীজমন্ত্র; তার প্রায় সমস্তই আচার্যদেব সংগ্রহ করে গেছেন। প্রতি পুষ্প হতে যেমন কণা কণা মধু সংগ্রহ করে মধুমক্ষিকা মধুচক্র নির্মাণ করে, আচার্যদেবও তেমনি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র হতে মন্ত্র সংগ্রহ করে বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, হলকর্ষণ,

বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি আশ্রমিক উৎসবগুলিকে সরস ও অলংকৃত করে-ছিলেন। আজ অর্ধশতাব্দী যাবৎ আমরা তাঁর প্রদত্ত সেই 'মধুচক্রে'-র আস্বাদ গ্রহণ করছি। আরও কতকাল না-জানি আমাদের উত্তরা-ধিকারিগণ তার আস্বাদ গ্রহণ করবে !

পূর্ণ সফলতার সহিত জীবনযাপন করে সেই মহামনীষী পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর এই মহাপ্রয়াণ তাঁর নিকট পরম আনন্দদায়ক, আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করি :

মা ছিত্থা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য সংদৃশঃ।

এই লোক হতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করো না। সূর্য যেমন অতিদূরে অবস্থান করেও আমাদের অন্ধকার দূর করেন, তুমিও তেমনি আমাদের চিত্তের অন্ধকার দূর করো। অগ্নির ন্যায়, সূর্যের ন্যায় তুমি আমাদের আলোকদান করো। পথ-প্রদর্শন করো।

হায় ! আমরা কি তোমার বিয়োগদুঃখ ভুলতে পারি ? আশ্রম যে আজ রিক্ত হয়ে গেল ! এই ক্ষতি কি পূরণ হবে ?

কেবল শান্তিনিকেতনে কেন, সমস্ত ভারতে তাঁর স্থান সহজে পূরণ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পরম অন্তরঙ্গ সমধর্মী, রবীন্দ্রকাব্যের, রবীন্দ্রদর্শনের মর্মগ্রাহী বোদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক, সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, আমরণ পরমনিষ্ঠ ভক্ত, আচার্য ক্ষিতিমোহনের তিরোধান বিশ্বভারতীকে নিঃস্ব করে গেল। আমরা তাঁর অভাব ভুলবো কেমন করে ?

এই নিরাশার মধ্যে একমাত্র আশা—আমার সম্মুখে উপবিষ্ট এই শিশুগণ। এই অনাগত, ভবিষ্যৎ। আমরা বালগোপালের পূজা করি। সম্মুখে আমার সেই বালগোপাল। সেই শিশুভগবান ! সেই অনন্ত সম্ভাবনা। এদের মধ্যে থেকেই আচার্যগণ আবির্ভূত হবেন। বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, হরিচরণের সত্তা পুনরুজ্জীবিত হবে। কে জানে, এদের মধ্যে থেকে হয়তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পুনরাবির্ভাব হবে।

এই শিশু-ভগবানের সেবার, শিক্ষার ভার আমাদের উপর।

আমার ভয় হয়, আমরা কি এদের শিক্ষা দেবার যোগ্য ?

ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে, এখানে কত ঋষি কত মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেছেন। কত বুদ্ধ, তাঁর পার্শ্বচর সারিপুত্ত, মোগ্‌গল্লান, আনন্দ প্রভৃতিকে নিয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করেছেন।

হাজার বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ থেকেও এর প্রাণশক্তি নষ্ট হয়নি—এই দুর্গতি-লাঞ্ছিত অবসাদ-পরিপূর্ণ যুগেও কত মহাপুরুষ, কত সাধক, কত মনীষী, মহামনীষী, কবি, মহাকবি জন্ম নিয়েছেন এই ভারতবর্ষে।

আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতে আরও কত মহামানব জন্ম-গ্রহণ করবেন। এই শিশুদের মধ্যেই তাঁদের আবির্ভাব হবে। যেখানেই তাঁদের আবির্ভাব হোক, ভারত-সংস্কৃতির কেন্দ্র এই বিশ্ব-ভারতী নিশ্চয়ই তাঁদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে। আমাদের এই রিক্ততা সেদিন পূর্ণ হবে।

আমরা শোকদগ্ধ আশ্রমিকগণ একান্তচিত্তে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছি। মহাকাল আমাদের বর্তমান দুঃখ দূর করবেন।

—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬৭।

রবির শেষ রশ্মি অস্তাচলে মিলিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর নন্দলালের তিরোধান হলো।

আড়াই হাজার বছর পূর্বের একটি স্মরণীয় ঘটনা মানসচক্ষে দেখছি—ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর আনন্দের তিরোভাব।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর নন্দলালের তিরোধান তেমন এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা।

ভারতবর্ষের একটা দিক অন্ধকার করে, এক দিকপাল অস্ত গেলেন। এক গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দীর অবসান হলো।

রূপরসশব্দগন্ধে ভরা পরমসুন্দর এই বিশ্বকে সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন আচার্য নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথের পর এই বিচিত্র জগতের অপরূপ রূপকে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন যিনি, সেই তাঁর তিরোধান হলো। এখন এই সৌন্দর্যকে দেখবে কে—দেখাবে কে?

আমরা রঙ-কানা। চোখ থেকেও আমরা অন্ধ। শত সূর্যোদয়, শত সূর্যাস্ত তার বিচিত্র রঙের লহরী তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে আমরা তা দেখেও দেখতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কল্পনা করেছিলেন। বিশ্বের সকল বিদ্যার কেন্দ্র হবে তাঁর শান্তিনিকেতন। প্রাচী ও প্রতীচীর—বিদ্যার দুই ধারার—মহাসঙ্গম তীর্থ হবে তাঁর আশ্রম। তাঁর কাছে সকল বিদ্যার

শ্রেষ্ঠবিদ্যা ছিল সঙ্গীত ও কলা। তিনি নিজে ছিলেন কবি ও শিল্পী। তাই শিল্পী নন্দলাল ছিলেন তাঁর সমধর্মী,—তাঁর অন্তরের অন্তরঙ্গ।

বিশ্বভারতীর রূপায়ণে নন্দলালের দানের তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতের ঋতু-উৎসব পুনরুজ্জীবিত করেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব, যাঁরা রূপায়িত করতেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন নন্দলাল।

অপূর্ব আলিম্পনা, মনোহর বর্ণবিন্যাস, বিচিত্র রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা, রঙ-বেরঙের সাজসজ্জা—উৎসবের বহিরঙ্গের সর্ব-প্রকার রূপায়ণই হতো নন্দলালের হাতে।

প্রাচীনকালে, এই ধরণীতে, মহামৈত্রীর ধর্ম প্রচার করেছিলেন ভগবান তথাগত। তাঁর সেই ধর্মপ্রচারে আত্মদান করেছিলেন— সারিপুত্ত, মহামৌদ্‌গলায়ন, আনন্দ, অনিরুদ্ধ, মহাকাশ্যপ প্রভৃতি অন্তেবাসিগণ।

এ যুগে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক করতে এগিয়ে এসেছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন, আচার্য নন্দলাল, অসিতকুমার, মহামতি এণ্ডরুজ, মহাপ্রাণ, পিয়র্সন, এলম্‌হার্স্ট, রামানন্দ, প্রশান্তচন্দ্র, সুনীতিকুমার, কালিদাস, রথীন্দ্রনাথ।

যজুর্বেদের ঋষির, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞের এক অপূর্ব সূক্ত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হলো ঃ—

"বেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্॥

সে-যুগের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সেই দর্শন রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে আর এক বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হলো। বিশ্ব যেখানে 'একটি নীড় বেঁধেছে'— এমন এক আশ্রয় কি এ জগতে সৃষ্টি করা যায় না?

কবি সংকল্প করলেন—বিশ্বের সেই নীড় বাঁধতে হবে—এই শান্তিনিকেতনে। সেই নীড়ে—একাধারে বিশ্ব এবং বিশ্বদেব বিরাজ করবেন।

বিশ্বের সেই নীড় গড়ে উঠল শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর সে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বিশ্ববিদ্যার প্রাণ বিশ্বমৈত্রীকে আদর্শ করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ। সেই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুটে এলেন—পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে উদারচরিত মনীষিগণ—আশ্রয় নিলেন বিশ্বভারতীতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিল আলো
> আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো।
> যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
> তাদের প্রাণের ঝরণা-স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা
> চলছে বেয়ে চতুর্দিকে।"

এই সব 'মনের মানুষ'—যাদের ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতো না—সেই আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন, নন্দলাল, অসিতকুমার, দিনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন, এল্ম্হার্স্ট, মরিস্, হরিচরণ, জগদানন্দ, কালীমোহন, সন্তোষচন্দ্র, গৌরগোপাল, চারুচন্দ্র, দেবেন্দ্রমোহন, অমিয়কুমার প্রভৃতি মনীষিগণ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এক নূতন সৌরজগৎ সৃষ্টি করলেন। ঐ সৌরজগতের উজ্জ্বলতম আলোক আজ নিভে গেল।

বিশ্বের এই 'নীড়' সৃষ্টিতে মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন নন্দলাল। বিশ্বভারতীকে যদি প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে প্রাসাদের উজ্জ্বলতম প্রকোষ্ঠ, নন্দলালের কলাভবন।

'বিশ্বের নীড়' বিশ্বভারতীর মধ্যে সবচেয়ে স্নেহময় আশ্রয় ছিল নন্দলালের 'নন্দন'। সেখানে তাঁর অন্তরের স্নেহ অঝোর-ধারে বর্ষিত হতো শিষ্য-প্রশিষ্যদের উপর। এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। স্নেহ সেখানেই নিঃশেষ হয়নি। আমরা অন্য বিদ্যার্থীরা তাঁর সেই স্নেহ-নির্ঝরে অবগাহন করেছি।

অতবড় মানুষ—কিন্তু কত সহজেই তিনি সকলকে গ্রহণ করতে পারতেন। কত সহজেই সকলে তাঁর কোলে স্থান পেতো।

সে কী স্নেহ! কোন্ পিতার, কোন্ মাতার স্নেহ সে স্নেহকে অতিক্রম করতে পারে? আমাদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন একাধারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বয়স্য।

স্নেহময় নন্দলাল! কত নিঃস্ব, দরিদ্র বালক, তাঁর স্নেহলাভ করে ধন্য হয়ে গেছে। রামকিংকর আজ ভারত-বিখ্যাত। কিন্তু নন্দলালের স্নেহলাভ না করলে বিশ্বভারতীতে তাঁর শিক্ষালাভই সম্ভব হতো না! এরূপ কত উদাহরণ দেব? সব আমরা জানিও না।

গোপনে, সবার আগোচরে, তাঁর দান অজস্রধারে বর্ষিত হতো। নিজেকে আড়াল করে রাখাই ছিল তাঁর স্বভাব। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বিধাতার সমধর্মী।

রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শেভরা এই সৃষ্টিকে আমাদের দান করেছেন যিনি—তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। তিনি নিজেকে এমনই আড়ালে রেখেছেন যে তিনি আছেন কি-না—তাতেও আমাদের সন্দেহ!

এই বিধাতারই মতো নন্দলাল সর্বত্র নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইতেন। নিজেকে সবার চক্ষের সমুখে ধরতে তিনি স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করতেন। 'সবার নিচে সবার পিছে'—থাকতে চাইতেন নন্দলাল।

নন্দলালের কলাভবনের সৌরভ, ভারত এবং ভারতের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। কলাভবনে স্থান পাবার জন্য এবং কলাভবনের স্নাতককে গ্রহণ করবার জন্য, ভারতে, সিংহলে এবং এসিয়ার অন্যত্রও প্রতিযোগিতা চলতো।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি—

কুসুমের চেয়ে কোমল—আবার বজ্রের চেয়ে কঠোর ছিলেন—নন্দলাল।

চোখের সামনে একদিনের এক অত্যাশ্চর্য লোমহর্ষক ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। মানসপটে তা অঙ্কিত হয়ে আছে।

সে এক ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র! সেখানে বিষাক্ত শরের অবিরাম বর্ষণ

চলেছে। প্রতিরোমকূপে বিষপূর্ণ সূচী বিদ্ধ হচ্ছে। তার মধ্যে অচল অটল নন্দলাল।

প্রভাতে মন্দিরে উপাসনা চলছিল। কোনো এক চপল বালক নিকটবর্তী ডাঁশ মৌমাছির এক বিরাট চাকে ঢিল মেরে পালিয়ে যায়।

মৌমাছির দল এক নিরীহ শিশুকে ঘন অন্ধকারের মতো ঢেকে ফেলে। চতুর্দিকে মৃত্যুর নাগপাশ। শিশুটির বুঝি আর রক্ষা নাই।

বিশ্বভারতীতে সাহসী যুবকের অভাব ছিল না। অসম সাহসে অনেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন—শিশুটিকে উদ্ধার করতে। তাঁদের মধ্যে ব্যায়ামবিদ, দৃঢ়দেহ, দৃঢ়চিত্তের অধিকারী অনেকেই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হলো।

দূর থেকে দৃশ্য দেখলেন—প্রৌঢ় নন্দলাল। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওকে উদ্ধার করতে না পারলে মৃত্যু ওর অবশ্যম্ভাবী!

চকিতে তাঁর ছোট অঙ্গবাসখানি তিনি তাঁর মাথায় ও মুখে জড়িয়ে নিলেন। তারপর সেই ভয়ঙ্কর শরবর্ষণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তিনি ফিরে এলেন। কিন্তু একা নয়—বালকটিকে কোলে নিয়ে। নিকটবর্তী অতিথিশালার (বর্তমান—দর্শনভবনের), এক অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠের অর্গল সর্বশক্তিতে চূর্ণ করে, ঢুকে পড়লেন। তারপর পলকের মধ্যে নিজ পৃষ্ঠ দিয়ে কপাট বন্ধ করে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে পড়লেন।

ইতিমধ্যে শত শত মৌমাছির নিদারুণ দংশন তাঁর প্রতিরোমকূপে বিষের জ্বালা জ্বালিয়ে দিয়েছে। শিশুটি তো অচেতন। তিন দিন তাঁরা উভয়েই জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। মুঠো মুঠো হুল তোলা হয়েছিল তাঁদের সর্বাঙ্গ হতে।

জীবনমরণের সন্ধিস্থল হতে উদ্ধার করা হলো শিশুটিকে। এবং তা সম্ভব হলো ঐ শিল্পী নন্দলালের দ্বারাই। একথা আজ প্রায় অবিশ্বাস্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বেশি কেউ আজ আর এখানে নাই।

এই নন্দলাল। কুসুমের চেয়েও কোমল অথচ বজ্রের চেয়েও

কঠিন। এই ভারতীয় পুরুষের আদর্শ। সেই আদর্শ পুরুষ আজ চলে গেলেন! ভারতবর্ষ হতে একজন সত্যিকারের পুরুষের তিরোধান হলো।

রত্নগর্ভা ভারতবর্ষ। হয়তো শতাব্দীর মধ্যেই নন্দলালের মতো শিল্পী আবার জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু একাধারে এমন পুরুষ ও এমন স্নেহশীল গুরু, এমন সর্বজনপ্রিয় মানুষ সহজে জন্মাবে কি ?

সমস্ত বিশ্বভারতী আজ অন্ধকার। 'নন্দন' আজ নিরানন্দ !

কিন্তু মৃত্যুর এক অপূর্ব রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

মৃত্যু যে কেমন মহান্—তা আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। চার পাঁচ বছরের শিশু থেকে, কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী, অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সে-মহান মৃত্যুর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে নিজেকে ধন্য পবিত্র মনে করেছে।

মৃত্যুর শোভাযাত্রা। মৃত্যুর শোভা ! হাঁ মৃত্যুর শোভাই প্রত্যক্ষ করলাম।

চন্দনচর্চিত শ্যামতনু পুষ্পমাল্যবিভূষিত। বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহা-নিদ্রায় অভিভূত নন্দলাল। সেই নন্দলালকে ধীরে ধীরে আশ্রম প্রদক্ষিণ করাচ্ছেন আশ্রমিকগণ।

'কর তাঁর নাম গান'—এই মহাসঙ্গীত গুন্‌গুন্‌স্বরে সহস্রকণ্ঠে গীত হচ্ছে। সহস্র হৃদয়ের স্নেহ অশ্রুরূপে বর্ষিত হচ্ছে।

চলেছেন নন্দলাল। শ্রীপল্লী হতে সঙ্গীতভবনে, সঙ্গীতভবন হতে 'নন্দনে'। নন্দন হতে শ্রীসদনে। সেখান থেকে দক্ষিণে—বেণুকুঞ্জের দিনেন্দ্র চা-চক্রে। সেখান থেকে বিদ্যাভবনে, বিদ্যাভবন থেকে আম্র-কুঞ্জে—আম্রকুঞ্জ হতে ছাতিম-তলায়—সেখান থেকে উত্তরায়ণে, তাঁর গুরুদেব, তাঁর প্রিয়তমের উদয়নে, শ্যামলীর সম্মুখে শেষ বিদায় নিয়ে, শান্তিনিকেতনের উপাসনা-মন্দির প্রদক্ষিণ করে, রতনপল্লীর পথ বেয়ে চলেছেন নন্দলাল সেই পবিত্র শ্মশানস্থলীতে, যা ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের, আচার্য-ক্ষিতিমোহন, আচার্য-প্রবোধচন্দ্র, মহীয়সী দেবী ইন্দিরার চিতাভস্মে

তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

সেই মহাতীর্থের তীর্থরেণুতে নন্দলালের অমর আত্মার মরদেহের অণু, পরমাণু মিলিত হলো।

ওঁ বায়ুরনিলম্ অমৃতম্ অথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে গেল। খণ্ড অখণ্ডে, সীমা অসীমে, মৃত্যু অমৃতে প্রবেশ করল। আত্মার পরিত্যক্ত আধার, দেহ ভস্মীভূত হলো।

ওঁ প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্বেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন ইষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তম্ এহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ॥

হে যাত্রী। যাত্রা করো। যাত্রা করো। অনন্তকাল ধরে, তোমার এই মহাযাত্রা চলেছে। কবে—কত কোটী কল্প পূর্বে তার আরম্ভ, তা কেউ জানে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তুমি চলেছ। ভুবনে ভুবনে, লোকে লোকে। গড়েছ সাময়িক আশ্রয়। স্নেহ, প্রীতি, মায়ামমতায় সে-আশ্রয় ভরে উঠেছে। নির্মম তুমি আবার সেই মায়া কাটিয়ে, তোমার ক্ষণিক-স্থগিত যাত্রা শুরু করেছ।

সোনার সংসার, প্রিয়তমার প্রেম, সন্তানের স্নেহ, প্রিয়জনের প্রীতি, কিছুই তোমায় বেঁধে রাখতে পারেনি।

'মৃত্যোঃ পড্‌বীশম্ অবমুঞ্চমানঃ'—মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করে, বীর তুমি এগিয়ে চলেছ।

'মহাপ্রস্থানে পিছনে তাকাতে নাই'—মহাভারতের এই শিক্ষা। পিছনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলেছ তুমি সেই চিরন্তন পথে, যে-পথে তোমার পূর্ব-পিতামহগণ প্রয়াণ করেছেন, সেই পিতৃগণ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন—তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হও।

তোমার সুকৃত, তোমার ধর্মকে পাথেয় করে তুমি ধর্মরাজের সঙ্গে মিলিত হও। সেই 'অসীমে' তুমি অবগাহন করো। ঐ পবিত্র

অবগাহনে তোমার যা কিছু কলুষ তা ধৌত হবে। শোভন দীপ্ত তনু নিয়ে তুমি আর এক গৃহে আশ্রয় নেবে।

পুনরেহি পুনরেহি দিব্যেন মনসা সহ।

আমাদের আকুল প্রার্থনা—আবার এসো তোমার জ্যোতির্ময় মন নিয়ে—আবার তুমি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হও।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

—জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৭৩।

অধ্যাপক তেজেশ চন্দ্র সেন

দেহের কারাগার ভেঙে গেল। মুক্ত আত্মা পরম আনন্দে অসীমে অবগাহন করলেন! শান্তিনিকেতনের একান্তে, নিরালায়, একটি ক্ষুদ্র কুটীরে, যিনি নীড় বেঁধেছিলেন। আজ ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক তিনি এই আশ্রমে বাস করেছেন। ৫২ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। আশ্রমের শিশুদের শিক্ষার ভার ছিল তাঁর উপর। ভারত এবং ভারতের বাইরেরও শত শত শিশু তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে।

প্রথম দিকে যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁদের পুত্রকন্যাগণও তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছে। এখন আবার তাঁদের পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীরাও তাঁর ছাত্রছাত্রী হয়েছিলেন। এইভাবে তিন-পুরুষকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এই তিনপুরুষের সবার সঙ্গেই তাঁর স্নেহের সম্বন্ধ সমান ছিল।

তিনি ছিলেন অবিবাহিত। সুতরাং সাংসারিক পরিভাষায় তিনি নিঃসন্তান, কিন্তু সত্যিই কি তিনি নিঃসন্তান? আজ কি দেখলাম? শত শত সন্তান তাঁর মৃত্যুশয্যা ঘিরে রয়েছে। দৃষ্টি তাদের সজল, মুখ তাদের ম্লান। কেউ তাঁর ললাট চন্দন-চর্চিত করছে, কেউ দীপ জ্বালছে, কেউ ধূপ দিচ্ছে, কেউ মালা গেঁথে এনেছে—কেউ বা স্তূপীকৃত পুষ্পে দেহ ঢেকে দিচ্ছে।

যে অপরিসীম পিতৃস্নেহ, আপনার কয়েকটি সন্তানের মধ্যেই

নিবদ্ধ থাকত, সেই অফুরন্ত বাৎসল্য, শত শত সন্তানের উপর দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ নিরন্তর অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে।

এই আশ্রমের দুটি রূপ। একটি বাহ্য, একটি আন্তর। বাহ্যরূপটিই সহজে চোখে পড়ে। বিচিত্র তরুলতাসমাচ্ছন্ন শ্যামল-শোভন নয়ন-বিমোহন রূপ। এর এই শ্যামল রূপ সহজে সৃষ্টি হয় নাই। বহু তপস্যার ফল এই শ্যামলিমা।

প্রথম দিকে এই আশ্রমের রূপ ছিল ঊষর, রুক্ষ। এর এই ঔষর, রুক্ষতা দূর করবার জন্য যাঁরা তপস্যা করেছেন—তেজেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। কতকাল ধরে, কত না পরিশ্রমে, কত না অধ্যবসায়ে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, বীজ-বপন, বৃক্ষরোপণ করেছেন। আজ যা দেখে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, আমাদের নয়ন স্নিগ্ধ হচ্ছে, অন্তঃকরণ শান্ত হচ্ছে, সেই শ্যামলিমার সৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘকালের তপস্যা রয়েছে।

আশ্রমের আন্তররূপ সৃষ্টিতেও তাঁর দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথ যে 'বিশ্বের নীড়' কল্পনা করেছিলেন, তাঁর জীবনেই যে-কল্পনা মূর্তিগ্রহণ করেছিল সেই 'বিশ্বের নীড়' সৃষ্টিতে, যে-অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ তাঁকে প্রাণপণে সাহায্য করেছিলেন, তেজেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম।

শিশুগণই দেশের ভবিষ্যৎ। সেই শিশুগণের জীবন-গঠনের জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত যিনি তাদের শেষ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর কতখানি ছিলেন, তা মর্মগ্রাহিগণ জানেন।

তাঁর অফুরন্ত প্রীতির ভাণ্ডার শিশুদের ভালোবেসেই নিঃশেষিত হয়নি। বিশ্বভারতীর সকল বয়সের, সর্বশ্রেণীর কর্মীর প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্ছ্বসিত হতো। সুদীর্ঘকাল যাবৎ 'দিনেন্দ্র-চা-চক্রের' তিনি মধ্যমণি ছিলেন। 'চা-স্পৃহা চঞ্চল চা-চাতকদলের' পিয়াস মেটাতে, চা-চক্রে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তাঁকে ছাড়া শান্তিনিকেতন চা-চক্রের কথা ভাবা যায় না।

এই শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে, সকলের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের গ্রন্থি দিয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যিনি নিজেকে বেঁধেছিলেন, আজ অর্ধ শতাব্দীর সেই স্নেহের গ্রন্থি ছিন্ন করে তিনি চলে গেলেন।

আমরা তাঁকে সজলনয়নে বিদায় দিলাম। হাজার হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষি পিতামহগণ যে-ভাবে তাঁদের প্রিয়জনকে বিদায় দিতেন, আমরাও সেইভাবে তাঁকে বিদায় দিলাম ঃ

"যাত্রা করো! হে পথিক। যাত্রা করো! যে-পথে আমাদের পূর্ব-পিতামহগণ অনন্তকাল ধরে যাত্রা করেছেন, সেই সনাতন পথে, আজ তোমার মহাযাত্রা শুরু হলো।

"কল্যাণকর্মকে পাথেয় করে তুমি ঐ 'পরম অসীমে' অবগাহন করো। ধর্ম তোমার সাথী। তারই সাহায্যে তুমি ধর্মরাজের সঙ্গে মিলিত হও। যা কিছু কলুষ, যা কিছু মালিন্য, অসীমের অবগাহনে তা ধৌত হোক! জ্যোতির্ময়, নবীন দেহ ধারণ করে, পুনর্বার তুমি নিজগৃহে গমন করো।"

তোমরা শত শত স্নেহভাজন আশ্রমিক আজ এই আশ্রমে তোমার তর্পণ করছেন। করপুটে বারি গ্রহণ করে আমরা তর্পণ করি। এই বারি কী? স্নেহের প্রতীক। আমাদের স্নেহের অর্ঘ্য, শ্রদ্ধার অঞ্জলি, তাঁর উদ্দেশে প্রেরণ করছি। আমাদের পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, কিছু পরিমাণে শোধ হচ্ছে।

আজ তাঁর দেহের বন্ধন টুটে গেছে। সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমাণ ক্ষেত্রে যিনি আবদ্ধ ছিলেন, তিনি আজ সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। আজ তাঁর তর্পণ হলে সমস্ত বিশ্বের তর্পণ করতে হবে।

ত্রিভুবনের তৃপ্তিসাধনে তাঁর তৃপ্তি হবে।

"দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, ক্রূর সর্প, সুপর্ণ, তরুলতা, সরীসৃপ, পক্ষী, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহারী, পাপরত, ধর্মরত প্রাণীসমূহ, ব্রহ্মলোক হতে এই পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত লোক; দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ, মানবগণ, মাতৃগণ, মাতামহগণ; যে-সব কোটি কোটি কুল

লুপ্ত হয়েছে,• সপ্তদ্বীপবাসী জীবগণ সকলেই তৃপ্ত হোন। ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হোক।”

যিনি নিজের দেহের গণ্ডি অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁর তর্পণে গণ্ডী টানবে কোথায় ?

মধু বাতা ঋতায়তে—

“আকাশ বধু বর্ষণ করছে, বাতাস মধু বহন করছে, নির্ঝর মধু ক্ষরণ করছে। রাত্রি মধুময়, ঊষা মধুময়, সূর্য মধুময়, পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত মধুময়—”

আমাদের প্রিয়জন যে আজ এই ধূলিকণার মধ্যেও ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন !

—প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৬৭।

তাপস সতীশচন্দ্র[১]

"শুনেছি ক্ষুদ্র প্রবালকীটগণ তাদের দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে, রমণীয় এক প্রবালদ্বীপ গড়ে তোলে। ঐ রমণীয় দ্বীপ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু আমি দেখেছি, সাধারণ, অসাধারণ, খ্যাত, অখ্যাত মানবসন্তানগণ তাঁদের দেহ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অতি রমণীয় এক তপোবন সৃষ্টি করেছেন। সেই তপোবনে, আমার কৈশোর কেটেছে, যৌবন কেটেছে; ভাগ্যে থাকলে অন্তিম জীবনও সেখানেই শেষ হবে।"

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের সহায়তা পেয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন ক্ষণায়ু—কিন্তু ক্ষণজন্মা পুরুষ।

বিশ্বভারতী তো তার জন্ম থেকেই বিশ্ববিখ্যাত হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ, রবিকর-প্রস্ফুটিত-শতদলের সৌরভে আকৃষ্ট মধুকরের মতো, বিশ্বভারতীতে ছুটে এলেন। তাঁদের কেউ কেউ দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গেছেন।

কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয় যখন গড়ে উঠতে থাকে, তখন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি কম, অখ্যাতি কম নয়। সেই অবস্থায়, সেই অজ্ঞাত, অখ্যাত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সেবা করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের কথা মনে হলে অন্তর তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

১৯০৩ সালের গোড়ার দিকে, এইরূপ এক ক্ষণায়ু ক্ষণজন্মা তরুণ

---

১. সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সতীশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তীর উক্তি অবলম্বনে।

দ্রষ্টব্য:—প্রভাতকুমার রচিত "শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী" পৃষ্ঠা ৫১-৫৭।

সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলেন। নাম তাঁর সতীশচন্দ্র রায়। বরিশাল জেলার উজীরপুর নিবাসী, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান তরুণ কলকাতায় এসে বি. এ. পড়ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য, তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ, তাঁকে এমনি মুগ্ধ করল যে সেই প্রতিভাবান বিদ্যার্থী তাঁর ভবিষ্যতের কথা না-ভেবে, আসন্ন পরীক্ষা না দিয়েই বিদ্যালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে···। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন।···

"আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করিনি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

"একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা করো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

"কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিকবৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর

ছিল গায়ে, তার পরিধেয় জীর্ণ। যে ভাব-রাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হতো প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তাঁর সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্য-সম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।"...

"সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হলো তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ...।

"সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না—এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।"

"এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানাতত্ত্বের আলোচনা করতে করতে—রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত—সমস্ত আশ্রম হতো নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা

জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।"

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,
একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৭৩৯-৪৩

রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ও সমমরমী সতীশ ছিলেন জাতকবি। কবির মতই তিনি জীবন যাপন করতেন। অথচ তাঁর বাইশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যেরূপ অধ্যয়নশীলতা ও প্রকাশনিপুণতা দেখিয়ে গেছেন তা অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথ এইটিই চেয়েছিলেন। শিক্ষকেরা ছাত্রদেরই ন্যায় অধ্যয়নশীল হবেন। অধ্যাপকগণ জ্ঞানচর্চা করবেন। তাঁরা হবেন দীপবর্তিকা। ছাত্রেরা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন। এই ছিল বিদ্যালয়ের স্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের স্বপ্ন। সতীশের মধ্যে সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল।

ক্ষণায়ু সতীশ, ক্ষণকালের জন্যই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ক্ষণেকের জন্যই তাঁর দীপবর্তিকার আলোকরশ্মিতে শান্তিনিকেতন উদ্ভাসিত করেছিলেন। তার পর ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের মতই তিনি অসীমে অন্তর্হিত হন।

প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যু কখনো অতি শৈশবেই, কখনো কৈশোরে, কখনো যৌবনে, কখনো বা পরিণত বয়সেই আসে।

মৃত্যুরও কি রূপের অন্ত আছে। কত নিদারুণ ভয়ংকর, কত বিকট, বীভৎস, কত অকল্পনীয় হৃদয়-বিদারক রূপই না মৃত্যুর দেখা গেছে!

এই ফুলের মতো তরুণটিও এক অচিন্তনীয়, নিদারুণ ভয়ংকর মৃত্যুর কবলে পড়েন।

সে-সময়ে শান্তিনিকেতনে পনের দিন শীতের ছুটি হতো। সেইরূপ এক শীতের ছুটিতে সতীশ দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পথে তিনি জ্বরাক্রান্ত হওয়ায়, ভ্রমণে ছেদ পড়ে।

সতীশ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। সেই জ্বরের মধ্যে তাঁর সর্বশরীর মারীগুটিকায় ছেয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীর[২] মুখে শুনেছি:

বসন্ত-চিকিৎসকগণ দেখে বললেন, "এ ভয়ংকর মারাত্মক জাতের বসন্ত! আমাদের দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে, এক-আধবার মাত্র এইরূপ বসন্তরোগী দেখেছি। কেউ বাঁচেনি। এঁকেও বাঁচানো যাবে না!"

১৯০৩-৪ সালের কথা কথা। শান্তিনিকেতনে তখন ক'জন লোকই বা থাকতেন। তাতে আবার বিদ্যালয় বন্ধ। সতীশের সঙ্গে ছিলেন মাত্র দু'জন।

একজন শিক্ষিত সহকর্মী—নাম রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাড়ি বাঁকুড়া। আর একজন অশিক্ষিত সেবক—নাম 'কোদো'—বাড়ি দুমকা। দুজনেই স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহ।

বসন্ত চিকিৎসকগণ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রাজেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন,

"রোগী আপনার কে হন?"

"রক্তের সম্পর্কীয় কেউ নন, সহকর্মী বন্ধু।"

"ভাই নয়, ভাইপো নয়! সহকর্মী!!"

"...সর্বনাশ! চলে যান! শীঘ্র চলে যান! এ-জাতের বসন্ত ভয়ানক সংক্রামক! হলে আর রক্ষা নাই! অবধারিত মৃত্যু!"

রাজেন্দ্রনাথ ধীরভাবে বললেন:

"এ অবস্থায় এঁকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারি না! যা হবার তা হবে!"

চিকিৎসকগণ আর কালবিলম্ব না করে, ঔষধ ও পথ্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন।

সতীশ ছিলেন বিবাহিত। তাঁর শ্বশুর মহাশয় রোগীকে দেখতে আসেন। বোলপুর স্টেশন থেকে এসে, ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে,

২. রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জামাতার অবস্থা দেখে বলে উঠলেন : "Dangerous !"

…"যাক্ সব ব্যবস্থাই তো দেখছি হয়েছে ! কেমন ? আপনারা দুজনেই তো দেখাশোনা করছেন !…আমি নিশ্চিন্ত !"

এই বলে তিনি ধূলাপায়েই বিদায় নিলেন। বিকারের ঘোরে রোগী ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে চান। কার সাধ্য তাঁকে আটকায়। অসুরের মতো আকৃতি এবং অসুরেরই মতো শক্তিধারী 'কোদো' তাঁকে ধরে রাখছে। বলিষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ তাকে সাহায্য করছেন। তাঁরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। কোনো অলৌকিক শক্তিশালী দেবতা বা প্রেত কি রোগীকে ভর করেছে ! এত শক্তি তাঁর আসে কোথেকে ! দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছেন এই দুই নির্ভীক সেবক।

শীতের রাত্রি ! চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ ! অমানুষিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত সেবকদ্বয়, রাত্রে যখন কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন সতীশ উঠে পড়েছেন। বিদ্যুৎ গতিতে তিনি ঘর ছেড়ে ছুটে চলেছেন ! মহাকালের ডাকে, আকাশের উল্কার মতো !

কয়েক মুহূর্ত মাত্র ! রাজেন্দ্রনাথের তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখেন শয্যায় রোগী নাই। 'কোদো'-কে জাগিয়ে তুলে তখুনি বেরিয়ে পড়লেন !

মাঘী পূর্ণিমার রজতশুভ্র রজনী। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সেই নির্জন আশ্রমে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, হাহাকার করে তাঁরা সতীশকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

চন্দ্রকর-ধৌত সম্মুখের প্রাঙ্গণে, শালবীথিকায়, আম্রকুঞ্জে, দেহলীর আশে পাশে 'শান্তিনিকেতন'[৩] ও মন্দিরের ধারে, ছাতিম-তলায় কোথাও তাঁর সন্ধান মিলল না।

অবশেষে দ্বিজেন্দ্রনাথের নীচু বাঙলার পূবদিকে, বোলপুর যাবার পথে, এক পোলের নীচের দিকে সতীশকে তাঁরা খুঁজে পেলেন।

---

৩. মন্দিরের দক্ষিণে আশ্রমে প্রথম নির্মিত দ্বিতল ভবনটির নাম ছিল তখন 'শান্তিনিকেতন।'

সতীশ তাঁর 'শীতলাক্রান্ত' জ্বলে-যাওয়া শরীর শীতল করতে, পোলের নীচের দিকে বহমান, তুষার শীতল সলিল-ধারায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাজেন্দ্রনাথ ও 'কোদো'-কে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শ্রান্ত, অবসন্ন, সেই রোগীকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁরা ঘরে ফিরে এলেন।

আর বেশিক্ষণ রোগীকে তাঁর সেই রোগ-যন্ত্রণা সইতে হলো না। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের এবং আশ্রমের সতীশচন্দ্রের একই সঙ্গে তিরোধান হলো।

আমার মনে সংশয় জাগে---মাঘীপূর্ণিমার শীতল জ্যোৎস্নাস্নাত সেই নির্জন নিশীথে, সতীশের সেই ঘর থেকে বের হওয়া, কি ওই রোগ বিকারের ঝোঁক? না—বিশ্বপ্রকৃতির সেই অনুপম, কারো না-দেখা, না-চাখা মধুভাণ্ডারের আকর্ষণে মধুকরেরই মতো, ধেয়ে চলেছিলেন সতীশ[৪]!

অথবা রোগবিকার এবং সতীশের প্রকৃতিগত সৌন্দর্যপ্রিয়তা—উভয়েই এর মূলে ছিল?

আজ সে কথা কে বলবে?

—নবজাতক, নবম বর্ষ ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৮০

---

৪. সতীশ ছিলেন সুন্দরের উপাসক। এদিক থেকেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রথীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি:

"তখনকার শান্তিনিকেতনের বৃক্ষবিরল প্রান্তরে, কালবৈশাখীর ঝড় নেমেছে। আকাশে যত মেঘ, ততো ধুলো। প্রচণ্ড বেগে বায়ু ছুটেছে! সুদর্শন-চক্রের মতো ছাদের টিন উড়ে চলেছে। তার সামনে পড়লে আর রক্ষা নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে! ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলক এবং বজ্রের নির্ঘোষ! বাইরে বের হয় কার সাধ্য। হঠাৎ দেখা গেল,—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে—হৃদয় নাচেরে" উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করতে করতে, সতীশ কালবৈশাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছেন।

"ঝড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামলো---তার সঙ্গে আবার বড় বড় শিল পড়তে লাগলো। সতীশের ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তখন গুরুর ঐ কাল-বৈশাখীর উপাসনা মন্ত্র জপ করতে করতে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছেন।

"অবশেষে কয়েকজন মিলে, তাঁকে ধরে আনা হলো। তখন তিনি ক্লান্ত বিধ্বস্ত। কালবৈশাখীর রূপে ধ্যানমগ্ন সমাধিস্থ। কণ্ঠ তাঁর ক্ষীণস্বরে তখনো আবৃত্তি করে চলেছে—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।"

এই হলেন সতীশ।